বাঙ্গালা

গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস

শ্রীজহরলাল বসু, বি. এল,

যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই, বা নিজের জাতীয় সাহিত্য
নাই, সে জাতির বড়ই দুর্ভাগ্য—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা

গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস

জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহিনা অর্থ, চাহিনা মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান !
পেয়েছি যা' কিছু কুড়ায়ে তাহাই তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি',
বাসনা তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাব তোমার চরণ দু'টি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—

নানা সারস্বত প্রতিষ্ঠান হইতে বহুপদক প্রাপ্ত
এবং 'সংস্কৃত স্তোত্র সংগ্রহ' প্রণেতা
শ্রীজহরলাল বসু বি, এল,

কলিকাতা ১২।১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীটস্থ আইডিয়াল প্রেস হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীজহরলাল বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত
পোঃ কুতরুন (হুগলী)

আষাঢ়, ১৩৪৩

মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

ভূমিকা

বঙ্গভাষা আজ বিশ্বসাহিত্যেও স্থান পাইয়াছে। ইহা বাঙালীর গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। দেখা যাইতেছে, বঙ্গসাহিত্যসেবীদের অনেকেই এখন ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণ, কবিতা প্রভৃতির রচনায় বেশী মনোযোগ দিয়া থাকেন। যশোলাভ বা অর্থোপার্জনের জন্যই যে তাঁহারা এসব লিখিয়া থাকেন তাহা নয়। তবে এগুলির দিকে লোকের ঝোঁক খুব বেশী। কথা-সাহিত্য রচনার নব নব ধারাও উদ্ভাবিত তথা অনুসৃত হইতেছে। কিন্তু যে অনুপাতে ছোট গল্প, উপন্যাস বা গীতিকবিতা-বিষয়ক পুস্তক অধুনা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে তাহাদের তুলনায় ভাষার মহত্ত্ববর্ধক দর্শন, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমালোচনা প্রভৃতি-বিষয়ক পুস্তকের সংখ্যা আজও মুষ্টিমেয় মাত্র! বলা বাহুল্য ঐ সকল বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের পুস্তকের যথেষ্ট অভাব অদ্যাপি বিদ্যমান! একে বাঙলায় সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম, তাহার উপর আবার গদ্য-সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তক আরও কম।

বাঙলা গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে অদ্যাবধি যে সকল উপকরণ সমাহৃত হইয়াছে সেগুলি অন্যান্য বিষয়ের পুস্তকের তুলনায় কিছুই নয় বলিলেও চলে। বাঙলা গদ্যের রীতিমত ধারাবাহিক সম্পূর্ণ ইতিহাস বঙ্গভাষায় কয়খানা আছে? তাহার মালমসলা কোথায় মিলিতে পারে, তাহার

জন্যই বা কয়জন সাহিত্যসেবী চিন্তা করেন ? এ কথা খুব জোর করিয়া বলিতে পারা যায় যে, প্রাচীন বাঙলা গদ্য-সাহিত্য ব্যাপারের এখনও যথেষ্ট তথ্য অনুদ্ঘাটিত রহিয়াছে। বঙ্গভাষাসেবিগণ এ বিষয়ে যত মনোযোগ দেন, বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে ততই মঙ্গল।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বহুদিন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু যতদিন বাঙলা ভাষা থাকিবে ততদিন তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহাকে বাঙলা সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তক-রচনার পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। অধুনা সাহিত্য-বিষয়ক অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম অনেককে এ বিষয়ে প্রেরণা দিয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যের খণ্ড-ইতিহাস কয়েকখানি রচিত হইলেও, একখানি সম্পূর্ণ ধারাবাহিক বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস আজও রচিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু আজ বহুদিন পরে সেই অভাব কিয়ংপরিমাণে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করিলেন ; ইহা-দ্বারা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণয়নের কিছু সাহায্য হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

প্রাচীন পদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস-বিষয়ে প্রচুর উপাদান থাকিলেও, প্রাচীন গদ্য-বিষয়ক মালমসলার যথেষ্ট অভাব ; আর যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে সেগুলিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, কাজেই সাধারণের সহজলভ্য নহে। অনেকে সে সমুদয়ের সন্ধানও জানেন না। নিজে আইনব্যবসায়ী হইয়া আইন-অধ্যয়নদ্বারা অর্থোপার্জনবৃদ্ধির লোভসংবরণ করিয়া জহরবাবু সুপণ্ডিতগণসেবিত বঙ্গসাহিত্যের গবেষণামন্দিরে প্রবেশপূর্বক বহু পরিশ্রমে বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্য-বিষয়ক নিগূঢ় তথ্য সমূহ নানা স্থান হইতে

সঙ্কলন করিয়া সমগ্র গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এ পরিশ্রম যথেষ্ট প্রশংসনীয়। পুস্তকখানি প্রমাদশূন্য না হইলেও, ইহা তাঁহার তীক্ষ্ণ সমালোচনা-শক্তির যথেষ্ট পরিচায়ক। প্রাচীন গদ্যরচনার বিবিধ বিষয়ে বহুদৃষ্টান্ত সন্নিবেশিত করায় পুস্তকখানি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। জহরবাবুর পুস্তকে বর্ণিত ইংরেজ যুগের লেখকদিগের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও, উহাতে বহুপ্রাচীন গদ্যলেখকের রচনাবলী পুঞ্জীকৃত থাকায় পুস্তকখানির সারবত্তা যথেষ্ট বর্ধিত হইয়াছে।

জহরবাবুর পুস্তকখানির আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে সাহিত্যিকগণের কালানুক্রমিক ধারা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে কাজের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। এরূপ ধারা অন্যত্র বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য পাঠ্য-বিষয় মধ্যে নির্দিষ্ট না থাকায়, বঙ্গভাষা সাধারণের চক্ষে তেমন আদরের বা গৌরবের সামগ্রী ছিল না। সে সময়ে যাঁহারা বঙ্গভাষার পরিচর্যা করিয়াছিলেন তাঁহারা মাত্র সাহিত্যিক প্রেরণার বশেই করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ বঙ্গভাষা কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য পাঠ্য বিষয় মধ্যে নির্দিষ্ট। কাজেই বঙ্গ-ভাষা আজ ছাত্রদের অবহেলার বা খেলার সামগ্রী নহে। বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসও এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য মধ্যে নির্দিষ্ট। সমগ্র বাঙ্‌লা-গদ্য-সাহিত্যের উপযুক্ত পুস্তকের অভাব আছে। জহর-বাবুর এই পুস্তকে পরীক্ষার্থীদের অভাব, সম্পূর্ণ না হইলেও, অনেকটা দূর হইবে। তাঁহার পুস্তকখানি সাহিত্যামোদী এবং শিক্ষার্থিগণের নিকট সমধিক আদর লাভ করিলে আমি সুখী হইব। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ

করিয়া কৃতী সাহিত্যসেবিগণ এ বিষয়ে আরও অনেক পুস্তক রচনা করিলে বাঙ্‌লা-সাহিত্যের প্রকৃত সম্পদ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে। ইতি—

বিদ্যাসাগর কলেজ
কলিকাতা

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

গ্রন্থকারের নিবেদন

শ্রীভগবানের কৃপায় এবং বন্ধুগণের স্নিগ্ধ আনুকূল্যে আমার সুদীর্ঘ-কালের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ "বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস" আজ বঙ্গ-ভাষাপ্রিয়গণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইলাম। যদি ইহা সুধী-গণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় এবং তরুণ বঙ্গভাষাসেবকগণের সাধনপথের কিঞ্চিন্মাত্রও সহায়ক হয়, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক হইবে এবং আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

আমার এই পুস্তকমুদ্রণের একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস নিবেদন করিতে চাই। বাল্যকাল হইতেই মাতৃভাষার উপর একটা সহজ টান ছিল; নানা কৌশলপূর্ণ কবিতা অপেক্ষা সরলভাবে বক্তব্য-প্রকাশক গদ্যের দিকেই আমার বালক মন অধিক আকৃষ্ট হইত এবং অধিক তৃপ্তিলাভ করিত। যখন জানিলাম কোন কোন মনীষীর অভিমত যে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য মাত্র একশত বৎসর হইল উদ্ভূত হইয়াছে, তখনই মনের মধ্যে সংশয় জাগিয়া উঠিল—যে ভাষায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও পদ্য রচনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে কথোপকথনের জন্য, বিচিত্র মানবজীবনের শতবিধ কর্ম্মসম্পাদনের জন্য যে একটা গদ্য-বিভাগ ছিল না—মনটা ইহা মানিতে রাজি হইল না। মনের মধ্যে বিপুল কৌতূহল ও অদম্য উৎসাহ লইয়া শিক্ষার্থীর ক্ষুদ্র-জ্ঞানসাধ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

ঐ সময়ে (১৯০৫ সালে) উত্তরপাড়া Aryan Institution নামক সাহিত্য প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক 'বঙ্গভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ঘোষিত হইল। কলেজে অধ্যয়নের অবসরে শিক্ষার্থী বালকের চেষ্টায় তখন পর্য্যন্ত যে সামান্য তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল তাহারই উপর নির্ভর করিয়া উক্ত প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলাম; এবং ফলে, প্রথম পুরস্কারস্বরূপ একটি রজত পদক লাভ করিলাম। অতঃপর বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে নূতন তথ্য সংগ্রহে আমার আগ্রহ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ক্ষুদ্র পক্ষী যেমন তাহার বাঞ্ছিত কুলায় নির্ম্মাণোদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র চঞ্চুপুট সাহায্যে এক একটি করিয়া তৃণ আহরণ করে, আমিও আমার অধ্যয়নের এবং পরে ওকালতির অবসরে বাঞ্ছিত বঙ্গগদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বমনীষিগণের রচনা হইতে কিছু কিছু তথ্য মিলিল, বহু লাইব্রেরীর পুথি হইতে অনেক পাইলাম, হাইকোর্টের পুরাতন দপ্তর হইতে কিছু দলিল দস্তাবেজের সন্ধান মিলিল। ঐ সময়ের মধ্যে আরও কয়েকবার প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় যোগ দিলাম এবং প্রত্যেকবারেই প্রথম পুরস্কারস্বরূপ একটি করিয়া পদক লাভ করিলাম। তন্মধ্যে দুইটী বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য বিষয়ক: প্রথম, কলিকাতা সারস্বত গ্রন্থাগার বিঘোষিত 'বঙ্কিমচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' এবং দ্বিতীয় চন্দননগর দেশবন্ধু পাঠাগার বিঘোষিত 'বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' বিষয়ক। ঐ দুই প্রতিযোগিতাতেও আমার ভাগ্যে প্রথম পুরস্কারস্বরূপ আরও দুইটী পদক লাভ ঘটিল।

অতঃপর কয়েকজন প্রীতিস্নিগ্ধ বন্ধুর প্রেরণায় ঐ সকল উপকরণ লইয়া "বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস" প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। বন্ধুগণের উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে এই পুস্তক মুদ্রণে আমার আগ্রহ ও সাহস জন্মিত কি

না সন্দেহ। ইঁহারা মুদ্রণ কার্য্যেও পাণ্ডুলিপি সংশোধন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য প্রীতির সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট আমি অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণী।

এই পুস্তকে অনুশীলিত সাহিত্যিকগণের নাম অধিকাংশস্থলে তাঁহাদিগের আবির্ভাবকালের অনুক্রম অনুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে বিড়ম্বনা অনেক; পূর্ব্ববর্ত্তী যুগসমূহের লেখকগণের আবির্ভাবকাল বা তাঁহাদিগের উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহের প্রথম প্রকাশের সন তারিখ অনেকক্ষেত্রে অপরিজ্ঞাত; আর, যদি বা অধুনাতন অনুসন্ধিৎসু মনীষিগণের বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে উক্ত সন তারিখ অনেকটা নির্ণীত হইয়াছে, তাহা লইয়াও মতভেদ বিস্তর। অতএব, এইরূপ অবস্থায় অবিচ্ছিন্নধারায় সন তারিখের অনুক্রম বজায় রাখা যে কত কঠিন, বা যে স্থলে ঐরূপ তারিখ লইয়া মনীষিগণের মধ্যে মতের বিষম অনৈক্য—সে স্থলে স্বয়ং একটা তারিখ অভ্রান্ত মানিয়া লইয়া অপরটী বাতিল ও নামঞ্জুরকরা যে কতদূর ধৃষ্টতা বা দুঃসাহসের কাজ করা হয়—তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তাহাও করিতে হইয়াছে। যে সকল স্থলে ঐরূপ সন তারিখের মতভেদ দেখা গিয়াছে সে সকল স্থলে সম্ভবমত বিচার বিবেচনাপূর্ব্বক যে মতটী গ্রহণীয় মনে করিয়াছি সেইটীই গ্রহণ করিয়াছি। তবে অভ্রান্ত তথ্যনির্ণয়ে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করি নাই; শ্রীরামপুর পাদ্রীকলেজ হইতে পুরাতন পাদরী সাহিত্যিকগণের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়জানিতে পারিয়াছি; ঐরূপ বাঁকুড়া পাদ্রী কলেজ, বেনারস মিশন, উত্তরপাড়া সাধারণ পাঠাগার, কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি হইতে এই পুস্তকের উপকরণ আহরণ করিয়াছি।

বোধ হয় সন তারিখের যাথার্থ্য নির্ণয়ে বিশেষ অসুবিধা ছিল বলিয়াই

পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ অনেকেই সন তারিখের অনুক্রম পদ্ধতি অনুসরণ করেন নাই। আমি এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমার পূর্ব্বে আর কেহ এই পদ্ধতির অনুসরণে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন কি না তাহা আমার জানা নাই।

কেবল মৌলিক রচনাদ্বারা কোন ভাষাই সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। সকল দেশের ভাষাই সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করে ত্রিবিধ উপায়ের সহযোগে—**অনুবাদ, উদ্ভাবন** এবং **অনুকরণ**। বাঙ্গালা সাহিত্যও পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে এই ত্রিবিধ উপায়ের সহযোগে। তবে, উক্ত সকল উপায়ই যে প্রত্যেক সাহিত্যসেবী কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়াছে —তাহা নহে; কেহ শুধু অনুবাদদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন, কেহ বা মৌলিক উদ্ভাবন দ্বারা, আর কেহ বা মাত্র অনুকরণ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি সংসাধন করিয়াছেন। আবার কেহ বা একাধিক উপায়েরও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে কে কোন্ উপায় অবলম্বনে বঙ্গসাহিত্যের কতদুর সম্পদবৃদ্ধি করিয়াছেন এই পুস্তকখানি পাঠে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এই পুস্তকখানির একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ও পুস্তকখানির প্রয়োজন মত স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়া লেখককে তাঁহার নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও পুস্তকখানিকে মুদ্রাকর-প্রমাদ বর্জ্জিত করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত। ইতি—

ভদ্রকালী, দোলতলা
স্নান পূর্ণিমা, ১৩৪৩ সাল

শ্রীজহরলাল বসু

সূচীপত্র

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস

পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' নামক পুস্তকে সমস্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগকে মোটামুটী তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন: চৈতন্য দেবের অবির্ভাবের পূর্ব্বপর্য্যন্ত (অর্থাৎ ১৪৮৬ খৃঃ পর্য্যন্ত) আদ্যকাল; ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ১৭৫২ খৃঃ পর্য্যন্ত) মধ্যকাল; এবং তৎপরে বর্ত্তমান কাল।

বাঙ্গালা গদ্যের যুগ বিভাগ—

অধুনা অনেক সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানের ফলে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফলে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের অস্তিত্ব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং এখন সমস্ত বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যকে ভাগ করিতে গেলে মোটামুটী হিসাবে ছয়ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়; মুসলমান রাজত্ব কালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত **আদিযুগ**; রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বপর্য্যন্ত **দ্বিতীয় যুগ** বা **মুসলমান যুগ**; এই যুগের রচনার প্রধান লক্ষণ বাঙ্গালাতে যাবনিক শব্দের প্রাধান্য; তৎপরে

বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বপর্য্যন্ত **তৃতীয় যুগ** বা **ইংরেজ লেখকদিগের যুগ**; বস্তুতঃ ইংরেজ-লেখকদিগের যত্ন, অধ্যবসায়, চেষ্টা ও আনুকূল্যের ফলে বাঙ্গালাভাষার প্রভূত উন্নতি ও পরিপুষ্টি হইয়াছে; তৎপরে বঙ্কিমের পূর্ব্বপর্য্যন্ত **চতুর্থ যুগ** বা **বিদ্যাসাগরের যুগ**; তদনন্তর **বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ**; তারপর **বর্ত্তমানযুগ** বা **রবীন্দ্রনাথের যুগ**। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের এই ছয়টী যুগ একে একে আলোচিত হইবে।

আদিযুগ

বাঙ্গালা গদ্যের আদিম অবস্থা—

বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের আদিম অবস্থা ঘোর-কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন। অতিপূর্ব্বকালে সাধারণ লোকেরাও যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত তাহাও বর্ত্তমান বঙ্গভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—সংস্কৃত ও বিভিন্ন প্রাকৃতের মিশ্রণ মাত্র। বঙ্গভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানালোকের নানা মত। কেহ বলেন, বাঙ্গালা একটী পৃথক্ ভাষা, বরাবর না হইলেও অতি প্রাচীন কাল থেকেই আছে; ইহা ক্রমবিকাশে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আবার বঙ্কিমবাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন "বঙ্গভাষা আত্মপ্রসূতা নহে। সকলে শুনিয়াছি, তিনি সংস্কৃতের কন্যা; কুললক্ষণ কথায় কথায় পরিস্ফুট। কেহ কেহ বলেন সংস্কৃতের দৌহিত্রী মাত্র। প্রাকৃতই ওঁর মাতা। কথাটায় আমার বড় সন্দেহ আছে। হিন্দি মারাঠি প্রভৃতি সংস্কৃতের দৌহিত্রী হইলে হইতে পারে; কিন্তু বাঙ্গালা যেন সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া বোধ হয়।"

বাঙ্গালা ভাষা যে হাজার বছরের পুরাতন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় সেন-বংশীয় রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণ সেন

প্রায় হাজার বৎসর আগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রদত্ত যে সমস্ত দানপত্র ও অনুশাসন পত্র পাওয়া গিয়াছে সে সমুদয় সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মাঝামাঝি একপ্রকার অক্ষরে লিখিত। রাজা চন্দ্রবর্ম্মার সময়কার লিপিও অনেকটা বাঙ্গালার কাছাকাছি। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা অক্ষরের সূত্রপাত হইয়াছে।

আবার শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন সেনের মতে বঙ্গভাষা বহু প্রাচীন ভাষা: "আধুনিক ইউরোপের কোন ভাষা হইতেই বঙ্গভাষা নবীন বা অল্পজীবী নহে। * * খ্রীষ্ট জন্মের পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বেও বালক বুদ্ধদেবকে বঙ্গলিপি শিক্ষা করিতেছেন, দেখিতে পাই। * * এই বঙ্গভাষা খ্রীষ্টোত্তর দ্বাদশ শতাব্দীতে দণ্ডাচার্য্যের ব্যাকরণ মধ্যে উল্লেখিত হইয়াছে।"

শ্রীযুক্তকৈলাশচন্দ্র ঘোষের মত—

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্য' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে এদেশে কোন গদ্য গ্রন্থকার ছিলেন না তাহা সত্য নহে। * * বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ অধিকাংশ গীতি রচনা করিলেও দুই চারিটী গদ্য লিখিতেও বিরত হন নাই। * * গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রচিত বহুল গদ্য রচনা পাঠ করিয়াছিলেন। * * গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিবন্দনাস্থলে লিখিয়াছেন—

যত যত রস-পদ করলহি বন্ধে
কোটি হি কোটি শ্রবণ পর পাইয়ে
শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্দে।

† বঙ্গবাণী—পৃষ্ঠা ২

সোরস শুনি নাগর বর-নারী।
কিয়ে কিয়ে করে চিত চমকয়ে ঐছন
রসময় চম্পূ বিথারি

চম্পূ শব্দের অর্থ গদ্যপদ্যময় কাব্য; তাহা হইলে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি প্রণীত গদ্যপদ্যময় কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন। * * বৈষ্ণব কবি বৈষ্ণবদাস কবি বন্দনাস্থলে লিখিয়াছেন—

জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি
বিদ্যাপতি রসধাম
জয় জয় চণ্ডীদাস রস শেখর
অখিল ভুবনে অনুপাম
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্যপদ্যময় গীত
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিল
রায় স্বরূপ সহিত।

রূপগোস্বামীর কারিকার নমুনা—

ইহাতেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস পদ্যের ন্যায় অনেক গদ্যও রচনা করিয়াছিলেন। * * বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যেমন বঙ্গভাষায় আদি পদ্য লেখক তেমন তাঁহারা ভাষার প্রথম গদ্য লেখক। * * রূপগোস্বামী 'কারিকা' নামে যে গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন, * * তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম; পুস্তকখানির প্রারম্ভ বাক্য এই প্রকার—'শ্রীশ্রীরাধা বিনোদ জয়। অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ, গন্ধগুণ, রূপগুণ, রসগুণ, স্পর্শগুণ এই পাঁচ-গুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতী রাধাতেও বসে। শব্দগুণ কর্ণে, গন্ধগুণ নাসাতে,

রূপগুণ নেত্রে, রসগুণ অধরে, স্পর্শগুণ অঙ্গে ; এই পঞ্চ গুণে পূর্ব্বরাগের উদয়—পূর্ব্বরাগের মূল দুই ; চিত্র দর্শন ও অকস্মাৎ বংশীশ্রবণ।' ইত্যাদি * * গদ্য রচনার উৎপত্তি ব্রিটিশ রাজত্বের অনেক পূর্ব্বেই হইয়াছে।" আর এক স্থলে লিখিয়াছেন—"অনেকে বলেন রামমোহনই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গদ্য লেখক। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। যে সময়ে বাঙ্গালা পদ্যের উৎপত্তি, ঠিক সেই সময়েই বাঙ্গালা গদ্যেরও জন্মলাভ। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যেরূপ প্রথম বাঙ্গালা কবিতা লেখক—তাঁহারা সেইরূপই ইহার আদি গদ্য লেখক। তৎপরবর্ত্তী শ্রীমদ্রূপগোস্বামী প্রভৃতি চৈতন্যসহচরগণ পদ্যের ন্যায় গদ্যেও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন ; তাঁহাদের পর কথক সম্প্রদায় ইহার অনেক অঙ্গসৌষ্ঠব সাধন করেন। * * আবার প্রতাপাদিত্য চরিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র, রাজাবলী, প্রবোধচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রামমোহনের পূর্ব্বেই রচিত হয়। হরনাথ রায় তাঁহার পূর্ব্বেই সংস্কৃত পুরুষপরীক্ষার বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদ করেন। * * কিন্তু তথাপি আমরা তাঁহাকেই আদি গদ্য লেখক বলিতে অসন্তুষ্ট নহি ; কেন না তাঁহার পূর্ব্ব সাময়িক গদ্য গ্রন্থ সকল এতাদৃশ জঘন্য ভাষায় লিখিত যে, রামমোহনকেই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না।"

এই স্থলে চণ্ডীদাস রচিত 'চৈতন্যরূপপ্রাপ্তি' নামক একটী ক্ষুদ্র গদ্য পুস্তকের প্রারম্ভ বাক্য নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করা হইল: "চৈতন্যরূপের রা চ অধরূপ লাড়ি। রা অক্ষরে রাগ লাড়ি। চ অক্ষরে চেতন লাড়ি র এতে চ মিশাল। ইবে এক অঙ্গা লাড়ি। রাগ রতি। লাড়ির নাম সুধা। সেই লাড়ি সাতইস প্রকার।"

অধুনা সহজিয়া সম্প্রদায়ের বহুবৈষ্ণব কবি রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদ্য পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে ; কোন কোন বৈষ্ণব কবি স্বরচিত পদাবলীর

মধ্যে মধ্যে গদ্য রচনা বিন্যস্ত করিয়াছেন; তন্মধ্যে কয়েকটী নীয়ে উল্লেখ করিলাম:

(১) রূপ-গোস্বামীর কারিকা [১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে রূপগোস্বামী জন্ম গ্রহণ করেন]

(২) কৃষ্ণদাস কবিরাজের রাগময়ী কণা

(৩) আত্ম-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা

(৪) কৃষ্ণদাস রচিত আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা সারাৎসার

(৫) নরোত্তম দাসের রাজমালা

(৬) বৃন্দাবন পরিক্রমা [ইহার রচনার নমুনা পরে প্রদর্শিত হইয়াছে; অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে ইহার পুথির নকল লিখিত হয়]

ডাক্তার সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মত—

সম্প্রতি ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষাসম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "It has been in existence as an independent and characterised language, or rather, as a distinct dialect group, for nearly ten centuries." আরও অন্যত্র লিখিয়াছেন "By the middle of the tenth century, to which period the earliest extant specimens of Bengali can be referred, the Bengali language may be said to have become distinctive, as the expr ssion of the life and religious aspirations of the people of Bengal, with the nucleus of a literature uniting the various dialectal areas. * * Maithili, Bengali and Oriya are by 1300 A. C. fully developed languages each with

its own characteristics, and not mere dialects of a common Magadhi."

ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেনের মত—

ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেনের মতে বিদ্যাপতি প্রমুখ কবিদিগের ভাষা, অর্থাৎ ব্রজবুলি বা মৈথিল বা প্রাকৃত ভাষা (সংস্কৃত নাটকাদির প্রাকৃত ভাষা নহে—তবে তাহারও সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বটে) বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার আদিম অবস্থার জিনিষ। দীনেশবাবুর মতে বাঙ্গালা ভাষা পূর্ব্বকালে প্রাকৃত ভাষা নামেই পরিচিত ছিল। তিনি আরও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে "নাগরী অপেক্ষা আমাদের বঙ্গাক্ষর প্রাচীন। বঙ্গলিপির রূপ অনেকটা চন্দ্রবর্ম্মার লিপিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই লিপিই ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"* আবার এক স্থলে দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "Some * * hold that Raja Rammohun Ray started the Bengali Prose. Others say that it was 'Alaler Gharer Dulal' which first showed the example of writing in colloquial style * * Bankim chandra seemed to favour the current belief in the Introduction to Tek chand Thakur's work in 1892 'It is generally believed that Bengali Prose owed its origin to Raja Ram Mohon Ray.' *Recent researches have made it clear that Bengali prose was extant even in the tenth century A. D.

* দীনেশ চন্দ্র সেন প্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, ১১ পৃষ্ঠা।

[In the Suunya Purana] there are some passages at least, which savour of the style of a very distant epoch of our literature. In the fourteenth century Chandidasa wrote a short treatise in prose expounding the truths of the Sahajia cult in a language which has been recently termed by some seholars Sandhya Bhasa. * * We have found a very old translation of the 'Bhasa Parichhad' written about [the end of the eighteenth century]. * * * It must however be admitted that prose was not the general medium in those days. The development of Bengali prose is certainly due to the English [who wrote] many instructive treatises on a variety of subjects in our language. * * It was neither Tekchand Thakur nor Raja Rammohan Ray who originally set forth the models adopted in their works."—Bengali Prose Style from 1800 to 1857.

প্রাচীন বাঙ্গালা ন্যায় শাস্ত্র

দীনেশ বাবু যে ভাষা পরিচ্ছেদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন উহা ন্যায়-শাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্র বিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ। ন্যায় শাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্র বিষয়ে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। ইহার ভাষার নমুনা স্বরূপ কিয়দংশ নিম্নে প্রদর্শিত হইল : গৌতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয়? তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গৌতম উত্তর

করিতেছেন। তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলে, পদার্থ কহো? তাহাতে গৌতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্ত প্রকার। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।" ইত্যাদি।

পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র রচিত 'কীর্ত্তিলীলা' নামক একখানি পদ্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাধাবল্লভ শর্ম্মানামে জনৈক ব্যক্তি পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় হিন্দু আইনের পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করেন।

কৈলাসচন্দ্র ঘোষের মত—

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ বলেন—"আকবর সাহের রাজ্যারম্ভের বহু পূর্ব্বেই বঙ্গীয় ভাষা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ভাষাটী নিতান্ত সামান্য দিনের নহে। আমরা প্রমাণ করিব প্রায় সাতশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালাভাষা চলিয়া আসিতেছে। * * *

কোমল ভাব প্রকাশের জন্য কোমল ভাষার প্রয়োজন। বাঙ্গালা ভাষার ন্যায় কোমল ভাব অভিব্যক্তির ভাষা আর দ্বিতীয় নাই। * * জয়দেবের সময় বাঙ্গালা ভাষা নিতান্ত শিশু বালিকা নহে, তখন ইহা আকারে পরিপুষ্টা হইয়াছে। সেই জন্যই দেখিতে পাই, গীত-গোবিন্দ সংস্কৃত গ্রন্থ হইলেও, ইহার ভাষা প্রকৃত সংস্কৃত নহে—ইহার ভাষা বাঙ্গালা সংস্কৃত; ইহাতে সংস্কৃতের মাধুর্য্য ও বাঙ্গালার লালিত্য উভয়ই আছে। * * জয়দেবের সময়ে বাঙ্গালার কুমারী বা প্রথমাবস্থা। * * আকার গত সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে আমরা বাঙ্গালাকে সংস্কৃতেরই কন্যা বলিতে বাধ্য হইব; বাঙ্গালা সংস্কৃতের কন্যা, প্রাকৃতের

নহে ; তবে সংস্কৃতের যৌবন অবস্থার কন্যা নহে, বৃদ্ধ বয়সের কন্যা। * * বাঙ্গালা প্রাকৃত ভাষার কনিষ্ঠা ভগ্নী। * *

প্রাকৃত ইহার প্রতিপালিকা বলিয়া মান্য পাইতে পারে—মাতৃ সদৃশী আখ্যা পাইতে পারে—মাতৃস্থানীয়াও হইতে পারে ; কিন্তু মাতা হইতে পারে না। * *

বঙ্গভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা বলিয়াছি ইহা জয়দেবের পূর্ব্বেই সৃষ্ট হইয়াছে। জয়দেবের সময় ইহার কুমারী অবস্থা। জয়দেব সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিলেও তিনি বাঙ্গালা ভাষারই প্রথম কবি : ভেনারেবল বিড সাহেব যেরূপ লাটিনে গ্রন্থ লিখিলেও ইংরাজি সাহিত্যের প্রথম লেখক বলিয়া মান্য পাইয়াছেন ; আমাদের জয়দেব ও সেইরূপ। * জয়দেব বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি। * * * জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীর লোক ও বাঙ্গালা ভাষা দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। * * বঙ্গভাষা সপ্তম শতাব্দী হইতে অল্পে অল্পে বিকসিত হইয়াছে ; বিদ্যাপতির সময় ভাষার অনেকটা বলাধান হইয়াছে। *

যে সময়ে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস আপনাদের প্রভায় বঙ্গভূমি আলোকিত করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই ইংলণ্ডীয় প্রথম কবি জিয়োফ্রি চসর (Geoffrey Chaucer) তাঁহার কাণ্টরবেরি (Canterbury Tales) কাব্য লিখিয়া ইংলণ্ড মাতাইতে ছিলেন ও ইংরাজি সাহিত্যের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছিলেন। যে সময়ে ইংরাজী সাহিত্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, প্রায় সেই সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি।"

কুমুদনাথ দাসের মত—

শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস তাঁহার 'History of Bengali Literature' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন : "Our mother tongue originated

more than a thousand years ago from an old type of Magadhi Prakrit, which was related to Sanskrit in much the same way as Italian to Latin, characteristically avoiding conjunct consonants and preferring final vowels.

Though Bengali is an offshoot of Magadhi Prakrit, yet the influence of the Persian and Arabic languages upon its growth cannot be ignored. During the Muhammadan rule many Persian and Arabic words naturally crept and formed part and parcel of our language. As instances in point the following words may be cited—Ain (law), Doat (ink pot), kalam (pen), kagaj (paper) * *

As a consequence of the British suzerainty in India for more than a century and a half, many English words have passed into and become naturalized in our language. * *

বঙ্গাক্ষর সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত—

'A cursory examination of the Bengali alphabet will convince our readers that it is derived and simplified from the Devanagri alphabet. This modification was made many centuries ago and all that exists of Bengali literature from the time of Chandidasa and Kasiram

was recorded in this modern Bengali alphabet.' (R. C. Dutt's. Literature of Bengal). * *

Shunya Puran by Ramai Pandit, the songs of Manik chand, the songs of Gobinda chandra and epigrams of Dak and Khana' are other early poems in our language —composed between 800 to 1000 A. D. An undercurrent of Buddhist ideas and tendencies runs tbrough them and they throw a flood of light upon the quaint manners and customs among our forefathers more than a thousand yesrs ago."

কেদারনাথ মজুমদারের মত—

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার স্বপ্রণীত গদ্যসাহিত্য নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "বোধ হয় বাঙ্গালা লিপিমালা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই গদ্য রচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। * * বাঙ্গালা গদ্য রচনা অতি প্রাচীন হইলেও ইহার প্রাচীনতার দৃষ্টান্ত বড়ই বিরল।" কারণ বাঙ্গালায় আদিম অবস্থার রচনা বেশীর ভাগই কবিতায় কিম্বা গানে। এই জন্যই শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দাস বলিয়াছেন "প্রাচীন বাংলা সাহিত্য গদ্য নহে, পদ্য"। *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনও বলিয়াছেন: "The prevailing form was verse, not prose, in old and mediæval Bengali" † আরও, "Poetry was the only

* বাংলা সাহিত্যে ভাষাবিভ্রাট—বঙ্গশ্রী, আষাঢ়, ১৩৪১

† Western Influence in Bengali Literature (p. 14)

style to which authors applied themselves, and studied prose was utterly unknown. Letters of businerss, petitions, public notifications, and all such other concerns of common life are necessarily, and of course, written without measure or rhythm. I might almost have added, without Grammar. But all the compilations dedicated to Religion, to History, to Morality, and all such works as are expected or intendied to survive the composer, are invariably written in verse" ‡

পূর্ব্বেকার বাঙ্গালা রচনা বেশীর ভাগই পদ্যে—

পদ্য দেখে ভাষার অবস্থা ভাল রকম বিচার করা যায় না, কারণ পদ্যে যে সব কথা ব্যবহৃত হয়, সাধারণ কথোপকথনে বা গদ্য রচনায় লোকে তাহার অনেক কথা প্রায় ব্যবহার করে না। কাজেই কোন ভাষার বিষয়ে বিচার বিবেচনা করিতে হইলে পদ্য গ্রন্থের উপর নির্ভর না করিয়া গদ্য গ্রন্থের দিকেই দৃষ্টিপাত করা বেশী দরকার। "ভাষার প্রতি দেশবাসী লোকদিগের যেরূপ আস্থা জন্মিলে এবং ভাষার যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইলে গদ্য গ্রন্থে লোকের অনুরাগ জন্মে [বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে] তাহার কিছুই হয় নাই—হইলে ঐ কালের মধ্যে কেহ না কেহ অবশ্য বাঙ্গালা ভাষায় কোন না কোন ব্যাকরণ রচনা করিতেন—কিন্তু তাহা কেহই করেন নাই। কোন বাঙ্গালা অভিধানও

‡ Western Influence in Bengali Literature (pp. 287-88).

এ কালের মধ্যে রচিত হয় নাই।” বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ সিবিলিয়ান হালহেড সাহেব কর্ত্তৃক ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে পরে আরও সবিস্তারে বলিব।

“সে সময়ে পুস্তকাদি অতি দুরূহ সুসংস্কৃত বাঙ্গালায় লিখিত হইত। এবং কথিত ভাষা প্রায় বর্ত্তমান কালের গ্রাম্য ভাষাপেক্ষাও নিকৃষ্ট ছিল, সুতরাং তৎকালে বঙ্গসাহিত্য অতি নীরস ও শ্রীহীন ছিল। বঙ্গসাহিত্যের এই প্রকার দুর্ব্বোধ্যতা প্রযুক্ত ইহা অনেকেরই আয়ত্তগম্য ছিল না।” *

পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস বলিয়াছেন; “Examples of the earliest prose writings in our literature are to be traced so far back as the 9th or 10th century A.D. Ramai Pandit's poem Shunya Puran written about 1000 years ago * * * furnishes a very peculiar specimen of Prose. Poet Chandidasa's Chaityarupa Prapti written about 600 years ago and such works as Ragamayi kana and Karika by Sahajiya Vaishnava authors provide examples of later prose, one chief feature whereof is the almost total absence of verbs in sentences as will appear from the following lines of Karika প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণনির্ণয় ইত্যাদি— ইতিপূর্ব্বে ৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু সহজিয়া সাহিত্য সম্বন্ধে সর্ব্ব সমেত যে ৭৯

* বিদ্যাসাগরের নিকট বঙ্গসাহিত্য কতদূর ঋণী—যতীন্দ্রনাথ বসু

খানি পুস্তকের নামোল্লেখ সহ বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে ১৪ খানি গদ্যে রচিত এবং অবশিষ্টগুলি সবই পদ্যে।

রমাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ—

কুমুদ বাবু যে শূন্যপুরাণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অন্যূন ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বেকার রচনা। পুথি নকল হইতে হইতে ইহাতে পরবর্ত্তী কালের কিছু কিছু শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে ইহার একটী সংস্করণ প্রথমে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি বসুমতী-সাহিত্য মন্দির হইতে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় আর একটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। শূন্য পুরাণের রচনার নমুনা যথা: "কোন মাসে কোন রাসি। চৈত্র মাসে মীন রাসি। হে কালিন্দি জল বার ভাই বার আদিত্ত। হথপাতি লহ সেবকর অর্ঘ-পুপ্প পানি। সেবক হব সুখি আমনি ধামাৎকান্নি। গুরুপণ্ডিত দেউল্যা দানপতি। সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্নাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারীপাল রাজদূত কোমি কোটাল পরে সুখমুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতার দানপতির বিঘ্ন জাব নাস।" ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই

এই শূন্য পুরাণের আরও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম: পচ্চিম দুআরে কে পণ্ডিত। সেতাই যে চারিসঅ গতি আনি লেখ্যা॥ চন্দ্র কোটাল যে বসুয়া ঘটদাসী। দূত নাহি ডরাই তুম্মাকে দেখিআ। চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমান কর এ দূত জমর বিদ্যমানে॥ দীনেশবাবু ইহার নীম্নলিখিত ইংরেজি অনুবাদ দিয়াছেন: who is the scholar

in the Western gate? Swetai with 400 followers. Chandra the police officer...the messenger is not afraid of thee Chitra Gupta keeps a register.

শূন্য পুরাণ প্রণেতা এই রমাই পণ্ডিত গৌড়ের অধীশ্বর দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ছিলেন। দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথমাংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে রমাই পণ্ডিত বাঁকুড়া জেলায় দ্বারকেশ্বর তটে চম্পাই ঘাটে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের আদিম অবস্থা বর্ণনা কালে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন "বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন; "বাঙ্গালা গদ্যের জড়তা মুক্তি খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগের পূর্ব্বে হয় নাই। ষোড়শ শতকে উহার রূপ কি রকম ছিল তাহা অনুমান করিতেও ভয় হয়। * * তখনকার দিনে লেখাপড়ার কাজে গদ্যের প্রয়োগ ছিল শুধু চিঠি পত্রাদিতে ও দলিল দস্তাবেজে।" সুকুমার বাবু ১৫১৫ সালে লিখিত একখানি পত্রের নমুনা দিয়াছেন। "কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ এই পত্রটী আহোমরাজ চুকাম্ফা স্বর্গদেবকে লেখেন। * * * পত্রের মূল অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১৫১৫ খৃষ্টাব্দের একখানা পত্রের নমুনা :—

* * * লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বর্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক।

† বঙ্গশ্রী,—১৩৪০, বৈশাখ।

আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমারো এ গোট কর্ত্তব্য উচিত হয় (,) না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার উদ্দণ্ড চাউলিয়া শ্যামরাই ইমারাক পাঠাইতেছি। তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা। * * * ” উক্ত সুকুমার বাবু ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের একখানি পুরাতন দলিলেরও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন;

১৭১৭ খৃষ্টাব্দের একখানা দদিল :—

“ * * * আমরা তোমার সহিত শ্রীশ্রী৺স্বকীয় ধর্ম্মের পর আখেজ করিয়া ৺বৃন্দাবন হইতে স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে গৌড়মণ্ডলে জয়নগর হইতে শ্রীযুক্ত সেওায় জয়সিংহ মহারাজার নিকট হইতে দিগ্বিজয় বিচার করিলেন শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য ও পাতশাহী মনসবদার সমেত গৌড়মণ্ডলে আসিয়াছিলেন এবং আমরা সর্ব্বে থাকিয়া স্বধর্ম্ম উপরি বাহাল করিতে পারিলাম নাই সিদ্ধান্ত বিচার করিলাম এবং দিগ্বিজয় বিচার করিলেন * * * ”

১৬৩১ খৃষ্টাব্দের একখানা পত্রের নমুনা :—

এই স্থলে ১৫৫৩ শকে আসামের রাজা কর্ত্তৃক গৌহাটীর মুসলমান ফৌজদার নবাব আলেয়ার খাঁকে লিখিত একখানি পত্রের নমুনাও প্রদর্শিত হইল; “স্বস্তি বিবিধ গুণগাম্ভীর্য্যপরমোদার শ্রীযুক্ত নবাব-আলেয়ার খাঁ সদাশয়েষু।

সস্নেহ লিখনং কার্য্যঞ্চ। আগে এথা কুশল। তোমার কুশল সততে চাহি। পরং সমাচারপত্র এহি। এখন তোমার উকিল পত্রসহ আসিয়া আমার স্থানে পঁহুছিল। আমিও প্রীতি প্রণয়পূর্ব্বক জ্ঞাত হইলাম। আর তুমি যে লিখিয়াছ তোমার উত্তম পত্র আসিতে আমার কিঞ্চিৎ

মনস্বিতা না রহে এ যে তোমার ভালাই দৌলত। অতএব আমিও পরম আহ্লাদরূপে জানিতে আছো তোমার আমার অদ্বয় ভাব প্রীতি ঘটিলে মনমাফিক সন্তোষ কি কারণ না হইবেক। আর তোমার আমার অত্যন্তরূপে আনন্দযুক্ত হইলে উভয় পক্ষ লোকের নাবিদ্বেশরূপ অবিযুতা অন্তশেত কিসক না রহিবেক। এ কারণ তুমি লিখিবাক পোরা।

পূর্ব্বে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের নমুনা খুঁজিতে গেলে রাম বাম বসু রচিত 'প্রতাপাদিত্য চরিত' (১৮০১ খৃঃ) লিপিমালা (১৮৩২ খৃঃ) প্রভৃতি পুস্তককে প্রাচীনতম বাঙ্গালা গদ্য রচনা বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু অধুনা শিবরতন মিত্র প্রমুখ বহু সাহিত্যিকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আরও অনেক আগেকার গদ্য রচনা যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেনও তাঁহার 'বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য' নামক পুস্তকের নবম অধ্যায়ে অনেক পুরাতন বাঙ্গালা গদ্য রচনার উল্লেখ করিয়াছেন ও তাঁহার বঙ্গসাহিত্য পরিচয় নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে অনেক পুরাতন বাঙ্গালা গদ্য রচনার নমুনাও দিয়াছেন। আমরা সেই সকল প্রাচীন গদ্য রচনা নমুনা স্বরূপ মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন মত দু একটী উদ্ধৃত করিব।

বাঙ্গালা ভাষায় রমাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ ও চণ্ডীদাসের চৈত্যরূপ প্রাপ্তি অপেক্ষা প্রাচীন গদ্যগ্রন্থ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় নাই। রচনার পারিপাট্য হিসাবে এই দুইখানি পুস্তক উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য না হইলেও প্রত্নতাত্ত্বিকের নিকট এই পুস্তকগুলি বড় মূল্যবান—সন্দেহ নাই। এই পুস্তকগুলির রচনা দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যে সময়ে এই পুস্তকগুলি রচিত হইয়াছিল বাঙ্গালা গদ্যের আকার

তখনও পূর্ণরূপে গঠিত হয় নাই। অধিকাংশ বাক্যগুলিতেই ক্রিয়াপদের অভাব এবং বেশীর ভাগ বাক্যে তিন চারিটীর অধিক শব্দ নাই;—ইহাই এই সময়কার রচনার বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ শতাব্দীর গদ্যের মত দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাক্যসমূহ তখনও বাঙ্গালা গদ্যে ব্যবহৃত হইতে সুরু হয় নাই। ইহাতেই মনে হয় এই সকল গ্রন্থ বাঙ্গালা গদ্যের প্রকৃত প্রাচীনতম অবস্থার পরিচায়ক।

দ্বিতীয় যুগ

দ্বিতীয় যুগের রচনার প্রধান লক্ষণ—

এইবার আমরা বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের বিষয় অনুশীলন করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ যুগের রচনার প্রধান লক্ষণ বাঙ্গালার সহিত যাবনিক শব্দের অবাধ সংমিশ্রণ—কি গদ্যে, কি পদ্যে, কি গানে, কি পত্রাদিতে, কি দলিলাদিতে। তবে দলিলাদিতে আরবী পার্সী শব্দের প্রয়োগ বাহুল্য আজও বজায় আছে।

সে সময়ে দলিলাদির জন্য কিংবা রাজদরবারে যে বাঙ্গালা গদ্য ব্যবহৃত হইত তাহা কেবল আরবী পার্সী আর সংস্কৃতের সংমিশ্রণ মাত্র।

শিবরতন মিত্র মহাশয়ের Types of Early Bengali Prose নামক পুস্তকে ইংরেজী আমলের পূর্ব্বেকার বহু দলিল দস্তাবেজ ও পত্রাদির নমুনা লিপিবদ্ধ আছে, নিম্নে তাহার কয়েকটী মাত্র উদ্ধৃত হইল ঃ

"নকল সনদ বমহর রাজা আসদুল্ল। খাঁ সাহেব—সন ১১১৩ সাল তাঃ—৮ মাঘ

হুকুম শ্রীযুত দেওান সাহেব জী—

ইজ্জত আসার বৈকুণ্ঠরাম দর্ত্ত সিকদার ও মধুসূদন সর্ম্মা কারকুন সুচরিতেষু আগে তরফ খএরাত সেখ আবদুল্লার ও সেখ আবদুল মোমেন সাং দুর্গাপুর আরজ হইলা জাহির করিলেন জে পরগণা খটঙ্গা দুর্গাপুরে

খএরাত জমি সালি ১০ দষ বিঘা পাই ভোগ করিতেছি সনন্দ রাখি এখন সীকদার সনন্দ তলব করে জে হুকুম হয় তাহার আরজ যুনিঞা হুকুম করিল সনন্দ তহকীব করহ জদি মো' সনন্দ ভোগ প্রমান খএরাত মনযুর রাখিল সনন্দ করিয়া দেহ অতএব সনন্দ তহকীব করা গেল সনন্দ সন ১১০৩ সাল ২১ অগ্রান ৮০ দাগে অজবঞ্জর সালি মাঠ জমা খারিজ হুজুরের মুহর্ব্বে জাহিব করিলেক অতএব মোং পূর্ব্ব সোনন্দ ভোগ প্রমান খএরাত মনযুর রাখিল মোং কীং পঞ্চানন রায় বকসী জাএ মোং খএরাত ছাড়িয়া দিহ তপসীল জএন

মৌফীক পরওানা জমা দষ বিঘা জমা আট তঙ্কা নএ আনা সাড়ে ভোগ প্রমান ছাড়িঞা দিহ ইতি ৮ মাঘ ১১১৩ শন।"

দাস দাসী বিক্রয়ের দলিল

৭ই ইয়াদিফীর্দ্দ শ্রীশঙ্কর দাস উলদে রুদ্রদাস গাকীম পরগণে বেজোড়া সদাসয়েষু লিখিতং শ্রীবোদাইর স্ত্রী সাকিম বেঙ্গাডুবা পরগণে মজকুরে কস্য মুনিস্য আজীরি পাট্টা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে—আমি আপনা খুসরজ ও রসবাত পুরাকত আকাম বিনা ওজর ইতবারে তোমার পান হনে রে আজি তিন রূপায়া লৈয়া আমার বেটী যার উমর এগার বরিস তুমার স্থানে আফির খাস করিয়া দিলাম। লআজীমা খুরাক পোষাগ খাইয়া পীন্দিয়া মুর্দ্দত সর্ব্বের বরস খেদ মত আবকসী ওমাহর করিব। যদি এই মুর্দ্দতের মৈদ্ধে ফারগ হৈবার চাহে তবে দশ মণ তামা আরিব দিআ আখাগস হইব। দান বিক্রয় অধিকার দাসী তুমার আমার কিছু এলেকা নাই এতদর্থে আজীরি পাট্টা লেখিয়া দীলাম ইতি সন ১১২৫ সাল তাদবিথ ২০ রাম্মা মাহে ৬ই চৈত্র শ্রীবোদাইর স্ত্রী ও শ্রীমতী কনাই।

/৭ শ্রীশ্রীদুর্গা

চরণ শ্বরণং

ইআদিফীর্দ্দি সকল মঙ্গলালয়

শ্রীমতী কোমলমুনী কল্যানীয়াবরেষু

শ্রীরামভদ্র দেবশর্ম্মন
শাক্ষির বাউতি

লিখিতং শ্রীরামভদ্র দেবশর্ম্মন দানত্তর পত্রমিদং

লিখনং কার্য্যনঞ্চ আগে আমার সন্তান রহিত তুমি কন্যা আর কেহ ক্রীয়াআদী আমার করে এ মত নাই একক্ষন। ক্রীআত্তা তুমী একারণ আপন সেৎসা পুর্ব্বক আপন ভদ্রাশন ও জমী ও পুস্কনি সাকিম তপশীল মবলগে ৫৮/ আঠার্ন্ব বিঘা ব্রহ্মত্তর পৈত্রীক ও শৌপাজ্জীত ও সিস্য সেবক জেখানে জে আছে তাহা সমস্ত নেত্তকিত্তী তোমাকে দিলাম জেতক জীবিত থাকীব তদবধী আমার ও আমার স্ত্রির শেবা সুছশাআদি করিতেছ করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম জথাজোগ্‌গ করাইবা আস্তষ্ট ক্রীয়াআদী করিয়া সাকিম তপসীল জমী আবাদ তবদুদ্‌ করিয়া ও সিস্য সেবক বহাল রাখিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করিয়া ইহার দান বিক্রয়ের সত্তধিকার তোমার আমী কীম্বা আর কেহ দাত্তা করে শে ঝুটা ও বাতিল এতদর্থে দানত্তর পত্র দিল ইতি সন ১১৬৩ এগার সত্ত তিষট্টী সাল তারিখ ১৭ই মাঘ।

তপসীল—

(জমীর বিবরণ—)

৫৮/

মবলগে আঠান্ন বিঘা

মদনেশ্বর শিব

ঠাকুরের

পরগণে সরূপ সিংহের ইজার্দ্দার ও সিবিস্তদোর...বাজে জমির তহসিলদার প্রতি বেদানন্দ আগে মৌজে কোটাবুরের শ্রীমহাদেব সর্ম্মা ও শ্রীশিবু শর্ম্মা (ছেঁড়া)...পরগণা মজুকুরের মোজে কুসটিকুরি (ছেড়া) ...পূর্ব্ব ও সনকপুরদিগের ৺দেবত্তর (ছেড়া)...বিঘা সাবিক গোড়া (গোণ্ডা)খারিজ মুহুব্বাই আছে তাহার ফসল সবে চাকলা কোরক হইয়াছে অতএব দপ্তর তকরার করা গেল ইহার ৺দেবত্তর গোণ্ডা (গোড়) খারিজ মুহুব্বাই বহাল আছে আমল জামুল ভোগ প্রমাণ দেবত্তর জমির ফসল জায়মত ছাড়িয়া দীবে আটক না করিবে ইতি সন ১১৯৯ সাল তারিখ ১৭ই সতরই পৌষ

সকল মঙ্গলালয় শ্রীরাধাবিনোদ সিংহ সচ্চরিতেষু

লিখনং কার্য্যঞ্চাগে মৌজে টিকরবেতা পরগণে সেনপাহাড়ি সামিল তরফ মন্ত্রেস্বর মৌজে মজকুরে গ্রামের ইসান ভুঞার পুষ্করিণীর উত্তর রাস্তা ও সাধুর পুষ্করিণীর পূর্ব্ব রাউতলা ও বুড়ির পুষ্করিণীর

পারকী সেহর
জমী সমেত বেওয়ারিষ
পুষ্করণী ছয় বিঘা
বার কাঠা ইতি

পশ্চিম কিসমত গুরুপ্রসাদ ঘোষ ও কিসমত কৃপারাম ঘোষ রাইয়তি ও খামার ও বাজে জমী দরুণ গুরুপ্রসাদ ঘোষ দিগর মাফিক তফশীল সালিজমি ৫/২ পাচ বিঘা দুই কাঠা আর ইহার উত্তর ও পশ্চিম বেওয়ারিষ খামার দরূণ:কয়রা গড়্যা মায় পাহাড় ১৷৷০ এক বিঘাদশ কাঠা একুনে জমি ৬৷৷২ ছয় বিঘা বার কাঠা তোমায় দরখাস্ত মতে পুষ্করিণী

খাত কারণ দেয়া গেল মাফিক তপশীল চকনামা জমি চিহ্নিত করিয়া লইয়া পুষ্করিণী খাত করিয়া শ্রীশ্রী৺কে অর্পণ করিয়া জলে মৎস্য জিলাইয়া পাহাড়ে বৃক্ষাদি রোপন করিয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে পরমসুখে ভোগ কর ইহার রাজস্ব সহিত দায় নাই ইতি সন ১১৯৯ এগার সত্ত নিরানব্যই সাল তারিখ ৭সাতঞী চৈত্রী। জমীর জায়—

মহামহিম শ্রীমুরসিদাবাদের শ্রীযুত ক্লেকটর সাহেব

বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীলালমোহন সিংহ

মুচলিকা পত্রমিদং সন ১২০১সাল

লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে আমার তালুক তরফ শ্রীকণ্ঠপুর দিগর পঞ্চসালা রেজষ্টরী করাই তাহার কারণ তাহার রকবাবন্দী কাগজ আমী দখলে করিলাম কাগজ মজকুরে জমী ও

শ্রীলালমোহন সিংহ
বঃ শ্রীপঞ্চানন সিংহ

হস্তবুদ জে লিখিয়া ছিলাম জদি কোন দফা ছাট ও তকরর করিয়াছি এমত প্রমাণ হয় তবে সদর ইতলাতে আমার জে জরিমানা হইবেক তাহা দিব এবং এতদর্থে মুচলিকা পত্র দিল ইতি

আত্ম বিক্রয় পত্র

ইয়াদী কীর্দ্দি সকল মঙ্গলালয়

শ্রীলালা গুরুদাস রায় অওলাদে শ্রীযুক্ত মহারাজ নন্দকুমার রায় ইবনে পদ্মনাভ রায় সচ্চরিত্রেষু লিখিতং শ্রীচারু বেওয়া অওলাদে তীতু গোপ ইবনে গঙ্গারাম গোপ বন্দা আটীবি পত্র মিদং সন ১১৭৭ এগার শত সাতাত্তরি অব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে অকালে অন্নাভাবে

মরি মহাশয়ের নিকট আত্ম বিক্রয় হইলাম ভরণ পোষণ করিয়া দাস্তে দাখিল করিবেন। একরার বিকাইলাম ইহাতে পলাইয়া যাই ধরিয়া আনিয়া শাস্তি করিবেন এতদর্থে বন্দা আটাবি পত্র দিলাম। ইতি সন সদর বতারিখ ৫ জমাদিলৌন মোতাবেক ১৪ই ভাদ্র

শ্রীচারু বেওয়া সাং ঘরুতা

[১২১০ সাল]

সম্প্রতি তারকেশ্বরের মোহন্তর প্রসিদ্ধ মামলার আপীলের Paper Boo..এ কয়েকখানি অতি প্রাচীন দলিলের ও আদালতের বিচারক কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় প্রদত্ত রায়ের অনুলিপি মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সন ৭৮৫ সালের রাজা ভারামল্লের ছাড়পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; ইহা অপেক্ষা প্রাচীন দলিলের নকল আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই—

রাজা ভারামল্লের ছাড়পত্র (সন ৭৮৫ সাল)—

৺শ্রীশ্রীরাম

স্বস্তি সকল মঙ্গলময় শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর ঠাকুর চরণযুগলেষু—

দেবত্তর জমি পত্রহ মিদং কার্য্যনঞ্চাগে পরগণে বালিগড়ি ও সেনাবাগ দীঃ গ্রাম জোতশমস, ভঞ্জপুর, নাগাদী সাঙ্খাপুর—এই সকল গ্রাম সেবার কারণ—জমি

নাগরী সহি

শ্রীরাজা ভারামল্ল রায়

শালীশুনা হর্দ্দ মহদুদ ঘোড় দৌড় জতজোত করিতে পার তাহা জোত করিবে—সেবাত শ্রীযুক্ত মায়াগিরি ধূম্রপান মোহন্তীতে নিযুক্ত থাকিয়া জুতিয়া যোতায়া শ্রীশ্রী৺সেবা করহ এ সকল জমির রাজস্ব সহিত দায় নাস্তি ইতি সন ৭৮৫ সাল ১০ই চৈত্র।

উক্ত Paper Book হইতে ১৭৯১খৃষ্টাব্দের আদালতের Judgment

এর নকলও নিম্নে প্রদর্শিত হইল ; ইহা হইতে জানা যায় যে তখন judgmentও বাঙ্গালায় দেওয়া হইত :—

Judgment in Parasuram Giri V. Fate Giri and others (passed on 6th may, 1791)—

"ফরিয়াদী আর্জ্জী দেয় শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বরে স্থানের আমার তিন পুরুষ ক্রমাগত ঐস্থানে মোহন্তগিরি করিয়া আসিতেছেম আমায় গুরু ৺প্রসাদ গিরি মোহন্ত বর্ত্তমান থাকিতে আমিহ তির্থ জাত্রায় গিয়াছিলাম —সন ১১৯২ সালে মাহ আশাড় আমার গুরুজিউয়ের আসন্নকাল উপস্থিত হইলে আমার না থাকাতে আমার খুড়া জগন্নাথ গিরি গ্যোঞীকে [গোসাঞীকে ?] ডাকাইয়া মাল আমাল ও কাগজপত্র সেবা সদাব্রত ও মোহন্তগিরি আমার কারণ সরফর্দ্দ করিয়া তাহার পরলোক হইল জগন্নাথ গিরি গোসাঞী সেইরূপ চালাইতেছিলেন। ঐ সন মাহ আশ্বীনে গতিয়া (গেতি) ভাই একালা ফতেগিরি রাজবাটীতে খেলাপ নালিশ করিয়া মোহন্তগিরি দখল করিতে গিয়া অনেক তছরূপ করিতে জগন্নাথ গিরি হুজুর জাহির করিতে ফতেগিরির মোহন্তী দখল বাতিল হইল জগন্নাথগিরি মোহন্তাতে বহাল রহিল সন ১১৯৫ সালে মাহ পোষে আমী তির্থ হইয়া আসিয়া ৺স্থানে পৌছিতে জগন্নাথগিরি গোসাঞী মোহন্তীর বিশয় আমায় জেম্মা করিয়া দিলেন আমীহ মোহন্তগিরিতে সকল কার্য্য ভার লইয়া ৺জিয়ের সেবাতে নিযুক্তে রহিলাম সন ১১৯৬ সালে মাহ কার্ত্তিকে আমী ৺গঙ্গাস্নান যাইতে মফস্বল ফতেগিরি থানখা কারসাজী করিয়া থানাদারকে হামরায় (দলবদ্ধ) লইয়া আমার গোমস্তার স্থানে কাগজ ছেনাইয়া লইয়াছে আমী* * *

উক্ত Paper Bookএ মুদ্রিত ২৭শে আষাঢ়, সন ১২২১ সালের মোহনগিরির আমলনামার অনুলিপির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ইয়াদি ফির্দ্দি শ্রীমোহনগিরি মোহন্ত সুচরিতেষু—

লিখিতং কার্য্যনঞ্চাগে তরক ভাণ্ডারহাটী ওগায়েরহের মহল (কাটা) দিগরের মধ্যে বালিগরী পরগণার সেট গুরীয়া ২ দুই মৌজা মহলাতের কাত জমা শালিয়ানা মালগুজারী ৯৭৮॥০টাকা মহলের ৫ শত টাকা পনে তোমাকে মফস্বলি পত্তন তালুকদারী পত্তন করিয়া পনের টাকা বেবাক পাইলাম তুমি মারীফ তফশীল জএন মহালৎ মজকুর আমল মামল মাফিক জামিন মাল আমার ও চাকরাণ হাসিল ও পতিত ও জঙ্গল ও জলকর ও বনকর ও বাগাত ও ফল ও পুষ্করিণী ও বিল ও ঝিল হকুক জমিদারী যে আছে তাহা দখল করিবে সরকারী খাশ বাগান ও হাবেলী পুষ্করিণী যে সকল সরকারের খাশ দখলে (কাটা) সহিত এলাকা নাই, মাল গুজারীর টাকা সিক্কা সহি মাস ২ কিস্তী ২ (কাটা) ভাণ্ডারহাটী ও গায়রহের কাছারীর বরাবর সরবরাহ করিবে কোন মতে খারিজ হইতে পারিবে না। * * *"

উক্ত Paper Book হইতে মোহন্ত রঘুনাথ গিরির অনুকূলে মোহন গিরি কর্ত্তৃক ২রা আশ্বিন সন ১২৪৯ সালে লিখিত নিয়ম পত্রের অনুলিপি হইতে কিয়দংশ নীম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"লিখিতং শ্রীমোহনগিরি মোহন্ত রাজা

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয়—

শ্রীযুক্ত রঘুচন্দ্রগিরি কল্যাণবরেষু

কস্য মালিকত্ব নিয়মপত্র মিদং সন ১২৪৮ সাল অব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে বালিগড়ি পরগণায় জ্যোৎশম্ভু গ্রামে ৺তারকেশ্বর শিব-

ঠাকুরের গদীনশিন মোহন্তীতে আমি কায়েম থাকিয়া ৺গুরু ও পরম-গুরু আমলের সকর ও নিষ্কর ভূম্যাদি ও আসবাব ইত্যাদি ভোগ দখল ও ৺সেবা ও অতিথিসেবা আদি করিয়া আসিতেছি এবং স্বয়ং নিজনামে আমার বহু পরিশ্রমে স্বোপার্জ্জিত দৌলত দ্বারা পত্তনী তালুক আদি যাহা করিয়াছি ও আসবাব আদি যাহা মজদ আছে ও স্বোপার্জ্জিত খাতকান সকল স্থানে যে সকল পাওনা আছে আমার প্রাচীন অবস্থায় শরীরে ভদ্রাভদ্রের কথা বলা যায় না—পূর্ব্বে যে সকল চেলা মুণ্ডন করিয়াছিলাম তাহারা কতক স্বর্গে ঈশ্বরপ্রাপ্তি হইয়াছে * * * এতদরে রীতিমত খোরপোষ পাইবে। এমতে সম্যক বিষয়ের মালিক ও গদিনাশন তোমাকে করিয়া নিয়মপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৪৯ সাল তাং ২রা আশ্বিন।

ইসাদি—* * * *"

চৈতন্য সম্প্রদায়ের বাঙ্গালা রচনা—

পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্য নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ—"চৈতন্যদেব ১৪০৭ বা ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। * * চৈতন্যচন্দ্রের কিছুদিন পরেই বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। * * বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত কিছু সরল ও বিশদ; কৃষ্ণদাসের চৈতন্য চরিতামৃত কিছু কঠিন ও জটিল; কিন্তু এ দুয়েরই ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। রূপগোস্বামীর রিপুদমন বিষয়ে 'রাগময়কণ' নামক একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ দেখিতে পাই। সনাতন গোস্বামীর 'রসময় কলিকা' ও শ্রীমজ্জীব গোস্বামীব 'করচাই' বাঙ্গালায় রচিত। [এতদ্ব্যতীত ইঁহাদের সংস্কৃত গ্রন্থ অনেক ছিল] * * * চৈতন্যদেব

নিজে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অতিশয় ভক্তি করিতেন; তাহারই ফল রাগময়কণ, রসময় কলিকা, করচাই, চৈতন্যভাগবত চৈতন্য চরিতামৃত ও লোচন দাস প্রণীত চৈতন্যমঙ্গল ইত্যাদি। তবে এ সময়ের বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ বলাধান হয় নাই। স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইলেও যেন তেজহীন।”

বৈষ্ণব কবিদিগের হাতে বাঙ্গালা সাহিত্য—

এইখানে আর একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। উপরে মাত্র কয়েকজন বৈষ্ণব কবির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে আদিম অবস্থায় এই বঙ্গভাষার পরিপুষ্টির জন্য বৈষ্ণব কবিরাও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ বলিয়াছেন:—“বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিবৃন্দ যে বঙ্গভাষার অনেক অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; তাঁহাদের যত্নবারি সিঞ্চিত না হইলে বঙ্গসাহিত্য অকালেই লয়প্রাপ্ত হইত; ইহা জন্মগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব-কবিগণেরই অঙ্কে লালিত ও পালিত হইয়াছে; * * আমরা যে এক্ষণে আমাদের নিজের ভাষায় সকল প্রকার কথোপকথন করিতে পারিতেছি ইহা তাঁহাদেরই অনুগ্রহে, না হইলে আমাদের মাতৃভাষায় আমরা এক্ষণেও সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম কি না, কে বলিতে পারে? * * সাধারণ লোকে তখন পারসী ভাষারই প্রতি অনুরক্ত ছিল; পণ্ডিতগণ সংস্কৃতের আলোচনা করিতেন; সুতরাং সে সময়ে কেবল বৈষ্ণব কবিগণই ইহার উপর সদয় ছিলেন—এবং তাঁহাদের এই সদয় ব্যবহারের জন্যই বাঙ্গালা ভাষা আজিও জীবিতা রহিয়াছে ও দৈনন্দিন ইহার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল করিতেছে।”

উক্ত চৈতন্য যুগের রচনার মধ্যে রূপগোস্বামীর 'কারিকা' ও 'রাগময়ী কণা,' সনাতন গোস্বামীর 'রসময় কলিকা,' নরোত্তম ঠাকুরের 'আশ্রয় নির্ণয়' ও 'দেহ কড়চা,' বৃন্দাবন দাসের 'গোলক সংহিতা,' জীব-গোস্বামীর 'করচাই,' কৃষ্ণদাসের 'আত্মজিজ্ঞাসা,' 'আত্মনিরূপণ,' 'স্বরূপ বর্ণন', ত্রিগুণাত্মিকা,' 'ব্রজপটল কারিকা', 'ক্রিয়ামঞ্জরী,' 'তত্ত্ব নিরূপণ', 'জিজ্ঞাসা পত্রী', 'সহজ তত্ত্ব' বা 'ভক্তি চন্দ্রিক.' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এ পুস্তকগুলির অধিকাংশই প্রশ্নোত্তর ধরণে রচিত। বলা বাহুল্য, এ পুস্তকগুলিতেও রচনা পারিপাট্য কিছুই নাই ; অলঙ্কার বা শব্দাড়ম্বরও কিছুই নাই। তবে এ পুস্তকগুলির ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নতস্তরের এই হিসাবে যে এ পুস্তকগুলির প্রত্যেকটী সারগর্ভ ও উপদেশ মূলক। ক্রমবিকাশ রীত্যনুসারে এই পুস্তকগুলির রচনা আদিযুগের রচনা অপেক্ষা একটু ভাল, একটু উন্নত বলা যাইতে পারে। দীনেশবাবু তাঁহার ইংরেজিতে লিখিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য' নামক পুস্তকে এই সহজিয়া সাহিত্য বিষয়ক পুস্তকের একটী সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন ; তাহার মধ্যে অনেক গুলিতেই গদ্য রচনা আছে এবং তাহার অধিকাংশই চারশত বৎসর পূর্ব্বেকার রচনা।

রাগময়ী কণা—

পূর্ব্বোক্ত শিব রতন মিত্র মহাশয় এই "রাগময়ী কণার" রচনার নমুনা উদ্ধৃত করিয়াছেন ; তিনি যে পুথি হইতে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে লেখক, লিপিকাল বা রচয়িতার নাম পান নাই। এই রচনার কিয়দংশ নিম্নে প্রদর্শিত হইল ; "অথ গোস্বামীদিগ্যের উপাসনা ॥ ৩ ॥ তিন মত তাহার বিবরণ ॥ প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ ॥ রাগে কহি উপাসনা সিদ্ধের লক্ষণ ॥ উপাসনা হয় য়েক কৃষ্ণের মনন ॥ শ্রীকৃষ্ণের মন কি তিন য়ক্ষর হয়।

রাধিকার স্মরণ কি। না। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোব্রিন্দ রাধেকৃষ্ণ॥ লিলা কি ঃ কৃষ্ণ লিলা ঃ গউর লিলা ঃ নিত্যানন্দ লিলা ঃ রূপ কি॥ শ্রীমতি রাধিকা জিয়ের রূপ। সে কেমন॥ না সর্ন্নবর্ণ॥ সর্ণকান্তি। আর কৌমারি॥ বয়েষ কাঞ্চন ঃ পাঞ্চালিকা ঃ গুণরস ঃ দুইজনের বয়েস পঞ্চদশ॥ য়ক্ষরের সেষ নানা বর্ণ ধরে সেই মধ্যম য়ক্ষর॥ বিজ য়ক্ষর কি ঃ শ্রী৵ মূলা রূপ কি ঃ যার সোন গতি কি ঃ অনুরাগ ঃ মানস কি : না দশা কোন দশা রাগদশাঃ বয়শ কি না চদ্যবৎসর॥ আঠার দিন॥ পান কি না হরিনাম॥ ধারণ সিঞ্চন কি ঃ প্রেমনির॥ ধাম কোথা রাধাকুণ্ডে॥ য়াসন কি না নিত্য বসন॥ ছন্দ কি না গায়ত্রি॥ হ্রিসিকেশ ঃ স্থান কোথা ? সরোবরে॥ কোন সরোবর ঃ রাধাকুণ্ডু ঃ পিবস্ত ঃ কৃষ্ণ তার য়তি অনুপাপ ঃ রাধাকুণ্ডের পূর্ব্বতটে॥ কৃষ্ণের আক্ষান। কৃষ্ণের বাহিরে য়াছে।

উপাসনা॥ উপাসনার নাম কি। যুগল মন্ত্র ঃ পঞ্চনাম॥ রাধিক্যার স্বরূপ কি॥ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কি॥ অনুগা কি॥ ধর্য্য কি : কি রস মাধুর্য্য উপাসনা কি॥ কাম গায়ত্রী কারে বলি॥ শ্রীকৃষ্ণ কামবিজ শ্রীরাধিকার সত নাম মাধুর্য্যে গুণ তিন য়ক্ষর॥ মাধুর্য্যের গুণ শ্রীমতি * * * সে সকল কথার বিবরণ॥ কেবল রাগ দশ। শ্রীরূপ মঞ্জরী শ্রীরাধিকার বস্তধারি। শ্রীরূপ সনান্তন রাধিকার অংশ। তিন জন এক বটেন॥ রসের সমতা॥"

ইহার পাদটীকায় শিব রতন বাবু লিখিয়াছেন ঃ 'শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত রাগময়ী কণা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল'।

শিবরতন বাবুর পূর্ব্বোক্ত পুস্তক হইতে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় রচিত বাঙ্গালা গদ্যের আরও কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

রস নির্ণয়।

"অথ রস নির্ম্ময়॥ সম্ভোগ বিপ্রলম্ব এই দুই ২॥ অম্ভোগে ৪ চারি॥ বিপ্রলম্বে ৪॥ অথ সম্ভোগ জায়॥ অভিসার ১। বাসক সজ্জা ২। খণ্ডিতা ৩ সাধন ভক্তি ৪ এই চারি॥ অভিসার অষ্ক॥ উৎকণ্ঠাভিসার ২। অন্তকালাভিসার ৩। দিবাভিসার ৪। শ্রীতাভিসার ৫॥ তপ্তোভিসার। বাদরাভিসার ৭। তিমিরাভিসার ৮। এই অষ্ক॥ বাসকসয্যা অষ্কক। পূর্ব্ব গোষ্ঠ্য ১ রূপ ২ সংরতি ৩। রূপোল্লাস ৪। কিলকিঞ্চিৎ ৫। মিলন রাষ ৬। পরিক্ষা রাষ ৭। নর্ত্তক রাষ ৮। খণ্ডিতামষ্ক॥ হুলি খেলা ১। দানখণ্ড ২। নৌকা খণ্ড ৩। জলকেলি ৪। হিন্দোলা ৫। ঝুলনা ৬। পাসাখেলা ৭। বংশি হরণ এই ৮॥ সাধীন ভক্তিকা অষ্ক॥ মহারায ১ রাসপুষ্কি ২ নবঢ়া ৩ রসালস ৪। সম্ভোগ ৫। প্রার্থনা ৬। আলস ৭। মানভঞ্জন ৮।

* * *

অথ নায়িকা নির্ম্ময়॥ সাধ্যা ১ মধ্যা ২ প্রগল্ভা ৩। মধ্যা ত্রিবিধা। ধীর মধ্যা ১ অধীর মধ্যা ২ ধীরা ধীরা মধ্যা ৩॥ প্রগল্ভ। ধীব প্রগল্ভ ১ অধীর প্রগল্ভ ২ ধীরাধীর প্রগল্ভ ৩ মুগধ্যা ১। ৭॥

* * *

অথ মালা নির্ম্ময়॥ রূপমালা ১। রঙ্গমালা ২। সর্ণমালা ৩। বনমালা ৪। ভানুমালা ৫। অনঙ্গমালা ৬। গুণমালা ৭। রসমালা ৮। রত্নমালা ৯। প্রেমমালা ১০। প্রিতমালা ১১। [illegible]লামালা ১২। সুরঙ্গমালা ১৩। বিলাসমালা ১৪। বিদ্যুৎমালা ১৫। কস্তুরীমালা ১৬। প্রজ্ঞমালা ১৭। * * *

সখি পঞ্চ। সখি নিত্য সখি প্রাণ সখি প্রিয় সখি পরম প্রেষ্ঠা সখি ৫। * * * *

অথ সপ্ত দ্বিপ ॥ জম্বু দ্বিপ ব্রহ্ম দ্বিপ কুশদ্বিপ মায়াদ্বিপ বিষ্ণুদ্বিপ নিলদ্বিপ বাউদ্বিপ। সমুদ্র ৭ ॥ লবণ ইক্ষু সুরা সপ্যি দধি দুগ্ধ জনান্তকা ৭ ॥" * * *

সুশীল বাবু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরকীয়া তত্ত্ববিষয়ক যে পত্রাকার রচনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার নমুনাস্বরূপ কিয়দংশ নীম্নে উদ্ধৃত করা হইল: "পরে আমরা কহিলাম গৌড়দেশে শ্রীশ্রী৺প্রভুর পাদাঙ্কিত স্থান সেখানে শ্রীশ্রী৺ভাগবত শাস্ত্রী আছেন এবং সভাসৎ স্থান আছেন তাহারা মহোপাধ্যায় বিচার হইবেক গৌড়ে পরকীয় ধর্ম্মের অধিকারী তাহারা স্বকীয় ধর্ম্ম লবে কেন এখানে যেমৎ সভাসদ্ হইল গৌড়দেশে অনেক সভাসদ্ আছে বিচার করিবেক অতএব এখানকার সভাসদ্ এক পণ্ডিত ও এক মনস্বোপদার যায় তবে বিচার করিয়া স্বকীয় ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া আইসে তাহাতে সর্ব্বসম্মতমতে শ্রীযুত মহারাজা সভাসদ্ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য জিঁহো স্বকীয় পরকীয় বিভিন্ন করিলেন তিঁহো দিগ্বিজয় মহারাজার গভা হইতে তাহাকে আনিয়া এবং এক মনস্বোবদার সহিত প্রয়াগ ও কাশী হইয়া আইলাম তারাও স্বকীয়ায় দস্তখত করিয়া দিলেন। পরে গৌড়দেশে আসিয়া গোস্বামীগণ ও মহান্ত-সন্তান মহান্তশাখাগণ যে যে স্থানে আছেন সর্ব্বত্র অনেক বিচার হইল সকলে বিচারে বিগ্বিজয়ী স্থানে অজয় পত্র দিলেন পরে শ্রীপাঠখণ্ডে আইলাম তাঁহাদের সহিত অনেক কথোপকথন হইল তাহারা কহিলেন আমরা শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভুমতাবলম্বী তাঁহার মতাধিকারী শ্রীশ্রী৺ছয় গোস্বামী তাঁহারা যে মত অবলম্ব গ্রহণ করিয়াছেন সেইমত আমরা যাজন করি সেই সব মতের সার গোস্বামীরা বেদ-প্রাণিত এবং ওম্-প্রাণিত এবং রস-প্রাণিত

যে সকল ভাগবত শাস্ত্র করিয়াছেন তাহা ব্যতিরেক করিয়া আমরা স্বকীয়ায় কিমত দস্তখত করিব * * * " ইহার বিবৃতিকালে সুশীল বাবু লিখিয়াছেন—"a passage from an old document dated 1125 B. S. relating to Baishnav triumph of Radha mohan Das Thakur."

নরোত্তম ঠাকুরের আশ্রয় নির্ণয়—

ইতিপূর্ব্বেই রূপগোস্বামীর 'কারিকার' রচনার নমুনা দেখাইয়াছি। এক্ষণে নরোত্তম ঠাকুরের গদ্যের কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি; "অথ আশ্রম নির্ণয়। আশ্রম পঞ্চ প্রকার। কি কি পঞ্চ প্রকার। নামাশ্রয় মন্ত্রাশ্রয় ভাবাশ্রয় প্রেমাশ্রয় রসাশ্রয় এই পঞ্চপ্রকার। সেবা কয়মত প্রকার হয়। সেবা দুই মত প্রকার হয়। কি কি দুই মত। সাধকরূপে সেবা আর সিদ্ধিরূপে সেবা; প্রেম বলি কারে। শ্রীমতী রাধিকা। প্রেমের অন্তর কি। আশক্তি। আশক্তি বলি কারে। পরকিয়া ভাবে প্রীতি। পাত্র কি! শ্রীরাধা কৃষ্ণ। কোন্ রতি। বিলাস রতি।"

নরোত্তম ঠাকুরের এই আশ্রয় নির্ণয় গ্রন্থের প্রাচীনতম পুথির তারিখ সন ১০৯৮ সাল। ইঁহার অপর পুস্তক 'দেহ কড়চা'; দেহ কড়চার প্রাচীতনম পুথির তারিখ ১৬৮১ খৃষ্টাব্দ। দেহ কড়চাখানিও উপদেশমূলক পুস্তক।

নরোত্তমের দেহ-কড়চা ও আত্মজিজ্ঞাসা দুখানি গ্রন্থই গূঢ় উপদেশ-মূলক। এ দুইখানিতে ভাষা মাধুর্য্য বা অলঙ্কার নৈপুণ্যের নাম মাত্রও নাই। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে দেহ-কড়চার প্রারম্ভ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তৎপার্শ্বে বন্ধনীমধ্যে আত্মজিজ্ঞাসার পাঠ সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন; এই দুই পুস্তকের ভাষার বা বর্ণিতব্য

বিষয়ের কত নিকট সম্বন্ধ তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে সহজেই অনুমিত হইবে :—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ [শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ]। [অথো আপ্ত জিজ্ঞাসা] তুমি কে। [আমি কে।] আমি জীব [জিব]। তুমি কোন জীব [কোন জিব]। আমি তটস্থ জিব ॥ থাকেন [থাক] কোথা [কথা] ভাণ্ডে। ভাণ্ড কীরূপে [কিরূপে] হইল। তত্ত [তর্ত্ত] বস্তু [বস্তুতে] হৈতে [হৈল] তত্ত বস্তু কি কি [কি কি তর্ত্ত বস্তু]। পঞ্চ [পঞ্চ ভূ] আত্মা। একাদশেন্দ্র [একাদষ ইন্দ্রি]। ছয় রিপু ইচ্ছা [জ্ঞান] এক সকল য়েক [এক] যোগে [জোগে হৈল] ভাণ্ড হৈল। পঞ্চাত্মা কে [পঞ্চভূ আত্মা কাখে বলি]। প্রিথিবী আপ তেজঃ বাউ আকাশ [আপু তেজ বাউ বর্জ্জ আকাশ এই পঞ্চ]॥ একাদশীন্দ্র কে কে [একাদস ইন্দ্রি(য়) না(ম) কি]। কর্ম্ম ইন্দ্র পাঁচ [কর্ম্ম পঞ্চ ইন্দ্রি]। জ্ঞানীন্দ্র পাঁচ [জ্ঞান পঞ্চ ইন্দ্রি]। আচরন এক [মন এই একাদস ইন্দ্রি]।

নরোত্তম ঠাকুরের বাঙ্গালা গদ্যের আরও নমুনা, যথা—"জাখে দেখি নাঞি তাকে কীরূপে ভাবিব * * * তাথে গর্ভদশা ইব স্থিতি ॥ * * তেহোঁ কে॥ তেহঁ প্রথম পুরুষ"—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৪। ইহা ষোড়শ শতকের রচনা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ" নামক পুস্তক পাঠে জানা যায় যে এই নরোত্তম ঠাকুর ১৪৫৩ কি ১৪৫৪ শকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি রামপুর বোয়ালিয়ার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলোদ্ভব ছিলেন। ইহা

পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ ও মাতার নাম নারায়ণী। কৃষ্ণানন্দ একজন রাজা উপাধিধারী সমৃদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন।

বৃন্দাবন দাসের গোলক সংহিতা—

বৃন্দাবন দাসের গোলক সংহিতার ভাষা, যথা—"রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র সনি তদুপরি দুই লক্ষ প্রহরের পথ চন্দ্র। তদুপরি দুই লক্ষ জোজন তারকমণ্ডল। তদুপরি পঞ্চাশলক্ষ জোজন সপ্তসর্গ। সপ্তদশ লক্ষ জোজন তদুপরি ভুবলোক।"

এই গোলক-সংহিতা ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব বিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক। ইহা অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে রচিত বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রারম্ভ গদ্যে; তবে উত্তরাংশে পদ্যও আছে। গদ্যাংশ হইতে আরও কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদর্শিত হইল :—"সর্ব্বাদৌ মহাশূন্য। তদুপরি অন্ধকার। তদুপরি ধুন্ধুকার। তদুপরি স্থির পবন। তদুপরি কুর্ম্মরাজ। তদুপরি ঐরাবত। অনন্তের সহস্র ফণা। আর মহাফণা। তারপরে সপ্ত পাতাল। কি কী। অতল ১ বিতল ২ সুতল ৩ তলাতল ৪ রসাতল ৫ মহাতল ৬ পাতাল ৭ এই সপ্ত পাতাল। তদুপরি পৃথিবি। পৃথিবি বেষ্টিত সপ্ত সাগর॥ কি কী॥ লবণ ১ ইক্ষু ২ সুরা ৩ সর্পিস ৪ দধি ৫ দুগ্ধ ৬ জলাস্তকা ৭ সপ্তদ্বিপ বেষ্টিত সপ্ত সাগর। সপ্ত দ্বিপের নাম কি। জম্বুদ্বিপ পক্ষাদ্বিপ কুসাদ্বিপ কাঞ্চনদ্বিপ সাকরদ্বিপ পুস্করদ্বিপ অনন্তদ্বিপ।"

পূর্ব্বোক্ত বাবু সুশীল কুমার দে এই বৈষ্ণব লেখকদিগের গদ্য রচনার কয়েকটি নমুনা দিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা নিম্নে দু একটী উদ্ধৃত করিতেছি :

আশ্রয় নির্ণয় বা ভজন নির্ণয়—

অথ ব্রজে পঞ্চভাব॥ সান্ত ১ দাস্য ২ সখ্য ৩ বাৎসল্য ৪ মধুর ৫ এই

পঞ্চভাব। সান্তের পাত্র কে। সনকাদি মুনিগণ। গুণ কি নিষ্ঠাগুণ। দাস্যের পাত্র ঐশ্বর্য্যে হনুমান ঠাকুর। মাধুর্য্যে ব্রজে সর্ব্বে এবং গোপীগণ। গুণ কি সেবা। সখ্যের পাত্র কে। ঐসর্য্যে অর্জ্জুন ঠাকুর। মাধুর্য্যে শ্রীদাম সুদামাদি। গুণ কি সমতাগুণ। বাচ্ছল্যের পাত্র কে। ঐসর্য্যে বসুদেব দৈবকি। মাধুর্য্যে নন্দ জসোদা। গুণ কি মমতা গুণ। মধুর ভাবের পাত্র শ্রীরাধিকা এবং ব্রজাঙ্গনা সকল॥ গুণ কি শ্রিঙ্গার। ধাম চারি প্রকার। শ্রীবৃন্দাবন ১ গোলক ২ মথুরা ৩ দ্বারকা ৪। শ্রীবৃন্দাবনের পাত্র শ্রীনন্দ-নন্দন। গোলকে স্বয়ং ভগবান। মথুরায় বাসুদেব। দ্বারকায় নারায়ন। ভাব দুই প্রকার। ভাব মহাভাব। ভাবের পাত্র গোপীগণ। মহাঁভাবের পাত্র শ্রীমতি রাধিকা। ভাব পরকিয়া। কোন পরকিয়া। উর্জ্জল পরকিয়া। কোন উর্জ্জল। রসোর্জ্জল। কোন রস। প্রেমরস। কোন প্রেম। বিলাস প্রেম' কোন বিলাস। মধুর বিলাস। কোন মধুর। জুগল মধুর। কোন জুগল। রাধাকৃষ্ণ।

আত্ম নিরূপণ—

পরম বস্তু হয় জেই কোথা তার স্থিতি। কোথা হইতে আসিয়া করে শতদল পদ্মে স্থিতি। শতদল পদ্মে দেখ সেহ বেহার করে। বেহার সাঙ্গ হৈলে পুনু সেই স্থানে চলে। ব্রহ্ম অক্ষয় বিজ বয়েস নিত্তী কৈসর। নাইকা হইতে স্থিতি॥ নাএকের সঙ্গ হইতে প্রেমরস জন্মিলে। তাহার পরম বস্তুর উৎপতি। তার এক বিন্দু নিকসিলে কামভুবে। কামের দেস হয় কে। চেতন চিন্তিত অঙ্গিকৃত॥ নিতাই চৈতন্য অদ্বৈতে তিন দেসে তিন স্থিতি। মুখে চেতন চৈতন্য বক্ষে চিন্তিত নিত্যানন্দ॥ অঙ্গিকৃত অদ্বৈত অধেতে॥ তিন দেসে তি নরতি! কামের স্থিতি মস্তকে। তাহাকে সর্ত্তা বলি॥ প্রেমের স্থিতি চন্দ্রমণ্ডলে॥ তাহাকে মহাসর্ত্তা

বলি। সত্য জিব আত্মা॥ মহায়াত্মা পরময়াত্মা। জিব আত্মা নারায়ন পরম আত্মা ব্রজন্দ্র-নন্দন।

এই স্থলে আর তিনটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন, প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রাদির নমুনা, দলিলাদির নমুনা, ও বক্তৃতাদির নমুনা। বাঙ্গালায় চিঠিপত্র লেখা অতিপূর্ব্ব কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গের ধনপতি সদাগর বাণিজ্যার্থে বিদেশ যাইবার সময় গৃহে "পত্রী" রাখিয়া গিয়াছিলেন। আবার 'পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হইল দুঃখ' প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বেশীর ভাগ পত্রই পদ্যে।

ডাক্তার সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও বলিয়াছেন "পুরাতন বাঙ্গালায় গদ্য লেখা বেশী পাওয়া যায় না। গদ্য—সাহিত্য দেশে অজ্ঞাত ছিল বলিলেই হয়। পুরাতন বাঙ্গালার গদ্য আলোচনা করিতে গেলে, সাহিত্যের অভাবে চিঠি-পত্র দলিল দস্তাবেজ আমাদের উপজীব্য হইয়া উঠে। গদ্য-সাহিত্য ইউরোপীয় প্রভাবেই গড়িয়া উঠে।" শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত "পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম্-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের" ভূমিকা পৃষ্ঠা ৸৶০—৸৵০।

ফল কথা, এটা বরাবর মনে রাখিতে হইবে যে প্রাচীন কালের গদ্য রচনার নমুনা মিলিলেও তখন পদ্য রচনাই বেশী প্রচলিত ছিল। একে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না; তার উপর গদ্য মনে রাখিবার সুবিধা নয়; তাই তখনকার লোকে গদ্য রচনার দিকে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন না। রীতিমত বাঙ্গালা ব্যাকরণ বা অভিধানও ছিল না। এক কথায় বলিতে গেলে—গদ্য রচনার দিকে লোকের তাদৃশ যত্ন বা আস্থা ছিল না কেহই "গদ্যকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন না।" এইরূপ উপেক্ষায় ও অনাদরে বহু গদ্য গ্রন্থ ক্রমে ক্রমে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

সায়েস্তাখাঁর সময়ের একখানা জীর্ণ দলিল—

শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মজুমদার তাঁহার গদ্যসাহিত্য নামক পুস্তকে সায়েস্তা খাঁর সময়ের একখানা মনুষ্য বিক্রয়ের জীর্ণ দলিলের উল্লেখ করিয়াছেন। "তাহা তৎকালিক বিশুদ্ধ ও সংস্কৃত বাঙ্গালায় লিখিত। তাহা প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিতেছি। '৭ স্বস্তি অনুসন্ত্যলঙ্কৃত সদ্বিরাজ * * বিষম সমর বিজয়ী শ্রীল শ্রীআরঙ্গ সা পাদসা পাদমাভুদায়িনী রাজ্যে তস্বি * * বঙ্গাদি দেশাধিকারি নবাব শ্রীযুক্ত সাইস্তা খান মহাশয়াধিষ্ঠিতে মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মানো নিজদেশে ত্রিসংখোত্তর ষোড়শ শত শকাব্দে নসরত সাহী পরগণার অন্তর্গত গকুল বালিয়া গ্রামে সদসি * * রঘুনাথ বিদ্যা * * ভট্টাচার্য্য সদাশয়েষু শ্রীবিরাদাসস্য পুত্রদ্বয় কন্যা বিক্রয় পত্রমিদং ক্রিয়া * * আগে আমি তোমার স্থানে ৯ নতঙ্কা লইয়া আমার পুত্র কুবিরা ও * * এই চাইরজন * * স্থানে স্বেচ্ছায় বিক্রয় করিলাম। এতদার্থ পত্র দিলাম ইতি * * *'। এ দলিল পণ্ডিতের মুসাবিধা; তাই ইহাতে যাবনিক শব্দ যথেচ্ছা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।" নতুবা দলিলাদিতে আরবী পার্সীর প্রাধান্য সব চেয়ে বেশী। তখনকার বাঙ্গালী দলিলাদি লিখিতে বসিয়া "আপন আপন রাজি রকবতে স্বইচ্ছাপূর্ব্বক সাবুদ আক্কলে বহাল তরিয়তে বিক্রয় করিলাম" ইত্যাদি ভূরি ভূরি যাবনিক শব্দ ব্যবহার করিতেন।

সাধারণ বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে যাবনিক শব্দের প্রাধান্য মুসলমান যুগে খুবই ছিল বটে; কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহা লোপ পাইতেছে। কিন্তু দলিলাদিতে ইহার প্রয়োগ এখনও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত আরবী পার্সী শব্দের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

ভ্রমণ কাহিনী—"কাশীর বর্ণনা" :—

পূর্ব্বোক্ত কেদারনাথ মজুমদার আরও বলিয়াছেন ; "অতি প্রাচীন তুলট কাগজে লিখিত দেড় পৃষ্ঠায় সমাপ্ত একখানা 'কাশীর বর্ণনা' আমার নিকট আছে। * * ইহার নমুনা যথা : 'কাশী বারানসী ব*বাস আনন্দ কানন অভিমুক্ত ধাম মহাশ্মশান বিশ্রামস্থল অর্থাৎ সেহি ক্ষেত্রে শরীর পতন পাইলে পুনশ্চ জন্ম হয় না। মনিকর্ণি সমতীর্থ বিশ্বেশ্বর সমলিঙ্গ নাস্তি ব্রহ্মাণ্ড গোলকে। বহুজন্মার্জ্জিত সুকৃতি বস্ত লোকের সেহি ধামে শরীর পতন হয়। অথবা ধাম দর্শন হয়ে। সেখানের দণ্ডী করিবার এক্তেয়ার দিয়াছেন কালভৈরব ও দণ্ডপানি এহানরা বেবচারী জীব সকলকে ধামে বাস করিতে দেন না।' এই কাশীর বর্ণনা একখানা ভ্রমণ কাহিনী। * * এই ক্ষুদ্র ভ্রমণ কাহিনীর একস্থলে লিখিত আছে 'এহার মাহাত্ম পৃথক পৃথক আছে। সকল স্মরণ নাই।' বৈষ্ণব কবিগণ ছন্দেবন্দে চৈতন্যের ভ্রমণ কাহিনী লিখিয়াছেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র কাহিনীর বিশেষত্ব গদ্যে ও সরলতায়।"

দর্শন শাস্ত্র—জ্ঞানাদি সাধনা :—

এইখানে জ্ঞানাদি সাধনা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের খানিকটা নমুনা দিব :—"এখন সত্য বুঝিলাম জন্মাবধি অশ্রোতা জন মনে মনে পিতা মাতাদির নাম করিয়া ডাকিতে পারে না এবং জন্ম অন্ধ জনেহ কুন দিন নবীন নীল মেঘের বর্ণ দেখে নহে সে কি প্রকার মনে মনে নবীন নীল মেঘের বর্ণ চিন্তা করিব এখন সত্য বুঝিলাম জন্ম অন্ধজনে কখন নবীন নীল মেঘের বর্ণচিন্তা করিতে পারে না। সাধু জিজ্ঞাসেন তাহা তুমি কি প্রকারে কহিয়াছিলা

কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান ইন্দ্রিয় বিনেহ কেবল মনে মনে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণাদিকে জ্ঞান করা মাত্র। যদি জন্ম অবধি অশ্রোতা জনে কখ আদি অক্ষর পাঠ করিতে পারে না ও পিতামাতা বন্ধু বান্ধবদিগের নাম করিয়া ডাকিতে পারে না এবং জন্ম অন্ধ জনেহ মনে মনে নবীন নীল বর্ণ চিন্তা করিতে পারে না। অতএব অজ্ঞানী জনেহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না এখন তুমি সত্য করিয়া কহ তুমার ঠাঞি শ্রীকৃষ্ণ সত্য কি মিথ্যা। অজ্ঞানী জীবে কহেন আমি অজ্ঞানী কখন ঐ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখের শব্দ আমার কর্ণে শুনি নাই এবং আমার চর্ম্মেতহ তাহার স্পর্শ পাই নাই এবং আমার চক্ষেতহ তাহান শরীরে রূপ দেখি নাই এবং আমার জিহ্বতেহ তাহান প্রসাদের রস পাই নাই এবং আমার নাসিকতেহ তাহান শরীরে গন্ধ পাই নাই অতএব এখন সত্য বুঝিলাম আমি অজ্ঞানী তোমার ঠাঞি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা।” উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি বিরাম যতি যথাস্থানে বসাইয়া এবং ‘হ’ স্থানে ‘ও’ দিয়া পড়িলে অনেকটা বর্ত্তমান ভাষার মত দেখাইবে। দীনেশবাবু তাঁহার Bengali Prose Style from *1800* to 1857 নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন “The work was probably written about 1700 A. D.”

প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য স্মৃতিগ্রন্থ :—

পূর্ব্বোক্ত কেদারনাথ মজুমদার মুসলমান যুগের একখানা হস্তলিখিত গদ্য স্মৃতি গ্রন্থের নমুনাও দিয়াছেন—“অতঃপর স্ত্রীধন নিরূপণ—পতির জীবদ্দশাতে শিল্পকর্ম্ম লব্ধধন এবং পিতৃমাতৃভর্ত্তৃকুল তিন হইতে লব্ধ যে ধন সে স্ত্রীধন না হয়। তাহাতে স্বামীর অধিকার হয়। পতির

জীবদ্দশাতে যে অলঙ্কার ধারণ করে এবং পিতামাতাভর্ত্তৃ হইতে লব্ধ যে স্থাবরাদি ধন সে স্ত্রীধন হয়। তাহাতে ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ভিন্নে স্ত্রীর দান বিক্রয় অধিকার হয়। ভর্ত্তৃপুত্র পিতৃ ভ্রাতাদের দানগ্রহ গ্রহণে অধিকারী হয় না। দুভিক্ষাদি নিমিত্ত স্ত্রীধন যদি গ্রহণ করে ততে সে ধন দিবেক না। ইহার প্রমাণ কাত্যায়নাদি বচন।"

পূর্ব্বোক্ত সুশীল বাবু সন ১২৩৫ সালের হস্তলিখিত পুথি হইতে নিম্নোদ্ধৃত ব্যবস্থাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন; "অথ অপালন নিমিত্তক গোবধ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা। সর্ব্বথা প্রকারে প্রতিপালন না করে ইহাতে শীত অনিল উদ্বন্ধন শূন্যাগার জলমধ্য অগ্নিদাহ পতন গর্ত্তে ব্যাঘ্র ইত্যাদি নিমিত্তক যদি গোবধ হয় তবে অর্দ্ধ গোচর্ম্ম গাত্রে দিঞা গোসহিত প্রত্যহ যাতায়াৎরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা করিঞা প্রজাপত্য ব্রত প্রায়শ্চিত্ত হয় যদি ইতিকর্ত্তব্যতা না কোরিতে পারে তবে ইতিকর্ত্তব্যতা অনুকল্প এক প্রাজাপত্য হয়। অতএব প্রজাপত্য দুই প্রায়শ্চিত্ত হয়। তদ অনুকল্প ষট্‌ কার্যাপন বরাটিকা দিবেন। ইহাতে এক সামান্য গোদক্ষিণা হয় তদনুকল্প বৃষমূল্য পঞ্চ কার্য্যা সামান্য গোমূল্য এক কার্ষাপণ এবং ষট কার্ষাপণ বরাটিকা দক্ষিণা হয়। ইহাতে বিশেষ বচনপ্রাপ্ত শূদ্রের প্রাজাপত্য দুই প্রায়শ্চিত্ত হয়।" বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে ইহার ভাষা যথেষ্ট প্রাঞ্জল বলা যায়।

প্রাচীন বাঙ্গালার বক্তা বীরভদ্র গোস্বামী

আর এক কথা—বাঙ্গালায় বক্তৃতার ছড়াছড়ি তখনও এখনকার মত ছিল। কোন রকম উৎসব বা মিলন ক্ষেত্র পাইলেই বক্তারা নিজেদের ক্ষমতা দেখাইতে প্রয়াসী হইতেন। "খেতরীর উৎসবে বীরভদ্র গোস্বামী বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবত

ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ দাস তাঁহার ৩৬০ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত 'প্রেমবিলাসে' লিখিয়াছেন—

শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা কৈল শ্রীনিবাস!
বীরভদ্র গোস্বামীর হৈল বক্তৃতা প্রকাশ॥

* * * খেতরীর বক্তা বীরভদ্র গোস্বামী একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার 'পাষণ্ড দলন' গ্রন্থে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গদ্য রচনার নিদর্শন আছে; 'অন্যান্য যুগন্মহাগ্রগণ্য সুধন্য কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সুরধুনী সন্নিধ নবদ্বীপে প্রচ্ছন্নাবির্ভূত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবমাহাত্ম্য ও শ্রীমদ্ভক্তমাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণিত!"

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২—১৭৬০)

কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও সাধক রামপ্রসাদ উভয়ে সমসাময়িক। এক বিদ্যাসুন্দর কাব্য দুইজনেই রচনা করিয়াছেন। দুইজনের রচনায় যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও তাহা আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নয় বলিয়া আলোচনা করিলাম না। "Traces of the Mahomedan influence upon him are distinctly discernible in his (Bharatchandra's) ideas and vocabulary." * কবি ভারতচন্দ্র রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র; দৈবদুর্ব্বিপাকে সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় ইনি পরিশেষে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট আশ্রয় লাভ করেন। ই'হাদের প্রকৃত উপাধি মুখোপাধ্যায়।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন (১৭২৩—১৭৭৫)

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের রচনাও পদ্যকাব্য আর গান। কাজেই

* A History of Bengali Literature—কুমুদনাথ দাস।

তাঁহার বিষয়েও বিশেষ কিছু বলিবার নাই। রামপ্রসাদ একজন মহাভক্ত এবং বিশিষ্ট সাধক ছিলেন। তাঁহার রচনায় যথেষ্ট প্রসাদ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিই তথাকথিত রামপ্রসাদীসুরের প্রবর্ত্তক। তাঁহার যুগের লেখকদিগের রচনায় প্রচুর অলঙ্কার বাহুল্য দেখা যায়।

মুন্সী জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যান (১৭৫০?)

এই যুগের উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গদ্য গ্রন্থের মধ্যে কুচবিহারের রাজমুন্সী কায়স্থ জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যান অন্যতম। রাজোপাখ্যান অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের রচনা। নমুনা যথা, "শ্রীশ্রীগুরুদেব-চরণারবিন্দ—দ্বন্দ্ব-মকরন্দ অজ্ঞান তিমিরান্ধ জনসমূহের জ্ঞানাঞ্জন স্থায় সহস্রদল কমল কর্ণিকান্তরে নিরন্তর চিন্তা করিয়া তস্য চরণপ্রান্তে কোটি কোটি প্রণামপূর্ব্বক ধরণি-ধরেন্দ্রতনয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকারিণী ত্রিগুণাত্মিকা সহিত শ্রীশ্রীআশুতোষ দীন দয়াময় সদাশিব চরণার দ্বন্দ-দ্বন্দ্বে প্রণামান্তর শ্রীমন্নারায়ণ পরায়ণ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা ভূদেব ব্রাহ্মণ,সকলের চরণপ্রান্তে প্রণতিপূর্ব্বক বহুতর প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীসদাশিব বংশ-সম্ভব বিহারস্থ দেশাধিপতি শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর মহাশয় সদাশয় দান মান গুণ ধ্যান ধারণ কুল শীল বল বীর্য্য শৌর্য্য গাম্ভীর্য্য বর্ম্ম ধর্ম্ম কর্ম্ম অস্ত্র শস্ত্র নীতি চরিত্র নিতান্ত শান্ত দান্ত বিদ্যা বিনয় বিচার রাজলক্ষণ রাজব্যবহার শরণাগত জন-প্রতিপালনাদি বিষয়ে এবং রূপ লাবণ্যাদিতে যিনি তুলনা-রহিত রিপু-কুল-বন-পক্ষে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ন্যায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ।" ইহা হইতে দেখা যায় সে সময় বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে কিরূপ সমাসবদ্ধ লম্বা লম্বা দুর্ব্বোধ্য পদ ব্যবহৃত হইত।

বাঙ্গালায় আরবী পার্সীর বাহুল্য—

মুসলমান আমলে এই বাঙ্গালা ভাষার উপর প্রচুর আরবী পার্সীর প্রাধান্য ছিল। যুগ সাহিত্যের লক্ষণও তাই। রাজদরবারে রাজভাষার প্রাধান্য থাকিবেই। শোভাবাজারের স্বর্গীয় কুমার অনাথ কৃষ্ণ দেব বাহাদুর স্বপ্রণীত 'বঙ্গের কবিতা' নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন—"রামপ্রসাদের বিদু বামনী ও ভারতের হীরামালিনী চরিত্র—কাহারও কাহারও মতে মুসলমানী সাহিত্য হইতে আমদানী। * * * আলীবর্দ্দী সিরাজুদ্দৌলার আমলে বা তাহার কিছু পূর্ব্ব সময় হইতে বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ যে মুসলমানী আদব কায়দায় অভ্যস্ত এবং পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হওয়া ও সুশিক্ষিত বা কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচয় দিবার অঙ্গ মনে করিতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।" তখনকার পাঠ্যপুস্তকাদি ছিল গোলে বকাওয়ালী, লয়লা-মজনু, হাফেজের বয়েৎ, গুলেস্তাঁ, পন্দনামা, বোস্তাঁ, জেলেখা, আল্লামী প্রভৃতি। এখনও বাঙ্গালা দলিলাদিতে ভূরি ভূরি আরবী পার্সী মিশ্রিত শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত ৺অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর জেলেখা পুস্তক হইতে তখনকার বাঙ্গালা গদ্যের নমুনাও দেখাইয়াছেন—"কে তোমাকে ঠকাইয়াছে বল, তোমার ফুলের বর্ণ মুখ হরিদ্রার ন্যায় বিবর্ণ কেন? তুমি চন্দ্রের মত দিন দিন ক্ষয় পাইতেছ কেন? আমি বোধ করি, তুমি কাহারও প্রেমের ফাঁদে পড়িয়াছ; বল সে কে? যদি সে আসমানের চাঁদ হয়, তবে তাহাকে জমীনে ফেলিয়া তোমার নিকট বন্দী করিব। সে যদি পাহাড়বাসী দেবতা হয়, তবে মন্ত্রবলে তাহাকে শিশিতে পূরিয়া তোমার নিকট হাজির করিব। যদি সে মনুষ্য হয়, তবে তুমি যাহার দাসী হইতে

ইচ্ছা করিতেছ, সে আমার কুহকে তোমার দাস হইয়া পদানত হইবে।”

ফলকথা মুসলমানগণের নিকটেও বঙ্গসাহিত্য কম ঋণী নহে : “কাব্য ধর্ম্মতত্ত্ব, সঙ্গীত, ইতিহাস, উপাখ্যান ও পীরপূজা বিষয়ে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুসলমান বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। বঙ্গভাষা, উহার অভিধান (?), বাঙ্গালীর ব্যবহার বিধি, বাঙ্গালার রীতি নীতি ভদ্রতা ও শিষ্টাচার নানাদিকে মুসলমানের নিকট ঋণী। * * উপাখ্যান কাব্য, পারস্য সাহিত্যেরই সৃষ্টি, এই ক্ষেত্রেই বঙ্গসাহিত্য মুসলমানের প্রভাবে বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। * * * মুসলমানের এই উপাখ্যান কাব্যে ধর্ম্মের বা সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক নাই, সাহিত্য-রসই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য।” *

* বঙ্গবাণী—শশাঙ্কমোহন সেন—পৃষ্ঠা ৩৫।

তৃতীয় যুগ

ইংরেজ আগমনে বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিবর্ত্তন।

ইংরেজ আগমনে এ দেশে বাঙ্গালা সাহিত্যের স্রোত একেবারে ফিরে গেল। সে বৈষ্ণব গীতি-কবিতা, সে কবিওয়ালাগণের কবিতা, সে ছড়া, সে টপ্পা, সে চণ্ডীর গান, মনসার গান, সে বিদ্যাসুন্দরের মত তরল হাল্‌কা কবিতা,—ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া গেল। বিদ্যাসুন্দরের যুগের সাহিত্যকে অনেকে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের যুগের সাহিত্যের সহিত তুলনা করেন। তুলনা অনেক হিসাবে বেশ মানায় বটে। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন "Grotesque mannerisms, involved syntactical constructions and lavish rhetorical excesses which our literature presented at this stage of its dependence upon exotic sources" এই সময়কার রচনার প্রধান লক্ষণ।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার হেমচন্দ্রের জীবনীতে লিখিয়াছেন: "ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালীর ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে সর্ব্বত্রই আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ইংরাজ এ দেশে নূতন ভাব ও চিন্তার ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, [আমরা দেখিতে পাই] "যে অন্ততঃ ষোড়শ শতকের শেষ দশকে পোর্ত্তুগীস পাদ্রিরা বাঙ্গালাদেশের লোকের কাছে তাহাদের নিজ ভাষায় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা শিখিয়া তাহাতে বই অনুবাদ করিতেছেন, এবং

এইরূপে বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ নূতন একটী সাহিত্যের ধারা প্রবর্ত্তন করিতেছেন। * * * ও ১৮০০ সালের পর হইতে কেরী, মার্শমান ওয়ার্ড প্রভৃতি পোর্ত্তুগীস পাদ্রি দে-সুজা ও তাঁহার সহকর্ম্মী ও কার্য্যাধিকারীদের স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া, এক নূতন ইংরেজী-বাঙ্গলা খ্রীষ্টান সাহিত্যের পত্তন করেন।"—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পাদ্রি মানোএল্ দা—আস্ সুম্প্‌সাম্ রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ।'

প্রমথ চৌধুরী বলেন—"The English brought prose into Bengal and when rhyme gave place to reason, our literature entered into its modern place * * * Englishmen wrote books for the benefit of Bengalees, and Bengalees wrote books for the benefit of Englishmen, and it seems everybody was anxious to teach everybody else something or other"—Paper on the story of Bengali Literature read by Pramatha Chowdhuri at Darjeeling in 1917. (ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে এই পুস্তিকাখানি আছে)।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের একখানা বাঙ্গালা পত্র—

ইংরেজ যুগের প্রারম্ভের বাঙ্গালা গদ্য রচনার অবস্থা তৎকালীন চিঠিপত্র, দলিলাদি ও মামলা মোকদ্দমার কাগজ পত্র হইতে অনেকটা জানিতে পারা যায়। দীনেশবাবু তাঁহার Bengali Prose Style এ পলাশীর যুদ্ধের এক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত একখানা বাঙ্গালা চিঠির নমুনা দিয়াছেন : "অতএব এ সময়ে তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার

করিতে পার তবেই যে হউক নচেৎ আমার নাম লোপ হইল ইহা মকররর মকররর জানিবা নাগাদি ৩রা ভাদ্র তথাকার রোয়দাদ সমেত মজুমদারের লিখন সম্বলিত মনুষ্য কাশেদ এথা পৌঁছে তাহা করিবা, এ বিষয়ে এক পত্র লক্ষ হইতে অধিক জানিবা।” পত্রখানি লিখিয়াছিলেন মহারাজা নন্দকুমার তাঁহার ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণের নিকট, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে।

মহারাজা নন্দকুমার কর্ত্তৃক স্বীয় পুত্র রাজা গুরুদাসকে লিখিত কয়েকখানি পত্রের নমুনাও প্রদর্শিত হইল :

শ্রীশ্রীহরি

শরণং

প্রাণপ্রতিমেষু পরমশুভাশীর্ব্বাদ শিবঞ্চ বিশেষ :—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করণক অত্রকুশল পরন্তু শ্রীযুত মিস্তর মেদলটিন সাহেব ৯ই পৌষ সোম দুই প্রহর দিবস কালে এখান হইতে রাহি হইয়াছেন তাঁহার সহিত সকল কথোপকথন হইয়াছে তাহা কার্য্য দ্বারা বুঝিতে পারিবে তুমি কোন বিষয়ে অসন্তোষ করিবে না তোমার নামে ওয়াজীবন আরজ লিখাইয়া শ্রীযুক্ত বড় সাহেবের মিস্তর মেদলটিন সাহেব দিয়া দস্তখত করিয়া লইয়াছি শ্রীযুক্তলালা সুবংশ রায় অল্প দিবসের মধ্যেই যাইবেন ইহার মারফতে পাঠাইব ইহা তোমাকে দিবেন তাহার এক পরামর্শ ঠাওরাইছি লালা মজকুরের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়া তাহার মত কার্য্য করিবে জে জে বিপক্ষতা করিতেছে তাহারা পোশমান হবেক দাস্ত মানের দফা এবং আর আর সবিশেষ সকল পশ্চাৎ লিখিব * * * এখানে হামেষ লিখিবে কিমধিকং ইতি ১৩ই পৌষ শুক্রবার সমাচার পত্রার্থে জ্ঞাত হইবে কোন

বিষএ ভাবিত না হবে শ্রীশ্রী৺মঙ্গল করিবেন আর আর বিস্তারিত বিবরণ শ্রীযুক্ত লালা সুবংশ রায় পশ্চাৎ যাইতেছেন তাহার প্রমুখাৎ প্রকু (?) হইবা * * *

শ্রীশ্রীহরি

শরণম্

সন ১১৭৮ সাল

১৯ শে পৌষের খত

প্রাণপ্রতিমেষু

পরম শুভশীর্ব্বাদ শিবঞ্চ বিশেষ :—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করণক অত্র কুশল পরন্তু ২৫শে তারিখের পত্র ২৭ শে রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম * * * শ্রীযুক্ত রায় জগৎচন্দ্র বিশ রোজের পর বাটী হইতে আসিয়াছেন। যেমত যেমত কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল তিনি যথাতথা যাউন ফলতঃ কার্য্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন পষ্ট হইয়া আপনারই মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক।

মহারাজা নন্দকুমার কর্তৃক স্বীয় পুত্র রাজা গুরুদাসকে লিখিত ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের একখানি পত্রের নমুনাও নিম্নে প্রদর্শিত হইল : তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করনক অত্র কুশল পরস্তুঃ [?] ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুক্ত ফেতরত আলিখাঁ এর এখানে আইশনের সম্বাদ জে লিখিয়াছিলে এতক্ষণতক পঁহুচেন নাই। পঁহুচিলেই জানা জাইবেক শ্রীযুত রায় জগৎচন্দ্র বিষ রোজের পর বাটি হইতে আসিয়াছেন যেমত যেমত কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল তিনি তথা তথা জাউন ফলত কার্য্যের দ্বারাতেই

বুঝিবেন পষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক তুমি শ্রীযুত মেস্তর মেদলটীন সাহেবের নিকট জাতায়াত করিবে একখত তাঁহাকে লিখিলাম দিয়া নিরালা সকল কহিবে ও সুনিবে তখন জেরূপ কথোপকথন হয় তাহার মত করিবে তিঁহ চিত্তে জানেন জে আমার কথাক্রমেই ইনি কার্য্য করিতেছেন সুন্দররূপ তাঁহার সহিত মিলিবে কোনও বিশএ উদ্বিগ্ন নহিবে।

"কোন বিশএ উদ্বিগ্ন নহিবে * * * হাজি মুস্তফাকে তুমি সাক্ষাতে ডাকিয়া কহিবে ঞিহ আমারদিগের বেরাদরির মধ্যে * * * দুই জনকে মিলজুল করিয়া দিবে * * *"—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১০।

১৩৪১ সালের ভাদ্র সংখ্যার ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন নবাব সিরাজউদ্দৌলার অন্যতম সেনাপতি মোহনলালের স্ত্রীর স্বাক্ষরযুক্ত একখানি দান পত্রের নমুনা দিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন দানপত্রের সময় সম্ভবতঃ ১১৬২ সাল; নমুনা যথা—

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের একখানা দানপত্রের নমুনা—

গোস্বামী জি শংকর গিরিমহান্ত

আমি বানুবিবি ভগবান লালার কন্যা মৃত লালা মোহনলালের বনিতা সাং জাফরাগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ সজ্ঞান চিত্তে ও স্মরণশক্তি বহাল থাকিতে অন্যের বিনা অনুরোধে ও বিনা জবরদস্তি শাস্ত্রানুযায়ী প্রসিদ্ধরূপ একরার এই মত করিতেছি যে মবলকে ১।৩৻২ নাখরাজ জমি তাহাতে কয়েক ঘর প্রজা বসবাস আছে তাহার চৌহদ্দি নিম্নে লিখিত হইয়াছে ঐ জমি সহর মুর্শিদাবাদ নসীপুর মহল্লায় আছে

(দস্তখত) বানুবিবি
জওজে মোহনলাল

আমার স্বামীর খরিদা এতাবৎ দখলে আছে তাহাতে অন্য কাহারও সরাকৎ নাই ও কাহারও দখলে স্বত্ত নাই আপন দখলে রাখি এক্ষনে এই সমস্ত জমি আখড়াস্থিত মহাদেব জিউর মন্দির যাহা আমার মৃত স্বামীর প্রস্তুত করা তাহার মেরামত ও সেবার জন্য প্রশংসিত গোস্বামী মহাশয়কে দিলাম আর কোবালা ও সাবেক যাহা দলিল ছিল তাহাও গোস্বামী মালকেরকে দিলাম জমির মজকুর আপন ভোগদখল হইতে মহান্ত মহাশয়ের ভোঁগদখলে ছাড়িলাম মহান্ত মহাশয়ের উচিত যে প্রজাদিগের রাজস্ব ও জমিনের উপস্বত্ত পৌত্রাদিক্রমে উশুল তহসিল করিয়া ভোগদখল করিতে থাকিবেন আমি কি আমার ওয়ারীশান কোন দাবী দরপেশ করি ও করে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর এতদর্থে সনন্দ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইসাদি রামগোপাল খিদ্‌মদগার।

পলাশীর যুদ্ধের এক বৎসর পরের মোচলিকা পত্র—

"পলাশীর যুদ্ধের এক বৎসর পরের একখানা মোচলিকা পত্রের ভাষা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 'লিখিতং শ্রীরাজা রামশর্ম্মাও জগন্নাথ শর্ম্মা মুচলিকা পত্রমিদং সন এগার পয়সত্তী অব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমাদিগের দুইজনে পৈতৃক খানা বাড়ী ও লঙ্কাহারের গরবাড়ী ও খনিত পুষ্করণী দিগরের বিরোধ। এজন্য শ্রীশ্রী৺মহারাজ সরকারে পরগণে গণকারের কাচারিতে নালিশ করিয়া উভয় কহিলা পরে শ্রীঅভয়চরণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীকৃষ্ণরাম রায়কে মধ্যস্থ মানিয়া যাইতেছি। ইহারা তজবীজ করিয়া যে অবধি, করিয়া দেন। সেই মঞ্জুরহইতে যে অন্য মত করে সে ন্যায় ভঙ্গী দাওয়া হইতে বেদাওয়া এবং সরকার হইতে গুণাগার এতদার্থ মুচলিকা পত্র দিল। ইতি' "*

* কেদারনাথ মজুমদারের গদ্য সাহিত্য।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালা দলিলের নমুনা—

এইখানে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের একখানি প্রাচীন জীর্ণ দলিলের নমুনাও প্রদর্শিত হইল: "ইয়াদি আত্মবিক্রয় পত্রমিদং—শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ ওলদে গদাধর সিদ্ধান্ত সাকিম চান্দশী পরগণে রাঙ্গরোড়া * * * সুচরিতেষু :—শ্রীমতী কুঞ্জমালা ওমর ২৭ সাতাইষ বরিষ রঙ্গশ্যাম জওজে রাম রুদ্রতৈ সাকিন * * অস্য লিখনং আগে আমী মহাকষ্ট পালিত খোরাক পোষাক আজ্জিজ হইয়া মারা জাই এবং আমার কন্যা শ্রীমতী মহামায়া ওমর সাত বরিষ রঙ্গশ্যাম এহায়ও অন্নবস্ত্র দিয়া পরিপোষণ করিতে না পারি এবং কেহ আমার ঘর অন্নবস্ত্র দিয়া পরবিষ করে এমত না য়াছে অতএব আপন রাজিরকবতে সচ্ছেন্দ আক্লেবহাল ভবিষ্যতে সেইচ্ছা পুর্ব্বক আমি ও আমার কন্যা:বহায় আপনার স্থানে মবলগ ৩ তিন রূপাইয়া পুরো ওজন দহমাসী চলনসহী দস্তবদস্ত পাইয়া আত্মবিক্রয় হইলাম আপনে লওয়াজিমা খোরাক পোষাক দিয়া মুদত ৭০ সত্রীবরিষ দাসী অর্থ কর্ম্ম দান বিক্রীরধিকারী হইয়া করাইতে রহ জদি এই মুদ্দত মৈর্দ্ধে আচাদ হইতে চাহি তবে ১।০ সোয়ামণ হলধি সিধা দিয়া আচাদ হইব এই করারে আত্মবিক্রয় হইলাম ইতি সন ১১৯৫ এগার শত পাচানবৈ শাল তেরিখ চৈদ্দহী মাহে অগ্রহায়ণ।"—সাহিত্য, ১৩২০, ৫ম সংখ্যা পৃ, ৪৩৫-৬।

কামিনীকুমার—

কালীকৃষ্ণদাস রচিত কামিনীকুমার নামে একখানা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। ইহার রচনার নমুনা যথা—"কামিনী কহিলেক ওহে চোর তুমি আমার আর কি কর্ম্ম করিবেক কেবল হুকার কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকহ আর এক কথা তোমাকে চোর

চোর বলিয়া সর্ব্বদা বা কাঁহাতক ডাকি আজি হৈতে আমি তোমার নাম রামবল্লভ রাখিলাম।”

ইংরেজ যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য—

ইংরেজ আগমনে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ব্যাকরণ ছিল না, বাঙ্গালা অভিধান ছিল না, বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র ছিল না—ইংরেজের আমলে আমরা এই সবগুলি পাইয়াছি।

“যেরূপ চৈতন্য সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গালা পদ্যরচনার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইযাছিল, সেইরূপ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাদ্রি সাহেব দিগের দ্বারাই বাঙ্গালা গদ্যরচনা সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। * * * শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য সর্ব্বপ্রথমে আরম্ভ হওয়ায়, ঐ নগর অদ্যাপি ছাপা-অক্ষর নির্ম্মাণ বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিতেছে।

বাঙ্গালা ভাষায় সাহেব লেখক—

* * ঐ সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত হ্যালহেড্, উইল্কিন্স্, ফরষ্টার, কেরি, মার্সমান এবং কোলব্রুক, স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি অনেকগুলি ইংরেজ মহোদয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ভাষা সকলের অনুশীলনে ও উন্নতি বিধানে সাতিশয় যত্নবান্ হইয়াছিলেন। সুতরাং দেশীয় ভাষার উন্নতি-প্রার্থীদিগের পক্ষে উক্ত মহোদয়দিগের প্রতি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।” *

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পাদরী ডফ সাহেবের বিবরণীতেও দেখা যায় “At that time it was but a poor language, like English

* রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

before Chaucer, and had in it, neither by translation nor original composition, no works embodying any subjects of study beyond the merest elements"—Dr. Smith's Life of Alexander Duff.

কিন্তু পাদ্রীগণ বা অন্যান্য ইউরোপীয় সুধীগণ যে নিঃস্বার্থভাবে শুধু বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানের জন্যই অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে তাহা মনে হয় না। তদানীন্তন পাদ্রীগণ বা রাজ্যসংস্থাপনেচ্ছু ইউরোপীয়গণ বাঙ্গালায় আসিয়া বেশ বুঝিতে পারিযাছিলেন যে এদেশীয় লোকেদের সহিত অবাধে মিশিতে হইলে, উত্তমরূপে ইহাদের মনস্তুষ্টি করিতে হইলে— প্রথমতঃ ইহাদের ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করার প্রয়োজন এবং তৎসঙ্গে ইহাদের আচার ব্যবহার প্রচারপদ্ধতি চিন্তাধারা প্রভৃতিও অবগত হওয়ার প্রয়োজন। পাদ্রীগণ দেখিলেন বাঙ্গালীগণকে খৃষ্টধর্ম্মমতে আসক্ত করিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বুঝান যত সহজে হৃদয়গ্রাহী হইবে অন্য ভাষায় সেরূপ হইবে না। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইউরোপীয়দিগের দ্বারা বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনের মূলে রাজনৈতিক নিগূঢ় উদ্দেশ্য এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সাধনাভিলাষ নিহিত ছিল।

তা' ছাড়া ভাবের স্রোত, ভাষার ভঙ্গী, পদবিন্যাসের ছটা, সমাসের ঘটা, অলঙ্কারের বিড়ম্বনা—ইংরেজ-রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে উল্টাইয়া গেল। বর্ত্তমান যুগের ও আগেকার বাঙ্গালা ভাষা একসঙ্গে দেখিলে অনেকে বিশ্বাসই করিবেন না যে দুইটী একই ভাষা। দীনেশ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন "অর্দ্ধ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গদ্য যেরূপ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কাহার মনে ভাবী উন্নতির আশা অঙ্কিত না হয়!"

৺রজনীকান্ত গুপ্ত তৎপ্রণীত বিদ্যাসাগর জীবনীতে লিখিয়াছেন—"ইংরেজের সমাগমের পূর্ব্বে যে গদ্য গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার রচনা প্রণালী হৃদয়গ্রাহিণী নহে। উহা যেমন উৎকট শব্দে পরিপূর্ণ, সেইরূপ পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ-বিরহিত। ইংরেজের সময়ে বাঙ্গালায় গদ্য রচনার উৎকর্ষের সূত্রপাত হয়। ইংরেজ স্বয়ং বাঙ্গালায় গদ্য রচনা করেন। কিরূপে ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি লিখিতে হয়, কিরূপে রচনার বিষয় সন্নিবেশ করিতে হয়, কিরূপে গ্রন্থাদি মুদ্রিত করিতে হয়, তাহা ইংরেজের শিক্ষায় বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ইংরেজের এই মহীয়সী কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে। ইংরেজের সমাগমে, মৃত্যুঞ্জয়ের শাস্ত্রজ্ঞানে এবং রামমোহনের ক্ষমতায় সাহিত্যক্ষেত্রে যে বৃক্ষের উদ্গম হয়, তাহা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের প্রতিভায় ফলপুষ্পে শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে।"

ন্যাথানিয়েল হালহেড (১৭৫১—?)—

ন্যাথানিয়েল হালহেড (Nathaniel Brassey Halhed) নামক একজন ইংরেজ সিবিলিয়ান খুব যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বাঙ্গালা ভাষা অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। সাহেব দিগের মধ্যে ইনিই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। শুনা যায় তিনি বাঙ্গালার চলিত গ্রাম্য ভাষা এবং লিখিত শুদ্ধ ভাষা এত উত্তম-রূপে অভ্যাস করিয়াছিলেন যে অনেক সময়ে তিনি বাঙ্গালীর দলে বাঙ্গালী সাজিয়া মিশিয়া থাকিতেন।

হালহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১৭৭৮—

হালহেড সাহেব ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে "Grammar of the Bengal

language" নামে ইংরেজী ভাষায় একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করেন। ইহাই প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পুস্তক খানির এক খণ্ড শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে। পুস্তক খানির প্রচ্ছদপত্রে লিখিত আছে—বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদঙ্গেজী।

শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্ম্মকারের সহযোগিতায় চার্লস্ উইল্কিন্স্ সাহেব কর্ত্তৃক ঐ ব্যাকরণখানি হুগলীতে মুদ্রিত হয়।

চার্লস্ উইল্কিন্স্ (১৭৫০—১৮৩৬)

বাঙ্গালায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র পরিচালনার জন্য উক্ত উইল্কিন্স্ সাহেব এবং পঞ্চানন কর্ম্মকারের নাম চিরস্মরণীয়।

পূর্ব্বে যে ব্রাসি হালহেডের নাম উল্লেখ করা হইল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জন্ হালহেড বাঙ্গালা ভাষা এত উত্তমরূপে অভ্যাস এবং আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে তিনি বর্দ্ধমানে বাঙ্গালী সাজিয়া একটী যাত্রাদলে যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন।

অতি প্রাচীন মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক—

"তবে Halhedএর ব্যাকরণের পূর্ব্বে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে দুইখানি বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক লণ্ডননগরে প্রকাশিত হয়। রেভারেণ্ড বেণ্টো * 'প্রার্থনামালা' ও 'প্রশ্নমালা' নাম দিয়া এই গ্রন্থ দুইখানি রচনা করেন। বেণ্টোর পুস্তকের পূর্ব্বে ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে

* রেভারেণ্ড বেণ্টো ১৭২৮ সালে গোয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি কলিকাতা ও ব্যাণ্ডেলে অনেকদিন ছিলেন; তিনি ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, বাঙ্গালা এবং হিন্দুস্থানী ভাষা উত্তমরূপে জানিতেন; তিনি মারা যান ১৭৮৬ সালে।

Jesuit পাদরী Jeu de Fontenoy, Guy Tachard, Etienne Noel ও Claude de Beze এই চতুর্গ্রন্থকার লিখিত পুস্তকে বঙ্গ ও ব্রহ্মভাষার অক্ষর ছিল। * * এ ছাড়া আরও দুই একখানি বিলাতী গ্রন্থে বাঙ্গালা বর্ণমালার নমুনা খুঁজিলে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারিত। * * * ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৮এ আগষ্ট তারিখে Father Frey Manoel da Assumpcao নামক একজন পর্ত্তুগীজ বঙ্গভাষা ও পর্ত্তুগীজ ভাষায় একখান খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের কথোপকথনচ্ছলে সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন।"—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে।

মানুএল-দা-আসুসুম্প্‌সাউ—

পুস্তকখানির নাম "Catechisme Suivi De Trois Dialogues কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ" (১৭৩৫)। ভাষার নমুনা যথা—

"কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ কথন

হিন্দু ও মোসলমানেরে জানান বন্ধু হিন্দু ও মোসলমান শুনহ। পুথি সকলের উপর পুথি। শাস্ত্র সকলের উত্তম শাস্ত্র। শাস্ত্রী সকলের উত্তম শাস্ত্রী। কৃস্তর শাস্ত্রী কৃপার শাস্ত্র এবং কৃপার শাস্ত্রের পুথি।

এই পুথিতে শুনহ মন দিয়া পাইবা বুঝন বুঝান বুঝিবার বুঝাইবার উপায় তরিবার আস্থার বেদের অর্থ শুনহ শুনাও। পৃথক জানিয়া বুঝহ বুঝাও। পরিণামের পথ ধর ধরাও। গুরু শিষ্যের ন্যায়েতে ন্যায় করিতে শিখহ শিখাও। ইহা জানিয়া বুঝিয়া মানিয়া মুক্তি হইবেক। দশ আজ্ঞা পালন কর যদি।"

এই "কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ" (Crepar Xaxtrer Orthbhed) পুস্তকে অনেকগুলি খ্রীষ্টান সাধুর ইতিবৃত্ত ও অন্য

আখ্যায়িকা আছে ; বড় বড় গদ্য রচনা আছে ; [এই গ্রন্থখানি] পুরাতন বাঙ্গালা গদ্যের ও সাধারণ শব্দসম্পদের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা গদ্যের পত্তনে সাহায্য করার দরুণ পাদ্রি মানুএল—দা—আস্সুম্প্স াঁউ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্ততঃ একটী পৃষ্ঠার দাবী করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালার প্রথম ব্যাকরণকার ও কোষকার বলিয়া উচ্চস্থান তাঁহার প্রাপ্য।' প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত "পাদ্রি মানুএল-দা-আস্সুম্প্সাম-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের" ভূমিকায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বাবু সুশীলকুমার দে স্বপ্রণীত 'Bengali Literature in the Nineteenth Century' নামক পুস্তকের ৭৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছেন—"কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ (not ভেদ)। সূর্য্যের আর চন্দ্রের গ্রহণ গণনার সহিত ১৪০ বৎসরের। আরম্ভ ১৮৩৬ সাল অবধি। সহর চন্দন নগর। এবং সমস্ত বাঙ্গলা দেশের নিমিত্তে। করিয়াছেন জাকবছ ফ্রনছিস্কাস মারিয়া গেরেন। চন্দননগরের সর্ব্বগ্রাহ্যর পাদরী। দ্বিতীয়বার এবং শুদ্ধরূপে শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১৮৩৬"

এতদ্ব্যতীত সুশীলবাবু আর একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন: "Catechism of the Christian Doctrine in the form of a dialogue"—written in two volumes in Bengalla and Portuguese; printed in 8 vo. at Lisbon in 1743.

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে এই "কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ" হইতে একটী কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন ; আর বলিয়াছেন—আধুনিক বাঙ্গালার গল্পসাহিত্যের এক পূর্ব্বতমরূপ বলিয়া ইহাকে নেওয়া চলে:—

"হিস্পানিয়া দেশে মাদ্রিদ সহরে দুই কুলীন পুরুষ শত্রু আছিল; বিস্তর দিন তাহারা একজনে আর জনেরে তালাস করিয়াছিল দাদ তুলিবার কারণ। কষ্টের দিন ছয় ঘড়ি দুই পহর বাদে তাহারা জনে জনেরে লাগাল পাইল; লাগাল পাইয়া দুইজনে ও তরোয়াল খসিয়া মারামারি করিল। যে জনে বেশ তেজোবন্ত সে আরো এক চোট, যে মাটিতে পড়িল, পরাজয় হইল। পরাজয় হইয়া শত্রুরে মাফ চাহিয়া কহিল: ঠাকুর পরাজয় হইয়াছি, আমারে জিনিলা, আর কি চাহ? খ্রীস্তর লাগিয়া আমারে মাফ কর; তবে খ্রীস্ত তোমারে মাফ করিবেন। জিননিয়া কহিল: খ্রীস্তর লাগিয়া তোমারে মাফ করি, যেন তিনি আমারে মাফ করুক। পরে তাহারে উঠাইল; রক্তও পোঁছাইল, ঔষধও দিল, পরে দুইজন মিলিয়া বড় দোস্ত হইল। জিননিয়া ধর্ম্ম ঘরে গেল। ধর্ম্ম ঘরেতে স্তব করিল, স্তব করিয়া যে খ্রীস্তর আকৃতি আছিলেন, তাহানে সেবা করিতে গেল; আঁঠু করিয়া খ্রীস্তর আকৃতির কাছে তাহান পদেতে চুম দিল। তখন আকৃতিএ আঠের খিল খসিয়া, তাহারে আলিঙ্গন দিলেন! এ মহা অপূর্ব্ব সে আপনে দেখিল, এবং যত লোক ধর্ম্ম ঘরে আছিল, সকলেও দেখিল। জিননিয়া পরমেশ্বরের পূজ্য ছিল; যতদিন বাঁচিল অনেক পুণ্য করিল। বৃদ্ধকালে পুণ্যে পূর্ণিত মরিয়া চলিয়া গেল স্বর্গে।"—বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের পত্তনকারী পাদরী-দের মধ্যে ইনিও একজন—সন্দেহ নাই। ইঁহার রচিত অপর পুস্তক বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধান—যাহা তিনি ভাওয়ালে বসিয়া ১৭৩৪ সালে লেখেন।

হেন্‌রি ফর্ষ্টার (১৭৬১—?)—

Henry Pitts Forster নামে আর একজন সাহেব ছিলেন।

তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। 'The great Cornwallis Code' তিনি ১৭৯৩ সালে বঙ্গভাষায় অনূদিত করেন। পুস্তকখানির প্রচ্ছদপত্রে লিখিত আছে : শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের হুজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের হুজুর কৌন্‌সেলের আজ্ঞাতে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১৭৯৩। Second Edition in 1826. তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'অভিধান'; যাহার প্রথম খণ্ড ১৭৯৯ সালে মুদ্রিত হয়; পুস্তকখানির নাম A vocabulary in two parts, English and Bengalee and vice versa. ইঁহার অপর পুস্তক "An Essay on the Principles of Sanskrit Grammar" (1810).

উক্ত হালহেড সাহেব তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন সমস্ত বাঙ্গালা দেশে কারবারের জন্য বাঙ্গালা পত্রাদি সর্ব্বদা লিখিত হইত। উক্ত পত্রাদিতে যে বাঙ্গালা গদ্য ব্যবহৃত হইত তাহার ভাষা অনেকটা সহজ ও সরল ছিল। ঐ সময় বাঙ্গালা ভাষায় যে যে শব্দ যে যে অর্থে প্রযুক্ত হইত এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনেক শব্দের প্রয়োগই এখন আর দেখা যায় না; কতক শব্দ ভিন্নঅর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। আবার অনেক নূতন শব্দ এখন ব্যবহৃত হইতেছে যাহার প্রচলন তখন ছিল না।

বাঙ্গালা ভাষার তদানীন্তন অবস্থা বিষয়ে উক্ত হালহেড সাহেব তাঁহার ব্যাকরণে লিখিয়াছেন "Bengali is at present in the same state with Greece before the time of Thucydides when Poetry was the only style to which authors applied themselves and studied prose was utterly unknown."

শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র

বস্তুতঃ সাহেবরাই এদেশে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালায় ব্যাকরণ, অভিধান, ইতিহাস, বিজ্ঞানাদি রচিত ও মুদ্রিত করেন। যদি ইহারা সে সময় বিপুল অর্থব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টির জন্য ব্যাকরণ অভিধানাদি না লিখিতেন তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষা এখনকার বর্ত্তমান মহিমময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালা ভাষায় গীতিকবিতা ও পদ্যসাহিত্য যেমন বৈষ্ণব কবিদিগের হস্তেই উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি লাভ করে সেইরূপ খৃষ্টান পাদরীদের হাতেই বাঙ্গালা গদ্যরচনা রীতিমত অনুশীলিত হয়। আবার তাঁহারাই ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রথম শ্রীরামপুরে একটী মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত করিয়া পুস্তকাদি মুদ্রণের সুব্যবস্থা বিধান করেন। *

"It was about this time (first quarter of the 19th century) that three noble-hearted missionaries Carey, Marshman and Ward set up a College and a printing press at Serampore and issued a vernacular journal—Samachar Darpan. A new era in Bengali literature dawned at this time and all-round epoch-making changes were effected in our life and letters by the fusion of the Eastern and Western culture. A splendid prose literature with different

* কিন্তু দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন নামক পুস্তকের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় হুগলীর বর্ণনায় আছে—"এই হুগলী নগরেই প্রথমে ছাপাখানার সৃষ্টি হয়। হলহেড ও উইলকিন্স সাহেব সর্ব্বপ্রথমে ঐ প্রেসে বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন।"

branches owed its inception during the middle of the 19th. century, and the composition of dramas, epics and lyrics upon the basis of an intelligent assimilation of the best ideals of the Orient and the Occident commenced from this time. * * * Mr. Wilkins set up a Bengali printing press at Hughli and composed a Bengali Grammar Mr Foster (Froster ?) wrote the first Bengali Dictionary in 1799 and also rendered tbe Govt. laws fro.. English in Bengali."—কুমুদনাথ দাসের History of Bengali Literature.

উইলিয়াম ওয়ার্ড (১৭৬৯—১৮২৩)—

ইতিপূর্ব্বে যে তিনজন মহাপ্রাণ পাদরী সাহেবের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে রেভারেণ্ড্ উইলিয়াম ওয়ার্ড তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। ইনি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন ; ও পরে কেরীর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরামপুরে ছাপাখানার কার্য্যাবলী দেখিতেন। এবং কেরীকে অনেক পুস্তক মুদ্রণের সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি "পীতাম্বর সিংহের চরিত্র" নামে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করেন।

জন, এফ, এলার্টন (১৭৬৮—১৮২০)—

এই সময়ের আর একজন সাহেব লেখক জন এফ এলার্টন (John F. Ellerton)—তাঁহার বাঙ্গালা রচনার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখ যোগ্য :—

(১) মঙ্গল সমাচার মত্তিউ রচিত ; কলিকাতা হইতে ১৮১৯ সালে প্রকাশিত—

(২) মঙ্গল সমাচার যোহন রচিত; কলিকাতা হইতে ১৮১৯ সালে ইংরেজী ও বাঙ্গালায় প্রকাশিত—

(৩) জগত্তারক প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার; কলিকাতা হইতে ১৮২০ সালে প্রকাশিত—

(৪) গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তর ধারাতে সৃষ্ট্যাদির বিবরণ; ১৮২০ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০)—

১৮০০ খৃষ্টাব্দে সাহেবদের বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য যখন কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংস্থাপিত হয়, কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সেখানে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। * সাহেবদিগকে পড়াইবার জন্য

---

* Lord Wellesley, finding the Civil Servants imperfectly acquainted with the language of the country, established the College of Fort William in Calcutta, in the year 1800. * * * Able Pundits were retained; and various works in Bengalee and other language, were compiled and printed; and thus a new impulse was given to the improvement of the country. The learned Mrityunjoy, a native of Orissa, was appointed chief of the Native Department, and reflected high honour on the institution by his great talents.—Marshman's History of Bengal—Section XVIII. P. 252.

ঐ সময় কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ কলেজে থাকিয়াই কেরি সাহেব বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে ব্যাকরণ ও অভিধান লিখিয়াছিলেন। এক্ষণে সে ব্যাকরণ দুষ্প্রাপ্য হইলেও, অভিধানখানি দেখিতে পাওয়া যায়। "ঐ অভিধান রচনায় উক্ত কেরি সাহেবের অসামান্য বিদ্যা অপরিসীম যত্ন ও অসাধারণ অধ্যবসায় প্রদর্শিত হইয়াছে।" কয়েকজন বাঙ্গালীও ঐ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। "এই গ্রন্থগুলি গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিলাত হইতে বিভিন্ন সময়ে কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া আসে।"

বিলাতে মুদ্রিত একখানা গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের অনুলিপি

পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার বিলাতে মুদ্রিত সেই সকল গ্রন্থের একখানার প্রচ্ছদপত্রের অনুলিপি দিয়াছেন—

"The Fort William College rendered valuable service to the cause of Bengali language and literature It gave the language its grammar & dictionary and supplied it with reading books for a preliminary study. * * The College had benefited the literature of Bengal, had imparted to it a new spirit which would bring about its rejuvenation"—Western Influence in Bengali Literature (p. 62) by Priya Ranjan Sen.

"To the efforts of the Fort William Pundits we chiefly owe the regeneration of intellectual activites in this country"—Sushil K. De.

শ্রী—

বিক্রমাদিত্যের

বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ

বাঙ্গালা ভাষাতে

শ্রী—

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণ রচিত

লন্দন মহানগরে চাপা হইল

১৮১৬

তবে, সে সময়কার রচনামাত্রেই উৎকট লম্বা লম্বা সমাসে ভরা ! নিম্নে কয়েকটী লেখকের রচনার নমুনা প্রদর্শিত হইল।

প্রাচীন শিশুবোধক—রচনার নমুনা (১৮০০)

প্রাচীন একখানি শিশুবোধকে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর পত্রালাপের যে আদর্শ আছে তাহা দেখিলেই বেশ বুঝা যায় সে সময়ের ভাষা কিরূপ ছিল :

"স্বামীর প্রতি স্ত্রীর পত্র—

শিরোণামা ঐহিক পারত্রিক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদপল্লবাশ্রয় প্রদানেষু।

শ্রীচরণ সরসী দিবানিশি সাধনপ্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতী মঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদ-সরোরুহ স্মরণমাত্র অত্র শুভ বিশেষ। পরে মহাশয় ধনাভিলাসে পরদেশে চিরকাল কালযাপন করিতেছেন, যেকালে এ দাসীর কালরূপ-লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছেন, সে কাল হরণ করিয়া দ্বিতীয় কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সান্ত্বনা করা দুইকালের সুখকর

বিবেচনা করিবেন। * * * অতএব জাগ্রত নিদ্রিতার ন্যায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচরণযুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদনমিতি।"
বাহুল্যভয়ে উত্তরলিপির নমুনা উদ্ধৃত করা হইল না।

মিলারের বাঙ্গালা অভিধান

১৮০১ খৃষ্টাব্দে Miller সাহেব একখানি বাঙ্গালা অভিধান মুদ্রিত করেন।

কেরি (১৭৬১—১৮৩৪)

এই যুগে যে সকল সাহেব বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টি সাধনের জন্য প্রাণপাত পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়াছিলেন মহানুভব উইলিয়ম কেরি তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। বিপুল পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয়ে তিনি কয়েকখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। তখনকার দিনে পুস্তক মুদ্রণ কার্য্য এখনকার মত সুকর ছিল না। কিন্তু মহাত্মা কেরি সকল ক্লেশ সকল বাধাকে অগ্রাহ্য করিয়া বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে ঐ সকল বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করেন।

কেরি মার্শম্যান প্রভৃতি তদানীন্তন সাহেবরা কিরূপ লোকপ্রিয় ছিলেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতেই সহজে অনুমিত হইবে :

হেয়ার্ কল্বিন্ পামরশ্চ কেরি মার্শমেন স্তথা।
পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥

উইলিয়ম কেরির বাঙ্গালা সাহিত্য পরিচর্য্যা সম্বন্ধে সুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন : "Carey's claim to importance as a contributor to Bengali literature does not rest so much upon his Bible-translations and numerous tracts on Christianity, but on the works which be produced in another spher

of usefulness but on which he himself seems to have laid less emphasis although they show him in a better light as a writer of Bengali."

কথোপকথন (১৮০১)

কেরি-কৃত কথোপকথন—১৮০১ সালের রচনা। ইহার নমুনা যথা—"ঘটক মহাশয়—আমার বড় পুত্রতির বিবাহ দিব আপনি একটি সুমানুষের কন্যা স্থির করিয়া আসুন বিস্তর দিবস গৌণ না হয় বৈশাখে কিম্বা আষাঢ়ে হইতে চাই। আমি বিবাহ দিয়া কার্য্যস্থলে যাব এখন না হইলে যে খরচ আনিয়াছি সে ফুরিয়া যাবে।

ঘটক কহিলেন। ভাল মহাশয় তাহার ঠেক্ কি। আপনার পুত্রের সম্বন্ধ নিমিত্ত আমাকেও অনেকেই কহিয়াছে। আমি আপনকার অপেক্ষায় আছি। দুই তিন জাগার কন্যা উপস্থিত আছে যেখানে বলেন সেইখানে স্থির করিয়া আসি। কুলীন গ্রামে হরহরি বসুর একটি কন্যা আছে সিটি উপযুক্তা। যেমন নাক মুখ চক্ষু তেমনি বর্ণ যেন দুধে আলতার গোলা আর কর্ম্মেও তেমনি। যদি বলেন তবে তাহার কাছে যাই।

তিনি বলিলেন। ভাল। তাহারি কন্যার সহিত কর্ত্তব্য বটে তুমি যাও। দিবস ধার্য্য করিয়া আইস। আর কত পণ লাগিবে তাহা জানিয়া আইলে পত্রাদি করিয়া সামগ্রীর আয়োজন করা যায়।"

একজন মাত্র লেখকের একখানি পুস্তক হইতে অধিক নমুনা উদ্ধৃত করিলে বর্ত্তমান পুস্তকের কলেবর অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত হয়; কিন্তু উইলিয়ম কেরির কথোপকথন পুস্তক হইতে এইরূপ একটি মাত্র উদ্ধৃতাংশ দ্বারা তাঁহার অলৌকিক রচনা নৈপুণ্যের কিছুই দেখান যায় না; এই

পুস্তকখানিতে তিনি তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা জ্ঞানের এবং চলিত বাঙ্গালার রচনা শক্তির যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা উত্তমরূপে জানিতে হইলে সমগ্র পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত। এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে সুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন : "Carey's extraordinary command over colloquial Bengali is nowhere better exhibited. The extent and variety of topics, the different situations and the different classes of men dealt with in these dialogues show not only a minute and sympathetic observation and familiarity with the daily occupations of the people, their manners, feelings and ideas but also a thorough acquaintance with the resources of the language in its difficult colloquial forms. The book is indeed a rich quarry of the idioms of the spoken dialect of Bengal. The book also gives a faithful reflection of the social life in Bengal as it existed a century ago."

বঙ্গ সাহিত্যে কেরি সাহেবের স্থান—

বঙ্গ সাহিত্যে কেরি সাহেবের স্থান বিচার করিতে হইলে, দেখিতে পাই যে, যে সময়ে দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা সাহিত্য-বিস্তৃতি-বিষয়ে পুরা রকম আস্থাহীন ও উদাসীন—বরং সকলে ইংরেজী শিক্ষাদ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় বিশেষ ব্যাকুল ও উন্মাদপ্রায়, বঙ্গভাষা নিতান্ত অনাদৃত ও ঘৃণিত, লিখিত ভাষার তেমন কোন বাধাবাঁধি নিয়মকানুন নাই, প্রাচীন কবিওয়ালার দলেরও প্রভাবপ্রতিপত্তি ক্রমশঃ নিস্প্রভ এবং অন্তর্মিত—ঠিক এইরূপ সময় ডাক্তার কেরি নিজ অলোক-সামান্য

ক্ষমতা সাহায্যে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যের যে উন্নতি সংসাধন করেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়; তখন বাঙ্গালায় অভিধান ছিল না, ব্যাকরণ ছিল না, ইতিহাস ছিল না, ভাল উপদেশপ্রদ পাঠ্যপুস্তক বা গল্পের বই ছিল না, হাতের লেখা কতিপয়মাত্র পুথি ব্যতীত ছাপা পুস্তকও ছিল না—কেরি একা প্রভূত উদ্যম ও পরিশ্রম সহকারে এই সমস্ত অভাব মোচন করেন। শিক্ষা বিস্তারের উপায় উদ্ভাবন করিবার এবং সেই উপায়কে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি তাঁহার যথেষ্ট ছিল সত্য; বাঙ্গালা মুদ্রিত পুস্তকসকল প্রণয়ন দ্বারাও বাঙ্গালা সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উপকার করিয়াছেন বঙ্গভাষার একটা সুশৃঙ্খল ও সুগঠিত গদ্য-সাহিত্য সংগঠন দ্বারা; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তি কেরির মোটেই ছিল না। অনুবাদেই তাঁহার সকল শক্তি পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এটা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে কেরি বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান তৈয়ার করিয়া যান।

ইতিহাসমালা ১৮১২—

কেরি লিখিত অপর পুস্তক ইতিহাসমালা (১৮১২)। নমুনা যথা:
"ধনপতি নামে এক সওদাগর লহনা নামে তাঁহার স্ত্রী সে লহনাকে বিবাহ করিলে অনেক দিবস সন্তান জন্মিল না অতএব তাহাকে বন্ধ্যা জ্ঞান করিয়া সওদাগর পুনরায় লক্ষপতি সওদাগরের কন্যা খুল্লনা নামে জগন্মোহিনী সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া আপন গৃহে আনিল। ধনপতি কিছুদিনের পরে বাণিজ্যে গেলে সে সওদাগরের ঘরে দোবলা নামে এক দাসী থাকে সে দাসী লহনাকে কহিল তুমি এখন যৌবনহীনা ও বয়ধিকা খুল্লনা পরম সুন্দরী তাহার রূপ লাবণ্যে সওদাগর বশ হইলে তোমাকে

চাহিবে না অতএব খুল্লনাকে অন্ন কষ্ট দাও তাহার যৌবন নষ্ট কর। লহনা দোবলার কথা শুনিয়া মনে বুঝিল যে দোবলা ভাল বলিয়াছে। পরে লহনা ধনপতি সওদাগরের জবানী কপট পত্র রচনা করিল সে পত্রে এই লহনাকে লিখিল আমি যে কন্যা বিবাহ করিয়াছি সে রাক্ষসী তাহাকে বিবাহ করিয়া বড় কষ্ট পাইলাম অতএব দিবা তারে অন্নকষ্ট, করিবা যৌবন নষ্ট রাখাইবা তাহারে ছাগল। এই পত্র শুনিয়া খুল্লনা জলিয়া গেল। দুই সতীনে গালাগালি মুখোমুখি তারপর ধরাধরি চুলাচুলি তারপর কিলাকিলি হইতে বলেতে লহনার খুল্লনার সকল অলঙ্কার ও উত্তম বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে চিড়া কানি পরাহয়া ছাগল রক্ষণে নিযুক্ত করিল।"

উইলিয়ম কেরি বিরচিত 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা' সম্বন্ধে রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র বলিয়াছেন "The last two books form a rich mine of idioms of the spoken dialect of Bengal from which Tekchand Thakur took the cue for his style in the composition of his masterpiece in Bangali —the Alaler Ghorer Dulal"

বাঙ্গালা অভিধান (১৮১৫—২৫)—

ডাক্তার কেরির আর একখানি সুবৃহৎ ও উল্লেখযোগ্য পুস্তক— A Dictionary of the Bengali Language (1815—25): ইহার জন্য তাঁহাকে বিপুল পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে তৎকালীন ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ জুন তারিখের সংবাদ পত্রে দেখিতে পাই: "বাঙ্গালা "ডেকসিয়ানরি"।" আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শহর শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীযুক্ত ডাক্তার

কেরি সাহেব পোনর বৎসর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যে বাঙ্গালা ও ইংরেজি ডেকসিয়ানারি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা শহর শ্রীরামপুরের ছাপা হইয়া গত সপ্তাহে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরিতও হইতেছে। এই পুস্তক তিন বালামে সংপূর্ণ হইয়াছে ইহার পত্রসংখ্যা কাটো পেজের অর্থাৎ বড় পৃষ্ঠার ২০৬০ দুই সহস্র ষষ্টি পৃষ্ঠা হইয়াছে এবং অতিক্ষুদ্র অক্ষরে ও উত্তম কাগজে ছাপা হইয়াছে। ইহার মূল্য চামড়া বাইণ্ড সমেত ১১০ একশত দশটাকা নিরূপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যত শব্দ চলিত আছে সে তাবৎ শব্দ প্রায় ঐ অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথম ইংরাজী অর্থের সহিত বোপদেব কৃত গণ আছে তৎপরে অকারাদি-ক্রমে তাবৎ শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে।" * এই উদ্ধৃতাংশ হইতে সে সময়কার সংবাদ পত্রের ভাষার সম্বন্ধেও কথকটা আভাস পাওয়া যায়।

ফিলিক্স কেরি (১৭৮৬-১৮২২) ইংলণ্ডের ইতিহাস ১৮১৯—

উক্ত উইলিয়ম কেরির পুত্র ফিলিক্স কেরি 'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' নামক একখানি ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন (১৮১৯)। ভাষার নমুনা—"রাজা হেনরির প্রথমত রাজত্ব করণের শৃঙ্খলা দ্বারা প্রজারা নিশ্চয় করিল যে এ রাজা সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক প্রজাপালন করিবেন এই হেতুক ঐ রাজা আত্মপরাক্রম জানিয়া রাজ্যমধ্যে যে যে কুনীতি হইয়াছিল এবং যে যে সকল পূর্ব্বীয় রাজগণের তাচ্ছল্য এবং দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত যে যে কুব্যবহার হইয়াছিল তাহার নিবারণার্থে উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং রাজ্যবিঘ্নকারি সৈন্যেরদিগকে তৎক্ষণে স্ব স্ব কর্ম্মচ্যুত করিলেন।"—পৃষ্ঠা ৩৮

* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা'—৬২ পৃষ্ঠা।

পুস্তকখানির প্রচ্ছদ পত্রোপরি লিখিত অছে ঃ

"ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়,

অর্থাৎ

জুলিয়াস্ কাইসরের ব্রিটিন দেশাতিক্রম সময়াবধি,

আইমেন্স্ নামে প্রসিদ্ধ সন্ধি সময় পর্য্যন্ত,

মহাব্রিটিনের বিবরণ সঞ্চয়

তন্মধ্যে জুলিয়াস কাইসরের কালাবধি দ্বিতীয় জর্জ্জনামে রাজার মৃত্যুপর্য্যন্ত

গোল্‌দ্‌স্মিৎ উপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবরণী কৃত ;

এবং

ঐ জর্জ্জের মরণাবধি ১৮০২ শালের আইমেন্স নামক সন্ধি সময় পর্য্যন্ত,

অন্য এক প্রথিত প্রজ্ঞোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবরণী কৃত

ফিলিক্স কেরি কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় কৃত

C. S. B. S.

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল, ইতি

শন ১৮১৯."

এই পুস্তকের একখণ্ড উত্তরপাড়া পাব্‌লিক লাইব্রেরীতে আছে। পুস্তকখানিতে একটী Glossary সংযোজিত আছে। তাহাতে ইংরেজী শব্দ সমূহের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে ; ঐ সকল বাঙ্গালা প্রতিশব্দ

বর্ত্তমান প্রচলিত বাঙ্গালা হিসাবে স্থানে স্থানে বিসদৃশ এবং কৌতুকোদ্দীপক, যথা :—

Alderman	প্রাচীন পদস্থ, প্রাচীনাখ্যপদস্থ
Aristocracy	কুলীন প্রভুত্ব
Commoner	প্রজা প্রতিনিধি সভ্য
Duel	দুইজন যুদ্ধ, উভয় যুদ্ধ
Fellow (of a College)	সমছাত্র
Harbour	নঙ্গর বাড়ী
Immunity	লভ্য, নিশা
Incest	জ্ঞাতিগামী
Indulgences	পাপক্ষমাপত্র
Knight errant	ভ্রমণকারী অশ্বারূঢ়
Knight of the Garter	ফীতাধ্বজোধ্‌ কুলীন
Mace	চোব
Martyr	সাক্ষী, সাক্ষ্যেদত্তপ্রাণ
Morter	গোবড়া, গর্নাল
Outlawry	ভ্রষ্ট ন্যায়
Pillory	চক্রাকার হাড়ি
Redoubt	পানীখানা
Revolution	প্রভুত্ব পরিবর্ত্তন
Sound	উপঘোল
Upper House	কুলীন সভাস্থল
Viscount	দেশোপভোগী

Whit Sunday	শ্বেত বস্ত্র পর্ব্ব
Wind-mill	বায়ুপ্রচোস্তকল

ফিলিক্স কেরির অপর পুস্তক যাত্রিরদের অগ্রসর বিবরণ। পুস্তকখানি ইংরেজী Pilgrim's Progress নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ; ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কিন্তু ফিলিক্স কেরির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পুস্তক "বিদ্যাহারাবলী অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় কৃত ইউরোপীয় সর্ব্বগ্রাহ্য তাবৎ আয়ুর্ব্বেদ শিল্পবিদ্যাদি মূলগ্রন্থাবলী। তৎপ্রথমগ্রন্থ। ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। ফিলিক্স কেরি কর্তৃক পঞ্চমবার ছাপাকৃত এন্‌সেক্লোপেদিয়া ব্রিটানিকা নাম গ্রন্থাবলী হইলে বাঙ্গালা ভাষায় কৃত। গরিষ্ঠ উলিআম্ কেরি কর্তৃক তর্জ্জমা বিবেচিত এবং শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক ভাষা বিবেচিত ও শ্রীকবিচন্দ্র তর্ক-শিরোমণি কর্তৃক সাহায্যীকৃত। শ্রীরামপুরে মিশিয়ন ছাপাখানাতে ছাপাকৃত। সন ১৮২০।" পুস্তকখানি ৭০০ পৃষ্ঠাব্যাপী।

উক্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রেরা যে সকল বাঙ্গালা প্রবন্ধ রচনা করিতেন তাহা হইতে তদানীন্তন বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা স্বরূপ একটী প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। প্রবন্ধটী "জাতিবিভাগ হিন্দুদিগের উন্নতির কতদূর অন্তরায়"—এতদবলম্বনে লিখিত: হিন্দু-লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন জাতি এই প্রযুক্ত তাহারদের বিদ্যাবৃদ্ধির হানি হয়।

মানুষেরদের নীতিজ্ঞতা এবং স্বচ্ছতাপ্রাপ্তিসম্বাদিভ্রমস্থায় যখন আমরা দেখি তখন আমরা বিস্ময়াপন্ন হই সকলে বুঝে যে ভিন্নদেশীয় লোকেরদের ভিন্ন ভিন্ন রীতির এই কারণ যে আপন আপন স্বভাব এবং গ্রীষ্ম শীতের গুণ বহুজ্ঞ দেশীয় ব্যবস্থপকেরা ব্যবস্থাকরণ কালে এই দুই

কারণ প্রধান করিয়া মানিয়াছেন সর্ব্বদেশে পৃথক পৃথক ব্যবহার সংসারের চলন নিমিত্ত অবশ্য মান্য হইয়াছে। * * *

ব্রাহ্মণেরা বলে সৃষ্ট্যারম্ভে ঈশ্বর পৃথক পৃথক চারিবর্ণ সৃজন করিলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহারদিগের পৃথক পৃথক ধর্ম্মাচার দ্বিজধর্ম্ম এই শুদ্ধাচার যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহণ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়াচার রাজধর্ম্ম ব্রাহ্মণ রক্ষণ ধনুর্বিদ্যা অভ্যাসন শিষ্টপালন দুষ্টদমন রাজ্যশাসন প্রজাপালন ন্যায্য করগ্রহণ বৈশ্যবৃত্তি কৃষিকর্ম্ম এবং বাণিজ্য শূদ্রের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণসেবা মাত্র। * * *

অন্য শাস্ত্র যদি ভাষাতে তর্জ্জমা করে তবে সংস্কৃত শাস্ত্রের গৌরব হানি প্রযুক্ত তাহার অখ্যাতি হয় যেমন মহাভারতের তর্জ্জমা ভাষাতে কাশীদাস নামে এক শূদ্র করিয়াছিল সেই দোষেতে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে শাপ দিয়াছিল সেই ভয়েতে অন্য কেহ এখন সে কর্ম্ম করে না। * * *" †

মোহনপ্রসাদ ঠাকুর—

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ (লাইব্রেরিয়ান) ছিলেন মোহনপ্রসাদ ঠাকুর। তিনি ১৮১০ সালে 'English-Bengali Vocabulary' নামে একখানি অভিধান প্রণয়ন করিয়া ডাক্তার কেরীকে উৎসর্গ করেন।

স্বনামধন্য রাজা রাধাকান্ত দেবও এই সময়ে একখানি 'বর্ণমালা ব্যাকরণ ইতিহাস' নামীয় পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকের একখণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নামক পুস্তকের ৩০—৬—১৮২১

† —কথিত আছে—অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ।

ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

তারিখের উদ্ধৃত সংবাদ হইতে রাধাকান্ত দেবের এই পুস্তকখানির বিশেষ বিবরণ জানা যায়ঃ "নূতন পুস্তক।—এই বঙ্গভূমিতে যে চলিত ভাষা আছে তাহাতে সংস্কৃতানুযায়িনী অনেক তাহার বাক্যার্থ ও ভাষা পুস্তক ও শুদ্ধ লিখনাদি লিখিবার শক্তি ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ও ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না তৎপ্রযুক্ত অনায়াসে বিনা ব্যাকরণে এই সকল জ্ঞান জন্মাইবার কারণ মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব বাঙ্গালা ভাষাতে ২৮৮ দুই শত অষ্টাশী পৃষ্ঠা অপূর্ব্ব এক কেতাব করিয়া ছাপা করিয়াছেন। তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জন প্রভৃতি বর্ণমালা পরে যুক্তাক্ষর ও দ্ব্যক্ষর যুক্ত ও ত্র্যক্ষরযুক্ত ও চতুরাক্ষর যুক্ত ও যথাস্থানে বর্ণোচ্চারণ ও হ্রস্ব ও দীর্ঘ ও প্লুত ও ইহার উদাহরণ ও স্বরযুক্ত দ্ব্যক্ষরাদি শব্দ এবং পড়িবার পাঠ ও জাতিভেদে মনুষ্যেরদের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ও পদ্ধতি এবং মিত্রলাভ ও সুহৃদ্ভেদ ও বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারি প্রকার রাজারদের উপায়। এবং অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও যকার ও ণকার ও বকার ভেদ ও তিথি বারাদি ও মাস ও রাশি ও ঋতু ও ভূগোল ও সন্ধি ও শব্দ ষট্কারক ও তিনকাল ও অক্ষরের মূল ও তদ্ধিত ও কৃদন্ত ও ধাতু প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে এবং কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত দিল্লীতে যিনি যিনি সাম্রাজ্য করিয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ ও শ্রীশ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশে প্রথমাবধি আছে। এই গ্রন্থ তাবৎ দেখিলে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে।"

রাম রাম বসু—

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালী অধ্যাপকদিগের মধ্যে রাম রাম বসু অন্যতম। তিনি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও

১৮০২ খৃষ্টাব্দে 'লিপিমালা' নামক দুই গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। "Carey says of Ram Ram Basu that he was a scholar of uncommon attainments in Persian and Sanskrit."—Bengali Prose Style by Dinesh chandra Sen. অন্যত্র বলিয়াছেন "A more devout scholar than him I did never see." মার্শম্যান সাহেব রাম রাম বসু সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "one of the most accomplished Bengali scholars of the day" সুশীলকুমার দে বলিয়াছেন: "Ram Ram Basu was the first native original writer in modern Bengali prose" ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতী করিবার পূর্ব্বে রাম রাম বসু কেরি সাহেবের মুন্সী ছিলেন। রাম রাম বসুর রচনায় পার্শীর বাহুল্য থাকার জন্য জেম্‌স্ লঙ্‌ সাহেব তাঁহার ভাষার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"Kind of mosaic, half Persian, half Bengali" indicating "the pernicious influence which the Mahamadans had exercised over the Sanscrit-derived languages of India."

সুশীলকুমার দে'ও বলিয়াছেন "It is true that Persian words occur more or less in every writing of this period * * * In Lipimala however the influence of Persian is almost absent."

প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১)—

ইহার রচনায় তত সংস্কৃতের ছড়াছড়ি না থাকিলেও আরবী পার্শী শব্দের বহুল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। প্রতাপাদিত্য চরিত্রের

ভাষার নমুনা যথা: "পরে জ্যোতিষিক জ্যোতিষের বহুবিধ গ্রন্থ লইয়া সভাস্থ হইলে লগ্ন নিরূপণ করিয়া কুমার বাহাদুরের কোষ্ঠী স্থির করিলেন। তাহার ফলশ্রুতি এই হইল। সর্ব্ববিষয়েতেই উত্তম কিন্তু পিতৃদ্রোহী। মহারাজা ইহাতে হবিষ বিষাদ হইলেন কুমারের প্রতিপালন যথেষ্ট মতেতে করিলেন সময়ক্রমে মহা ঘটা করিয়া অন্নপ্রাশন করিলেন নাম রাখিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য। পর পর কুমারের বৃদ্ধি হইতে লাগিল চন্দ্রকলার ন্যায় অতিশয় রূপবান কুমার রাজা বসন্তরায়ের অতি প্রীতি কুমারের প্রতি। কতককাল পরে কুমারের পঞ্চম বর্ষ বয়ক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করণের আরম্ভ হইল। দশ বারো বৎসরের সময় সর্ব্ব বিদ্যাতেই বিশারদ লেখাপড়া বিদ্যাতে প্রকৃত পণ্ডিত আরবি পারসি নাগরি বাঙ্গলা সংস্কৃত ইত্যাদি যাবৎ বিদ্যাতেই তৎপর।" ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে তখনও আরবি পারসি শিক্ষার সমধিক কদর ছিল। অন্যত্র: "একপোয়া দীর্ঘ প্রস্থ নিজ পূরি তার চারিদিকে প্রস্তরে রচিত দেয়াল, পুবের দিকে সিংহদ্বার তাহার বাহির ভাগে পেটকাটা দরজা। শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ—আমারি সহিৎ হস্তি বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর একস্থান তাহার নাম নওবৎখানা—তাহাতে অনেক অনেক প্রকার যন্ত্রে দিবারাত্রি সময়ানুক্রমে যন্ত্রিরা বাদ্যধ্বনি করে।

নওবৎখানার উপরে ঘড়িঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহাদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া থাকে দণ্ডপূর্ণ হবামাত্রেই তারা তাহাদের ঝাঁজের উপর মুদগর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।" 'এই পুস্তকখানি রচনা করিয়া রাম রাম বসু কলেজ-কাউন্সিলের নিকট হইতে তিন শত টাকা পারিতোষিক পান।'

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। পুস্তকখানির প্রচ্ছদপত্রে লিখিত আছেঃ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র। যিনি বাস করিলেন যশহরের ধূমঘাটে। একব্বর বাদশাহের আমলে। রাম রাম বসু রচিত্। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০১

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তরফ হইতে নিখিলনাথ রায় এই রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের এক সুন্দর সংস্করণ প্রণয়ন করিয়াছেন।

১৮০১ সালে মুদ্রিত মূল প্রতাপাদিত্য চরিত্রের একখণ্ড পুস্তক "বোর্ড অফ একজামিনার্স" এর পুস্তকাগারে আছে। গ্রন্থারম্ভে রাম রাম বসু লিখিয়াছেনঃ "সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এদেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গরূপে সামুদায়িক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আর আর অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এজন্য যেমন আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ী লেখা যাইতেছে।"

বাস্তবিক পক্ষে পুরাদস্তুর রকমে বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ বলিতে গেলে রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত্রই প্রথম গ্রন্থ; এবং ইহাই প্রথম বাঙ্গালা ঐতিহাসিক পুস্তক। ঠিক ইতিহাসরূপে লিখিত না হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অপেক্ষা ভাল ঐতিহাসিক পুস্তক ইতিপূর্ব্বে লিখিত হয় নাই; ইহার জন্যও রাম রাম বসু যথেষ্ট প্রশংসা পাইবার যোগ্য—সন্দেহ নাই।

এই পুস্তকখানিকে সর্ব্বতোভাবে হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য লেখক যত্নের বা চেষ্টার কোন ত্রুটী করেন নাই; কোথাও সুন্দর চিত্রাঙ্কন দ্বারা,

কোথাও বা উত্তম বর্ণনা দ্বারা, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা দ্বারা—যেখানে যাহা সাজে তাহা মনোজ্ঞভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন। এইজন্য রাম রাম বসুর এই পুস্তকখানি নীরস হইতে পারে নাই। বরং পুস্তকখানি মোটের উপর বেশ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত।

লিপিমালা—

লিপিমালার নমুনা যথা—"রাজাধিরাজ হিন্দুস্থান মাঝ। যাহা দর্পময় ক্ষমা অতিশয়। সরলান্তকরণ রূপ হেমবরণ। শক্তিমন্ত ধীর। অতি মহাবীর। আত্মলোক পাল। বৈরীমর্দ্দকাল শ্রীমান গুণধর মহারাজ-রাজেশ্বর রাজ্ঞ চক্রবর্ত্তীর সাহায্যলিপি লেখা যাইতেছে।" লিপিমালা পত্রলিখন প্রণালী বিষয়ক পুস্তক; কয়েকখানি আদর্শ পত্র ইহাতে আছে।

এই লিপিমালার ভূমিকায় লেখক লিখিয়াছেন: "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরব্রহ্মের উদ্দিশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে।—

এ হেন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গদেশ কার্য্যক্রমে এ সময় অন্যোন্য দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতি ও এই স্থানে এখন এস্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এদেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলনভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্যক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভূমীয় যাবদীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল প্রথমধারা দুই তিন অধ্যায় তাহার প্রথমতো রাজাগণ আপন সচিব-

লোককে অনুজ্ঞা ও বিধিব্যবস্থাক্রমদান। ইতি প্রথমধারা। দ্বিতীয়—ধারা সামান্য লেখাপড়া" ইত্যাদি

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২—?)

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনার জন্য যে সকল পণ্ডিত নিযুক্ত হ'ন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। পরে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত হন; এবং কিছুদিনের জন্য কেরি সাহেবের মুন্সীগিরিও করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মৃত্যুঞ্জয়ের উপাধি তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার উপাধি ছিল বিদ্যালঙ্কার। মৃত্যুঞ্জয় ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মেদিনীপুরে জন্ম বলিয়া অনেকে মনে করেন তিনি উড়িয়া ছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক তিনি চট্টোপাধ্যায় বংশ সম্ভূত। তাঁহার সময়ের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার মত প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন পণ্ডিত এখন প্রায় দেখা যায় না। দীনেশবাবু তাঁহার Bengali Prose Style নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন: "Marshman calls Mrityunjaya a scholar of stupendous learning and compares him to Dr. Johnson not only in the vastness of his erudition but in his rough and unwieldy features as well." মার্শম্যান মৃত্যুঞ্জয়কে "one of the most profound scholars of the age," "a colossus of literature" প্রভৃতি আখ্যাও দিয়াছেন। কেরি সাহেব বলিতেন "Mrityunjaya talked like a whale." বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) হিতোপদেশ (১৮০৮) রাজাবলী (১৮০৮) প্রবোধ চন্দ্রিকা (১৮১৩) এবং পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৮) ইহার প্রধান উল্লেখ-

যোগ্য গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত তিনি "translated from Sanskrita treatise on the Hindu law of inheritance."

বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)—

মৃত্যুঞ্জয়ের বত্রিশ সিংহাসন ঐ নামীয় প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পুস্তকের সরল বঙ্গানুবাদ। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের একখণ্ড কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে আছে; পুস্তকখানির প্রচ্ছদ পত্রে লিখিত আছে, "বত্রিশ সিংহাসন। সংগ্রহ ভাষাতে। মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০২।" ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে সংরক্ষিত পুস্তকখানির প্রচ্ছদ পত্রে লিখিত আছে; "বত্রিশ সিংহাসন। মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে। ১৮০৮।" আবার লণ্ডনে মুদ্রিত পরবর্ত্তী সংস্করণের প্রচ্ছদ পত্রে লিখিত আছে: "শ্রীবিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ। বাঙ্গালা ভাষাতে। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা রচিত। লন্দন মহানগরে চাপা হইল।১৮১৬।" *

মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা সম্বন্ধে সুশীলকুমার দে বলিয়াছেন "pompous affected sanscritised language." কিন্তু এ পুস্তকখানির ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল এবং প্রাঞ্জল, যদিও সংস্কৃত মূলক বটে। পুস্তকখানির ভাষার নমুনা যথা: "দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল। সেই নগরের নিকটে সম্বদকর নামে এক সস্যক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত। সেই কৃষক সস্যক্ষেত্রের চতুর্দিগে পরিখা করিয়া শাল তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধবী মালতী যুতী জাতী সেবতী কদলী দাড়িমী তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু

* ৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রভৃতি নানান জাতীয় বৃক্ষরোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকেন। সেই উপবনের নিকট নিবড় (নিবিড়) ভয়ানক বন ছিল সে বন হইতে হস্তী ব্যাঘ্র মহিষ গাণ্ডার বানর বনশূকর শসক ভালুক হরিণ আদি অনেক পশু জন্তু আসিয়া সস্য নষ্ট প্রত্যহ করে। এজন্য যজ্ঞদত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সস্যরক্ষার কারণ ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া আপনি তথাতে থাকিল মঞ্চের উপরে যতক্ষণ বসিয়া থাকে তৎক্ষণ রাজাধিরাজের যেমত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা সেই মত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা কৃষক করে যখন মঞ্চ হইতে নামে তখন জড়ের প্রায় থাকি (থাকে)। ইহা দেখিয়া কৃষকের পরিজন লোকেরা বড়ই বিস্মিত হইয়া পরস্পর কহে এ কি আশ্চর্য্য। এই বৃর্ত্তান্ত (বৃত্তান্ত) লোকপরম্পরাতে ধারাপুরীর রাজা ভোজ শুনিলেন। * * *"

হিতোপদেশ (১৮০৮)—

মৃত্যুঞ্জয়ের অপর পুস্তক হিতোপদেশ। সুশীলবাবু বলিয়য়াছেন: পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ ১৮০৮ সালে মুদ্রিত হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু দীনেশবাবু যে বলিয়াছেন ১৮০১ সাল, তাহা সম্ভব নহে। পুস্তক খানির প্রচ্ছদ পত্রে লিখিত আছে: পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত। মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি। এতচ্চতুষ্টয়াবয়ব বিশিষ্ট হিতোপদেশ বিষ্ণুশর্ম্ম কর্ত্তৃক সংগৃহীত। বাঙ্গালা ভাষাতে। মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে। শ্রীরামপুরে তৃতীয়বার ছাপা হইল ১৮১৪। ভাষার নমুনা যথা: "ভাগীরথী তীরে পাটলিপুত্র নামে নগর আছে সেখানে সকল রাজগুণে যুক্ত সুদর্শন নামে রাজা ছিলেন সেই ভূপতি এক সময় কাহারও কর্তৃক পঠ্যমান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন তাহার

অর্থ এই অনেক সন্দেহের নাশক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাপক যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু ইহা যাহার নাই সে অন্ধ। আর যৌবন ও ও ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চতুষ্টয় প্রত্যেকেও অনর্থের নিমিত্ত হয় যেখানে এ চতুষ্টয় সেখানে কি হয় কহিতে পারি না। ইহা শুনিয়া সে রাজা অজ্ঞাতশাস্ত্র এবং সর্ব্বদা বিপথগামী আপন পুত্রেরদিগের শাস্ত্র বিজ্ঞাপনার্থে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া চিন্তা করিলেন। যে পুত্র পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক নয় সে পুত্র হওয়াতে কি প্রয়োজন বরং অনর্থ হয় যেমন কাণ চক্ষুতে কিছু প্রয়োজন নাই প্রত্যুত কাণ-চক্ষু কেবল পীড়ারি কারণ।" ইত্যাদি

রাজাবলী (১৮০৮)—

মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনামূলক পুস্তক দুইখানি—রাজাবলী এবং এবং প্রবোধ চন্দ্রিকা; এ দুয়ের মধ্যে রাজাবলীখানি সমধিক প্রশংসনীয়। অতি পূর্ব্বকাল হইতে ইংরেজ অধিকার পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় রাজা ও সম্রাট্‌গ:ণর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষায় ধারাবাহিকরূপে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা এই প্রথম। প্রবোধচন্দ্রিকা অপেক্ষা রাজাবলীর ভাষা অনেকাংশে প্রসাদগুণবিশিষ্ট। কেরি, রাম রাম বসু এবং চণ্ডীচরণ মুন্সীর রচনায় যেমন চলিত ভাষা প্রয়োগের প্রচেষ্টা সমধিক—মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় সেইরূপ সংস্কৃতমূলক শব্দ ব্যবহারের চেষ্টাই অধিক। মৃত্যুঞ্জয় তদানীন্তন সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলীর মত লিখিত ভাষাকে চলিত ও কথিত ভাষা অপেক্ষা সমুন্নত রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। রাজাবলীর প্রচ্ছদপত্রেই পুস্তকখানির বর্ণনীয় বিষয়ের কথা লিখিত আছে, যথা—"রাজাবলী। অর্থাৎ কলির প্রারম্ভ হইতে ই'রাজের অধিকার

পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষেপ ইতিহাস। সংগ্রহ ভাষাতে। মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০৮।"

রাজাবলীর রচনার নমুনা যথা : "মহারাজ দুর্লভ রায় ও জাফরালী খাঁ প্রভৃতি সরদারদের সলাতে নবাবী সকল সৈন্যেরা দাদনীর উজর করিল। ইহাতে নবাব সিরাজদ্দৌলা মহারাজ দুর্লভরাম প্রভৃতিকে হুকুম দিলেন যে আমার বেগমদের নাকের নথ পর্য্যন্ত যত ধন আছে সে সকল ধন লইয়া যে যে সরদারেরা আপন আপন বিরাদারিদের দরমাহ যত বাকী বলে তাহাদিগকে তাহাই দেও, হিসাবের অপেক্ষা করিও না, পশ্চাৎ হিসাব হইবে, এইরূপে আজি দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সকল ফৌজদের বেবাক দাদনি করিয়া সকল সরদারদিগকে হুকুম দেও যে চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে যেন সকলে আপন আপন বিরাদারি সমেত আসিয়া উপস্থিত হয়।"

রাজাবলী পুস্তকখানির উপসংহারে লিখিত আছে : "এইরূপে নন্দবংশজাত বিশারদ অবধি শাহ্ আলম বাদশাহ পর্য্যন্ত ও মুনইম্ খাঁ নবাব অবধি নবাব কাসমলী খাঁ পর্য্যন্ত কোন কোন সম্রাট রাজারদের ও নবাবেরদের ও তাঁহারদের চাকর লোকেরদের স্বামিদ্রোহাদি নানাবিধ পাপেতে এই হিন্দুস্থানের বিনাশোন্মুখ হওয়াতে পরমেশ্বরের ইচ্ছামতে ঐ হিন্দুস্থানের রক্ষার্থ আরোপিত কম্পনি বাহাদুরের অধিকাররূপ বৃক্ষের পুষ্পিতত্ব ও ফলিতত্বের সমবধায়ক যে বড় সাহেব তৎকর্ত্তৃক ঐ কম্পনি বাহাদুরের অধিকাররূপে বৃক্ষের আলবালস্থে নিরূপিত পাঠশালার পণ্ডিত শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্ম্ম কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত রাজ তরঙ্গ নামে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।" ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয়ের পৌত্র এই রাজাবলীর পঞ্চম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ করেন ; তাহাতে লিখিত আছে :

'গ্রন্থকারের পৌত্র শ্রীবেহারিলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট ৫২ নং ভবন হইতে প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণ।"

প্রবোধ চন্দ্রিকা (১৮১৩)—

রাজাবলী অপেক্ষা চার বৎসর পরের রচনা হইলেও 'প্রবোধ চন্দ্রিকার' ভাষা দুরুচ্চার্য্য উৎকট সংস্কৃত শব্দ এবং অপভ্রষ্ট গ্রাম্য ভাষায় পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "এই উপস্থিত গ্রন্থ যে ব্যক্তি বুঝিতে পারেন এবং ইহার লিপিনৈপুণ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন বলা যাইতে পারে।" বাস্তবিক সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে এ গ্রন্থ সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারা যায় না। এখানি সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারিলে অনেক বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে। ইহাতে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, ছন্দ, স্মৃতি, ন্যায়, সাঙ্খ্য, জ্যোতিষ, রাজনীতি প্রভৃতি সকল জিনিষই আছে। উপদেশ জনক ভূরি ভূরি কথার সমাবেশ থাকিলেও এ গ্রন্থকে উৎকৃষ্ট গ্রন্থমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। গ্রন্থকর্ত্তার সহৃদয়তা নাই, গ্রন্থে সুশৃঙ্খলা নাই, ভাষায় মাধুর্য্য নাই; কখন দীর্ঘ সমাসসম্বলিত, কখন নিতান্ত গ্রাম্য শব্দ সংশ্লিষ্ট। "He makes a curious hotch-potch of the whole by combining the serious with the comic. The metaphysical subjects are huddled up with colloquies of artisans and rustics, and the whole is treated without much care for arrangement or system."—Dinesh chandra Sen.

মনীষী সুশীলকুমার দে এই 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র ইংরেজী করিয়াছেন "Moon-light of Intelligence" এই বিস্তৃত পুস্তকখানি প্রথমতঃ

চারিভাগে বিভক্ত: প্রত্যেক ভাগের নাম স্তবক; প্রত্যেক স্তবক আবার এক একটী কুসুমে বিভক্ত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুস্তকাগারে ইহার অন্যূন তিনটী বিভিন্ন সংস্করণ সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে ১৮৩৩ সালের সংস্করণের পুস্তকখণ্ডের প্রচ্ছদপত্রে লিখিত আছে: প্রবোধ চন্দ্রিকা। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রেরদের নিমিত্ত রচিত। শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১৮৩৩।" পুস্তকখানির আরম্ভ বর্ণমালার দার্শনিক বিবৃতি লইয়া; পরে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, আইন, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ, রাজনীতি এবং আরও বহুবিধ প্রয়োজনীয় জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের তত্ত্বোপদেশে পরিপুর্ণ; এবং উপসংহারে কতকগুলি প্রচলিত উপদেশপূর্ণ গল্প সন্নিবেশিত আছে। পুস্তকখানি বাস্তবিকই জ্ঞানের আকর এবং ভাষাও সমুন্নত এবং তৎকালীন বিদ্বজ্জনানুমোদিত; কিন্তু পুস্তকখানির সন্নিবেশ-শৃঙ্খলা মোটেই নাই, সামঞ্জস্য নাই, গভীর ভাব ও হাল্কা জিনিষ নির্ব্বিচারে একত্রে মিশ্রিত করা হইয়াছে, প্রাঞ্জল ভাষায় জ্ঞানগর্ভ উপদেশপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার মধ্যে মধ্যে কৃষকের বা কলহশীলা রমণীর ইতর ভাষার অপপ্রয়োগ অবাধে মিশ্রিত আছে। এ পুস্তকে পার্শী বা যাবনিক শব্দের প্রয়োগ মোটেই নাই—ইহা এ পুস্তকের বিশেষত্ব। দোষের মধ্যে অতি দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ, মধ্যে মধ্যে অতি দীর্ঘ বাক্যবিন্যাস এবং সময়ে সময়ে শব্দ সমূহকে অপ্রচলিত অর্থে প্রয়োগ—প্রভৃতি দোষ এই পুস্তকখানিতে অতিরিক্ত মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়; এইসকল দোষ না থাকিলে পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সে সময়কার পুস্তক সমষ্টির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক বলা যাইতে পারিত।

প্রবোধ চন্দ্রিকার ভাষার নমুনা যথা—"অনন্তর সে জলের ভিতরেও

ক্রিমিকীট দর্শন করিয়া তৎপান পরিত্যাগ করিয়া অতি পিপাসাতে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া বর্ষোদক প্রত্যাশাতে উর্দ্ধে মুখব্যাদান করিয়া আছেন এতদবসরে এক বায়স পক্ষী ওদ্বক্ত্র মধ্যে শৌচ করিয়া দিল। পরে ঐ ব্রাহ্মণ একেতো তৃষ্ণাতে শুষ্ককণ্ঠ ছিলেন দ্বিতীয়তঃ বক্ত্রান্তর্গত বায়স-পুরীষ দুর্গন্ধ প্রযুক্ত হুক্কার করিতে করিতে গলা ফাটিয়া মরেন ইত্যবসরে তত্ত্বজ্ঞ এক পরমহংস স্বামী তথা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঐ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিয়া সকল বিষয় সবিশেষ গোচর হইয়া কহিলেন ওরে মূর্খ কর্ম্মজড় কূপমণ্ডূক উড়ুম্বর মশক অসদুপদেশ দুরাগ্রহে-দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আমার এই কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া মুখ প্রক্ষালন ও জল-পান করিয়া প্রাণরক্ষা কর। সন্ন্যাসীর এই বাক্যে তৎক্ষণে ঐ বিপ্র করঙ্গপানীয়েতে লপন-ধাবন ও উদন্যা নিবৃত্তি করিয়া সুস্থ হইল।"

ইহার মুখবন্ধের ভাষা আরও দুরূহ: "অনভিব্যক্ত-বর্ণধ্বনিমাত্ররূপা পরানাম্নী ভাষা প্রথমা যেমন অভিনব কুমারেরদের ভাষা। তদনন্তর অভিব্যক্ত বর্ণমাত্রা পশ্যন্তী নামক ভাষা দ্বিতীয়া যেমন প্রাপ্ত যৎকিঞ্চি-দ্বয়স্ক বালক বাণী। তৎপর পদমাত্রাত্মক মধ্যমাভিধা তৃতীয়া ভাষা যেমন পূর্ব্বোক্ত বালকাধিক কিঞ্চিদ্বয়স্ক শিশুভাষা। তারপর বাক্যরূপ বৈখরী নামধেয়া সকল শাস্ত্র স্বরূপা বিবিধ জ্ঞান প্রকাশিকা সর্ব্বব্যবহার প্রদর্শিকা চতুর্থী ভাষা যেমন লৌকিক শাস্ত্রীয় ভাষা। ঈদৃশরূপে জাত মাত্র বালকের উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধিক্রমে ক্রমশঃ প্রবর্ত্তমানা চতুর্ব্ব্যূহ-রূপা ভাষা অস্মদাদিতে যুগপৎ প্রবর্ত্তমানত্বরূপে যদ্যপি প্রতীয়মানা হউন তথাপি পূর্ব্বোক্ত পরাপশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীরূপ চতুর্ব্ব্যূহরূপেতেই প্রবর্ত্তমানা হউন।"

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যান সাহেব প্রবোধ চন্দ্রিকার মুদ্রণকালে তদ-

ভূমিকায় লিখিয়াছেন "পুস্তকখানি খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত এবং বাঙ্গালা গদ্যের একটী সুন্দর নমুনা। * * যিনি এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন তিনি নিজেকে বাঙ্গালা ভাষায় বুৎপন্ন বলিয়া মনে করিতে পারেন।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধ চন্দ্রিকাতে যেমন পণ্ডিতী ভাষা আছে, তেমন চলিত ভাষাও যথেষ্ট আছে। চলিত ভাষার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল: "স্ত্রী কহিল, গুড় হইলেই কি রাঁধা হয়? তৈল নাই, লুন নাই, চাউল নাই, তরকারীপাতি কিছুই নাই। কাঠগুলি সকলি ভিজা, বেসাতি বা কিরূপে হবে * * * কুটনা বা কে কুটিবে, বাটনা বা কে বাটিবে? তৎপতি কহিল, আজ কি ঘরে কিছুই নাই, দেখ দেখি খুদ কুঁড়া যদি কিছু থাকে, তবে তার পিঠা কর, এই গুড় দিয়া খাইব। ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল, বটে পিঠা করা বুঝি বড় সহজ? জান না, পিঠা আঠা; যেমন আঠা লাগিলে শীঘ্র ছাড়ে না, তেমনি পিঠার লেঠা বড় লেঠা, শীঘ্র ছাড়ে না। কখনো ত রাঁধিয়া খাও নাই। আর লোকদের মাউগের মতন মাউগ পাইয়া থাকিতে, তবে জানিতে।"

মৃত্যুঞ্জয় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে পুরুষ পরীক্ষা নামক বিদ্যাপতির সংস্কৃত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করেন। ইনি বেদান্ত চন্দ্রিকা নামক আর এক-খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন—তাহা মাত্র ২৫০ খানি মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

গোলকনাথ—হিতোপদেশ (১৮০১)—

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত গোলকনাথ শর্ম্মা শ্রীরামপুর হইতে হিতোপদেশের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করেন। ইহার ভাষার নমুনা যথা—"হস্তিনাপুরেতে বিলাস নামে এক রজক আছে তাহার গর্দ্দভ অনেক বহিয়া

অত্যন্ত দুর্ব্বল মরিবার ন্যায় হইয়াছে। তাহার পর সে রজক ব্যাঘ্রের চর্ম্ম লইয়া তাহাকে আচ্ছাদন করিল তাহা করিলে অরণ্যের নিকট শস্যতে ছাড়িয়া দিল। তাহার পর সকল ক্ষেত্রপতিরা তাহাকে ব্যাঘ্র জ্ঞান করিয়া পলায়ন করে। তারপর একদিন কোন ক্ষেত্ররক্ষক এক কম্বল গায় জড়াইয়া ধনুর্ব্বান সজ্জা করিয়া আছে তারপর গর্দ্ধভ শস্য খাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে অতএব উহাকে গর্দ্ধভী জ্ঞান করিয়া ওঃ শব্দ করিলেক। সে শুনিল বলিল যে এ গর্দ্ধভের শব্দ এই নিশ্চয় হইলে তীরে হনন করিল।"

গোলকনাথের ভাষা বেশ সরল এবং প্রাঞ্জল। গোলকনাথের রচনায় পার্শীর বাহুল্য নাই বলিলেই চলে। গোলকনাথ ভাষাকে সাধ্যমত সরল, হৃদয়স্পর্শী, ব্যবহারোপযোগী এবং প্রাঞ্জল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গোলকনাথের হিতোপদেশের একখণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে সংরক্ষিত আছে।

গোলকনাথের পর আরও অনেকে এই হিতোপদেশ বাঙ্গালায় অনূদিত করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় আরও অনেক উত্তম পুস্তক থাকা সত্ত্বেও হিতোপদেশখানি সর্ব্বাপেক্ষা সরল, সারগর্ভ এবং উপদেশবহুল বলিয়া এত লোকে এককালীন এই পুস্তকেরই বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

হিতোপদেশের অন্যান্য বঙ্গানুবাদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বঙ্গানুবাদ, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ডাক্তার ইয়েট্সের বঙ্গানুবাদ এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের বঙ্গানুবাদ সমধিক প্রসিদ্ধ।

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার—

গদাধর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার

এই সময়কার একজন প্রগাঢ় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ১৮৩৬ সালে 'ব্যবস্থা রত্নমালা' নামক আইন সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ পুস্তক সঙ্কলন করেন। দীনেশবাবু এই 'ব্যবস্থা রত্নমালার' ইংরেজি করিয়াছেন 'A garland of the jewels of Jurisprudence.' ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লাইব্রেরীতে ব্যবস্থাশাস্ত্র বিষয়ক যত পুস্তক ছিল—সেই সমস্ত পুস্তক ও পুরীধামের মুক্তি-মণ্ডপ হইতে আনীত বহু প্রাচীন ব্যবস্থা বিষয়ক পুস্তক এবং আরও অনেক পুস্তক একত্র মিলাইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ এই বিপুল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। দীনেশবাবু বলিয়াছেন—ইনি সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ ছিলেন এবং ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা অবলম্বনে একখানি ব্যবস্থাশাস্ত্র বিষয়ক পুস্তক রচনা করেন।

ব্যবস্থা রত্নমালাই ইঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ; তৎকাল রচিত বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ সমূহের তুলনায় ইহার ভাষা যথেষ্ট সরল এবং প্রাঞ্জল। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার এই পুস্তকখানির রচনানৈপুণ্যের দরুণ সকলের সমবেত সাক্ষর সহ একখানি প্রশংসা পত্র লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রদান করেন।

ব্যবস্থারত্নমালার ভূমিকার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:—

ভারতবর্ষের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি যাবদ্বর্ণ ও বর্ণ সঙ্কর আপন আপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করত বাস করিতেছেন তাহাদিগের আচার ও ব্যবহার এবং প্রায়শ্চিত্ত নির্ব্বাহের নিমিত্তে মনু ও অত্রি ও বিষ্ণু ও হারীত ও যাজ্ঞবল্ক্য ও উশনা ও অঙ্গিরা ও যম ও আপস্তম্ব ও সম্বর্ত্ত ও কাত্যায়ন বৃহস্পতি ও পরাশর ও ব্যাস ও শঙ্খ ও লিখিত ও দক্ষ ও গৌতম

ও শাতাতপ ও বশিষ্ঠ ও মরীচ ও দেবল ও নারদ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র বক্তা অনেক ঋষি সংহিতা করিয়াছেন।

তাহাতে কোন কোন স্থলে মুনিরদিগের মতের বিভিন্নতা আছে তাহা যে যে ঋষির শাখার যে যে ব্রাহ্মণ তাহারাই প্রতিপালন করিয়াছেন এবং তাহারদিগের শিষ্য ও যজমান যে যে ক্ষত্রিয়াদি তাহারাও সেই সেই মত অবলম্বন করিয়াছেন।

তাহার পর সেই সেই বংশে যাহারা আচার্য্য হইয়াছিলেন তাহারা ঐ সকল মুনি বচন প্রমাণ দিয়া অন্য অন্য মুনি বচনের তদনুযায়ী অর্থ করিয়া পৃথক পৃথক স্মৃতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সকল স্মৃতি শাস্ত্র তত্তদ্দেশীয় রাজার সহায়তায় প্রচলিত হইয়াছে তার মধ্যে বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য্যকৃত যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ব্যাখ্যা মিতাক্ষারা নামে যে ধর্ম্ম শাস্ত্র সেই অত্যুত্তম সর্ব্বত্র হিন্দুস্থানে মান্যরূপে প্রচলিত হইতেছে।

তাহারপর এতদ্দেশে জীমূতবাহন নামা এক মহোপাধ্যায় হইয়াছিলেন তিনি ধর্ম্মরত্ন নামক এক স্মৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার ব্যবহারের একদেশ দায়ভাগ মাত্র এদেশে আছে আর পাওয়া যায় না।

সংপ্রতি এই দায়ভাগ উড়িশ্যা অবধি বেহারের পূর্ব্ব আসাম এবং মেকলির পশ্চিম আর ভোটানের দক্ষিণ ও সমুদ্রের কিঞ্চিত উত্তর এইরূপ চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন পূর্ব্ব পশ্চিমে কিঞ্চিৎ ন্যূন বা অধিক ২০০ শত ক্রোশ আর দক্ষিণোত্তর অনুমান সার্দ্ধৈক শত ক্রোশ ১৫০ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশ।

ইহার মধ্যে রাঢ় ও গৌড় ও পৌণ্ড্র এবং বরেন্দ্র প্রভৃতি অনেক দেশ ভেদ বোধক সংজ্ঞা আছে কিন্তু এ সকল বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী

ইহাতে ঐ দায়ভাগ মান্যরূপে প্রচলিত আছে এবং ঐ মিতাক্ষরার সহিত যে যে ব্যবস্থার ঐক্য হয় তাহা অন্য দেশেও চলে। * * *"

এই স্থলে ডাক্তার জন বি, গিলক্রাইষ্ট প্রণীত ওরিয়েণ্টাল ফ্যাব্যুলিষ্ট (১৮০৩) নামক পুস্তকের উল্লেখ করা যায়। পুস্তকখানিতে অন্য গল্পের মধ্যে ইংরেজি ইশপ্ স্ ফেব্ লের বঙ্গানুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। শুনা যায় এই অনুবাদকার্য্যে তারিণীচরণ মিত্র সাহেবকে সাহায্য করিয়াছিলেন। পুস্তকখানির রচনার নমুনা যথা :—"ষষ্ঠ কথা। খেঁকশিয়ালী ও দাঁড়কাকের।

এক খেঁকশিয়ালী দেখিলেক এক দাঁড়কাক ভাল এক টুকরা পোনীরের আপন মুখে লইয়া গাছের ডালের উপর বসিয়া রহিয়াছে, তৎক্ষণাৎ খেঁকশিয়ালী বিবেচনা করিতে লাগিল যে এমন সুস্বাদু গ্রাস কেমন করিয়া হাত করিতে পারিব। কহিলেক, হে প্রিয় কাক, আজি সকালে তোমাকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার সুন্দর মূর্ত্তি আর উজ্জ্বল পালক আমার চক্ষের জ্যোতি, যদি নম্রতাক্রমে তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটী গান শুনাইতে তবে নিঃসন্দেহ জানিতাম যে তোমার স্বর তোমার আর আর গুণের সমান বটে। * * *" এ পুস্তকখানির ভাষাও অতি সহজ এবং সরল।

হাণ্টার সাহেব—বাঙ্গালার জাতিভেদ (১৮০৪)—

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার আর একজন সাহেবের বাঙ্গালা গদ্য রচনার নমুনা দিয়াছেন: হাণ্টার সাহেবের "বাঙ্গালার জাতিভেদ" (১৮০৪); নমুনা: "হিন্দুলোকেরা যদিও আপন শাস্ত্রের নিশ্চয়েতে থাকে তবে অন্য দেশের বিদ্যাও ব্যবহার যদি ভালও হয় তবু তাহা গ্রহণ করিতে পারে না যদি অন্য দেশের বিদ্যা ও ব্যবহার দেখে কিম্বা শুনে তথাপি

তুচ্ছ করিয়া আদর করে না অতএব অন্য লোকের ব্যবহারেতে তাহাদের জ্ঞানলাভ হইতে পারিবে না।" ইনি কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন।

চণ্ডীচরণ মুন্সী—"তোতা ইতিহাস"—

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীচরণ মুন্সী তোতা ইতিহাস প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকের রচনার নমুনা যথা: "পূর্ব্বকালের ধনবানেদের মধ্যে আমদ্ সুলতান নামে একজন ছিলেন তাহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্য সামন্ত ছিল। এক সহস্র অশ্ব পঞ্চশত হাতী নবশত উষ্ট্র ভারের সহিত তাহার দ্বারে হাজীর থাকিত কিন্তু তাহার সন্তান সন্ততি ছিল না। এই কারণ তিনি দিবারাত্রি ও ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বর পূজকেরদের নিকটে গমন করিয়া সেবার দ্বারা সন্তানের বর প্রার্থনা করিতেন। কতক দিবস পরে ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যের ন্যায় বদন চন্দ্রের ন্যায় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাহাকে দিলেন। আমদ সুলতান ঐ সন্তান পাইয়া বড় প্রফুল্লচিত্ত পুষ্পবৎ বিকশিত হইয়া সেই নগরস্থ প্রধান লোক আর মন্ত্রী ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগুরু আর ফকিরেরদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বহুমূল্য খেলাৎ বস্ত্রাদি দিলেন যখন সেই বালকের সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন আমদ্ সুলতান একজন বিদ্বান লোকের স্থানে পড়িবার জন্য সেই পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। কতক দিবসেতে সেই বালক আরবী ও পারস্য শাস্ত্রের সমুদায় পুস্তক পড়িয়া সমাপ্ত করিয়া রাজসভার ধারামত কথোপকথন আর বসন উঠন শিক্ষা করিলেন। তারপর রাজার আর সভাস্থ লোকেরদের পসন্দেতে উত্তম হইলেন।" এই পুস্তকের একখণ্ড কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ

লাইব্রেরীতে আছে। পুস্তকখানির প্রচ্ছদপত্রে লিখা আছে: তোতা-ইতিহাস। বাঙ্গালা ভাষাতে। শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্‌শীতে রচিত। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০৫। তোতা ইতিহাস কোন পারশী পুস্তকের অনুবাদ মাত্র হইলেও ভাষা এবং রচনা হিসাবে "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র" অপেক্ষা ভাল—সন্দেহ নাই। কথিত আছে—চণ্ডীচরণ সংস্কৃত ভগবদ্‌গীতারও বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু পুস্তকখানি মুদ্রিত করিয়াছিলেন কি না বলা যায় না।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র চরিত—

অন্যান্য পুরাতন গদ্য পুস্তকের মধ্যে "মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রচরিত" নামক একখানি পুস্তক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; লেখকের নাম রাজীবলোচন। পুস্তকখানি ১৮১১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে মুদ্রিত। "ইহা প্রাচীনকালের খাঁটি বাঙ্গালায় লিখিত।" শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার এই পুস্তকখানিকে "এই সময়ের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ" ও রাজীবলোচনকে "তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যের 'এডিসন' বলিয়াছেন। সুশীলকুমার দে শ্রীরামপুরে ছাপা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র চরিতের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন; পুস্তকখানির প্রচ্ছদপত্রে লিখিত আছে: মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং। শ্রীযুত রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়ের রচিতং। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ধরণীর মাঝ যাহার অধিকারে নবদ্বীপ সমাজ। পূর্ব্ববৃত্তান্ত যত করিয়া প্রচার কৃষ্ণচন্দ্র চরিত পরে করিব বিস্তার। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০৫" ইহার ভাষার নমুনা—"পরে নবাবস্রাজেদ্দৌল্লা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন কোন মতে রক্ষা নাই আপন সৈন্য বৈরি হইল অতএব আমি এখান হইতে পলায়ন করি। ইহাই স্থির করিয়া নৌকাপরি আরোহণ করিয়া

পলায়ন করিলেন। পরে ইঙ্গরাজ সাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীরজাফরালি খান মুরসিদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইঙ্গরাজী পতাকা উঠাইয়া দিলে সকলে বুঝিল ইঙ্গরাজ মহাশয়েরদিগের জয় হইল। তখন সমস্ত লোক জয়ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল এবং নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল। যাবদীয় প্রধান প্রধান মনুষ্য ভেটের দ্রব্য দিয়া সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব সকলকে আশ্বাস করিয়া যিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন সেই সেই কর্ম্মে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া রাজপ্রসাদ দিলেন। মীরজাফরালিকে নবাব করিয়া সকলকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে সাবধান পূর্ব্বক রাজকর্ম্ম করিবা রাজ্যের প্রতুল হয় এবং প্রজালোক দুঃখ না পায়। সকলে আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।"—সে সময়কার ভাষা মোটের উপর প্রায় সবই এই রকমের,—বরং ইহা তবু কতকটা পরিমার্জ্জিত। অধিকাংশ গদ্য রচনাতেই দেখা যায় যেমন সমাসের আড়ম্বর তেমনি উপমা অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারেরও ছড়াছড়ি; কাজেই তখনকার রচনাগুলি হইত যেমন শ্রুতিকটু তেমনি প্রহেলিকাময় ও দুর্ব্বোধ্য।

হরপ্রসাদ রায়—

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের অধ্যয়নের নিমিত্ত হরপ্রসাদ রায় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কবি বিদ্যাপতি রচিত পুরুষপরীক্ষা নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন; এই গ্রন্থের রচনার নমুনা যথা: "জয়ন্তী নগরীতে ধীরবিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজ যোগ্যতাতে ধন উপার্জ্জন করিয়া, নির্ভীক ও বহুপুত্রযুক্ত হইয়া সুখে কালযাপন করেন। এক রাত্রিতে রাজা খট্টাতে শয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে কোন স্ত্রীর রোদনের শব্দ শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া

ঐ শব্দানুসারে অনুসন্ধান করিতে করিতে নগর প্রান্তে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী নব যুবতী, নানাভরণ ভূষিতা আর উত্তম বস্ত্র পরিধানা এমন এক স্ত্রীকে দেখিলেন।" সুশীলকুমার দে এই পুরুষপরীক্ষার ইংরেজি করিয়াছেন "The Trial of Man." পুস্তকখানির প্রচ্ছদ পত্রে লিখিত আছে: শ্রীযুত বিদ্যাপতি পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংস্কৃত বাক্যে সংগৃহীতা পুরুষপরীক্ষা। হরপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিতা। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮১৫। গ্রন্থারম্ভে লিখিত আছে: "অভিনব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালকেরদিগের নীতিশিক্ষার নিমিত্তে এবং কামকলা কৌতুকাবিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্তে শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। এবং এই প্রার্থনা করিতেছেন যে রসজ্ঞান দ্বারা নির্ম্মলবুদ্ধি যে পণ্ডিত সকল তাহারা নীতি বোধানুবোধক যে এই সকল বাক্যের গুণ তন্নিমিত্তে কি আমার রচিত এই গ্রন্থ শ্রবণ করিবেন না অর্থাৎ অবশ্য শ্রবণ করিবেন। যে গ্রন্থের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্থের কথা সকল লোকের মনোরমা হয় সেই পুরুষ পরীক্ষা নামক পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।"

কাপ্তেন রিচার্ডসন (১৮০১)—

এই সময়ে একজন ইংরেজ নিজের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের বলে তদানীন্তন বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায়কে স্বদলে আকৃষ্ট ও স্বমতে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—তিনি কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসন্। মেটকাফের জীবনী-প্রণেতা কে সাহেব (Mr. J. Kaye) ইংরেজিভাষায় এই রিচার্ডসনের যে জীবনী প্রণয়ন করেন তদ্দৃষ্টে বা তদবলম্বনে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-ভাষায়ও এই রিচার্ডসন সাহেবের একখানি জীবনী প্রকাশিত হয়;

পুস্তকখানির preface এ লিখিত আছে "Captain D. L Richardson has done lasting service to the cause of English Literature and to the great cause of Native Education in Bengal." দেশীয় ভাষা বিস্তারোদ্দেশে রিচার্ডসনের নাম সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ না করিলেও তিনি যে ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় একজন বিশেষ ব্যুৎপন্ন লোক ছিলেন, এবং স্বীয় জ্ঞান গরিমায় তদানীন্তন তরুণ সম্প্রদায়কে স্তম্ভিত ও বিমোহিত করিয়া রাখিয়া ছিলেন তাহা অবিসংবাদিত। বঙ্গভাষায় রচিত এই রিচার্ডসনের জীবনীর এক খণ্ড উত্তরপাড়া পাব্লিক লাইব্রেরীতে আছে। পুস্তকখানি উমেশচন্দ্র দত্তকে উৎসর্গীকৃত; পুস্তকখানির প্রচ্ছদপত্রে লিখিতআছে—

The
Biography
of
Captain D. L. Richardson
in the Vernacular Tongue
chiefly translated from the sketches of
his life by Mr. J. Kaye
and
partly drawn up from materials collected
from various other sources,
Calcutta
Printed by D' Rozario and Co, 8, Tank Square.
1858.

জন. ক্লার্ক. মার্শম্যান (১৭৯৪—১৮৭৭)—

ডাক্তার জশুয়া মার্শম্যানের সুযোগ্য পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যানও পিতার মত উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে বহুসংখ্যক বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার কয়েকখানি মাত্র পুস্তকের বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল :

(১) ভারতবর্ষের ইতিহাস। অর্থাৎ কোম্পানি বাহাদুরের সংস্থাপনাবধি মার্কুইশ হেষ্টিংসের রাজ্যশাসনের শেষ বৎসর পর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয়েরদের কৃত তাবদ্বিবরণ। ২ বালম। শ্রীরামপুর। ১৮৩১ ইহার ভাষার নমুনা, যথা—"সুপ্রিম কোর্ট ও গবর্ণমেণ্টেতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত নিয়ত বিবাদ হওয়াতে দেশস্থ ভাবল্লোকেরা অস্থিরমনস্ক ও ভয়াকুল হইল। কিন্তু ১৭৭৯ সালে ঐ বিবাদ স্বরূপ বিস্ফোটকের মুখ হয় তাহার কারণ লিখি। ১৭৭৯ সালের ১৩ আগস্ত তারিখে কাশীযোড়ার রাজার নামে এক পরওয়ানা বাহির হয় তাহাতে এই লিখিত ছিল যে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার জামিন যদি রাজা না দেন তবে তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিবা। রাজা ঐ পরওয়ানার ভয়েতে অস্পষ্ট থাকিলেন তাহাতে রাজস্ব আদায় করা বাকী পড়িতে লাগিল অপর ঐ পরওয়ানা জারী না হইয়া ফিরিয়া আসাতে তাঁহার ভূম্যাদি সম্পত্তি ক্রোক করণের নিমিত্তে অপর এক পরওয়ানা বাহির হইল এবং তাহা জারী করণার্থ কলিকাতার সরিফ সাহেব আদালতের এক সারজন ও ষাইটজন বরকন্দাজকে তথায় পাঠাইলেন।"

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস or History of Bengal from the Accession of Suraj-ad-Daulah to the Adminis-

tration of Lord William Bentinck translated from the English of J. C. Marshman. Calcutta 1848.

এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ "বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত" নামে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি হইতে ১৮৫৩ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

পুস্তকখানি উত্তরপাড়া পাব্লিক লাইব্রেরীতে আছে। প্রচ্ছদ পত্রের অনুলিপি যথা—

বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত
শ্রীযুক্ত মার্শমান সাহেবের রচিত
গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

ভাষার নমুনা: "পুরুষপরম্পরাগত বাক্যানুসারে আদিশূরের ঔরসে বল্লালসেন জন্মিলেন। কিন্তু অল্পকাল হইল বঙ্গদেশের পূর্ব্ব-ভাগে ভূমিতে পোঁতা একটি পুরাতন তাম্রপত্র পাওয়া গেল, তাহাতে যে লিপি বৈদ্য বংশের অধিকার সময়ে খোদিত হইয়াছিল, তদনুসারে বল্লালসেনের পিতার নাম বিজয় সেন, এবং আইন আক্‌বেরী নামক পুস্তকানুসারে তাঁহার নাম সুখসেন ছিল। আর বল্লাল যে আদিশূরের পুত্র নহেন, তাহা সপ্রমাণ বটে, যেহেতুক আদিশূর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনাইয়া ছিলেন, তাঁহাদের সন্তানাদি বংশ বল্লালসেনের অধিকার সময়ে অতি বহু সংখ্যক হওয়াতে বল্লালসেন তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া কৌলীন্য পদের সৃষ্টি করিলেন। এক রাজার অধিকার সময়ে পাঁচজন কেমন করিয়া এত বহু বংশ হইতে পারে? অতএব আদিশূর বল্লালের পিতা না হইয়া তাঁহার পূর্ব্বকালীয় কোন বংশজাত ছিলেন, এবং

বল্লালের প্রকৃত পিতা বিজয় সেন উক্ত রাজবংশের আদি পুরুষ ছিলেন, আমরা এ মত সিদ্ধান্ত করি।"—পৃষ্ঠা ৪।

(৩) পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ। অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি খৃষ্টীয়ান শকের আরম্ভ পর্য্যন্ত। শ্রীরামপুর। ১৮৩৩। or Brief Survey of History in Bengalee from the creation to the Christian era. Calcutta. 1862. (Also called ইতিবৃত্তসার)

(৪) দেওয়ানি আইনের সংগ্রহ। অর্থাৎ যে সকল আইন ও আইনের অর্থ সর্কুলর অর্ডর প্রভৃতি ইংরাজী ১৭৯৩ সাল লাং ১৮৩৪ সাল হইয়াছে তাহা। শ্রীযুত জান মার্শমান সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত। শ্রীরামপুর। ১৮৩৪। তখনকার প্রচলিত বাঙ্গালা আইনের ভাষার নমুনা স্বরূপ ইহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল: "জমিদার ও তালুকদার ও ভুম্যধিকারী ও ইজারাদার প্রভৃতির সাধ্য আছে যে তাহারদিগের কাহারু মালগুজারীর বাকী দাওয়া কোন মফঃসল তালুকদার রাইয়ত প্রভৃতির উপর থাকিলে যদি সেই বাকী টাকা মাল ক্রোক করণের দ্বারা আদায় করিতে না পারেন তবে সেই বাকীদার অথবা তাহার মালজামিনের স্থানে সেই বাকী তলব করিতে অথবা সেই বাকীদার মালজামিন পলাইতে উদ্যত হইলে তাহাকে তলব না করিয়া ঐ পলায়নোন্মুখ বাকীদার কি মালজামিনকে নীচের লিখিত মতে কয়েদ করিতে পারেন। * *"

(৫) জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায় or a Treatise on Astronomy and Geography translated into Bengalee. 2nd Edition. Serampore 1819.

(৬) দারোগার কর্ম্মপ্রদর্শক গ্রন্থ or a Translation of

J. C. Marshman's Darogah's Manual comprising the duties of the landholders in connexion with the police. Serampore. 1851.

(৭) সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস। সকল লোকের হিতার্থে বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা করা গেল। তাহার একদিগে ইঙ্গরাজী একদিগে বাঙ্গালা। শ্রীরামপুর।. ১৮২৯।

(৮) ক্ষেত্র বাগান বিবরণ অর্থাৎ আগ্রিকলচরাল ও হর্টিকলচরাল সোসাইটির নিষ্পত্তি কার্য্যের বিবরণ পুস্তক।

(৯) Abridgment of Carey's Dictionary.

ডাক্তার উইলিয়ম ইয়েটস্ (১৭৯২—১৮৪৫)—

এই স্থলে আর একজন পাদরী লেখকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে: ডাক্তার উইলিয়ম ইয়েটস্; ইনি সামান্য মুচীর পুত্র হইয়াও ভারতবর্ষীয় ভাষা সকল অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার স্কুল বুক সোসাইটীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ইনি অনেক বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—

(১) হিতোপদেশ (expurgated edition) 1821.

(২) পদার্থ বিদ্যা or Natural Philosophy and History (1824).

(৩) সার সংগ্রহ: or Vernacular Class Book.

(৪) পদার্থ বিদ্যাসার।

সারসংগ্রহ: ও পদার্থ বিদ্যাসার দুইখানি পুস্তক উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে আছে; সারসংগ্রহ পুস্তকখানির শেষভাগে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তক সমূহের

একটী তালিকা সংযোজিত আছে।* তখনকার পাদরীরা অনেক পুস্তক কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত করিতেন। উক্ত সারসংগ্রহ পুস্তকের প্রচ্ছদ পত্রে লিখিত আছে—

Vernacular
Class-Book Reader
for
Colleges and Schools.

পুস্তকখানিতে বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ আছে। ইহার রচনার নমুনা স্বরূপ কিয়দংশ নিম্নে প্রদর্শিত হইল—ছাপা কর্ম্মারম্ভের কথা: অনেক লোক ছাপা যন্ত্র নির্ম্মাণ জন্য সম্মান অধিকার করিতে চাহে, কিন্তু বাস্তব হলাণ্ডদেশের হার্লেম নগরে প্রথমে এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইল, ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করে। ঐ নগরের শাসনকর্ত্তা লারেন্স কোস্তর সাহেব ১৪৪০ শকে তাহা নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি একদিন বিহারার্থে নিকটস্থ উপবনে গিয়া আপন নামের অক্ষরের আকারানুসারে বৃক্ষের কতকগুলিন ত্বক কাটিয়াছিলেন। পরে ঐ অক্ষরাকার ত্বকখণ্ডসকল কাগজের উপরে রাখিয়া হঠাৎ তাহা তুলিলে কুজ্‌ঝটিকাদ্বারা ঐ অক্ষরের আকৃতি সমস্ত কাগজে

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁহার Western Influence in Bengali Literature নামক গ্রন্থের ৮৭ পৃষ্ঠায় কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত অনেকগুলি পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি এই যুগের 'The Vernacular Literature Society নামক পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকগুলিরও একটী তালিকা দিয়াছেন।

লাগিয়াছে ইহা দেখিলেন। পরে বিবেচনা করিয়া অন্যান্য প্রকার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ; অপর (অতঃপর ?) তিনি কাষ্ঠের অক্ষর নির্ম্মাণ করিয়া এক প্রকার ঘন দ্রব বস্তুতে তাহা ডুবাইয়া কাগজে ছাপা করিলেন, তাহাতে আ (রো) উত্তম ছাপা হইল, ইহা দেখিলেন। পরে তিনি শিশকের ও শিশকরাঙ্গ মিশ্রিত ধাতুর অক্ষর নির্ম্মাণ করিয়া আপন গৃহে এক ছাপা যন্ত্র স্থাপন করিলেন। এই প্রকারে তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত এই উত্তম ছাপাবিদ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। পরে যোহন ফৌষ্ট নামে তাহার এক দাস গোপনে ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মেন্‌স নামক নগরে গিয়া আপনি তাহা ব্যবহার করিল, তাহাতে সে ঐ নূতন বিদ্যাদ্বারা বিদ্বান ও মায়াবীরূপে বিখ্যাত হইল।

এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে এই ছাপাবিদ্যার পারিপাট্য হইলে তাহা দ্বারা লোকদের মধ্যে নানা জ্ঞান প্রকাশিত হইল, ও মনুষ্য জাতির এক প্রকার নূতন যুগ হইয়া উঠিল। * * * [পৃ— ১০৬-৭]

এই পুস্তকের অপর এক স্থলে 'কাশী নগরের কথা' বিবৃতিকালে উক্ত সাহেব তৎকালীন তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত এ দেশ সম্বন্ধীয় ভৌগোলিক জ্ঞানের বড় কৌতুকপ্রদ পরিচয় দিয়াছেন, যথা—বারাণসী প্রদেশের মধ্যে কাশী নামে এক রাজধানী আছে, সে বিষুবরেখা হইতে উত্তরে ২৫ অংশ ৩০ পল এবং ধ্রুবরেখা হইতে পূর্ব্বে ৮৩ অংশ দূর হয়। এবং তন্মধ্যে বারা ও নসী এই দুই নদী থাকাতে সংস্কৃত ভাষাতে সে বারাণসী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছে।

এই নগরের নিকটে গঙ্গা নদী দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত ধনুর্ব্বৎ বক্ররূপে গমন করে, সেই বক্র উচ্চতীরেতে নির্ম্মিত এই কাশী নগর পুণ্যস্থানরূপে

বিখ্যাত আছে। নদী তীরের উপরিস্থ পথ অবধি নীচস্থ জল পর্য্যন্ত নানাবিধ গৃহাদি নির্ম্মিত আছে, তাহাতে নদীর অন্য পারস্থ সমভূমিতে দণ্ডায়মান হইলে এককালে সমুদয় নগর দর্শন হয় এবং মধ্যে মধ্যে কূল অবধি পথ পর্য্যন্ত ৩০ পদ পরিমিত উচ্চ অনেক অনেক ঘাট বৃহৎ প্রস্তরেতে সুনির্ম্মিত আছে। সে স্থানে এইরূপ ঘাট নির্ম্মাণ হিন্দুলোকদের নিকটে অতিপুণ্যজনক কর্ম্মরূপে গণিত হয়।

এই নগরের পথ সকল এমত সঙ্কীর্ণ যে অশ্ব ও হস্তি আরূঢ় লোকদের অতি কষ্টে যাইতে হয়। * * * [পৃ—১৭১-২]

ইয়েটস্ সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ—(১৮৪৯)

পূর্ব্বোক্ত ইয়েটস্ সাহেব প্রণীত আর একখানি পুস্তক কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে আছে ; পুস্তক খানি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ—ইংরেজি বাঙ্গলায় লিখিত ; বর্ণিতব্য বিষয়গুলি সাজান ঠিক ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণের ধরণে। পুস্তক খানির প্রচ্ছদপত্রের অনুলিপি যথা—

A

Bengali Grammar

By

The Late Rev. W. Yates, D. D.

Reprinted with improvements from his

introduction to the Bengali language

Edited by J. Wenger

Calcutta

Printed by J. Thomas, Baptist Mission Press

1849.

পুস্তক খানির প্রথম পত্রে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিল মোহর অঙ্কিত আছে। পুস্তকখানির শেষ পরিচ্ছেদে বাঙ্গালা ভাষার রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃতি আছে ; তাহা হইতে তদানীন্তন বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের অবস্থাও কিঞ্চিৎ জানিতে পারা যায় : "It is much to be regretted that no standard of style exists which might serve as a pattern for imitation. This is owing to the comparatively recent origin of Bengali literature: the language, especially the written language, is at present still in a fluctuating condition. * * * It is, however, far from being rich enough, at present, to answer all the purposes of a language."

পদার্থ বিদ্যাসার : (১৮২০)—

এই সময়কার অপর একখানি গ্রন্থ পদার্থ বিদ্যাসার : [Elements of Natural Philosophy and Natural History] পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ—১৮২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত একখণ্ড উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীতে আছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত "পাদ্রি মানুএল—দা—আস্‌সুম্প্‌সাম্‌ রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ যেমন বামদিকে পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত মূল পুস্তক ও ডান দিকে তাহার বঙ্গানুবাদ, এই পদার্থবিদ্যাসার পুস্তকখানিরও সেইরূপ বামদিকে যাহা ইংরেজিতে লিখিত, ডানদিকে তাহার অবিকল বঙ্গানুবাদ। পুস্তকখানি যে সময়কার রচনা সে সময়ে ইহার মূল্য যথেষ্ট ; কারণ তখন এখনকার মত বাঙ্গালা ভাষায় পদার্থবিদ্যা বা

বিজ্ঞান বা পর্য্যবেক্ষণ শিক্ষা বিষয়ক পুস্তকের এত ছড়াছড়ি ছিল না। পুস্তকখানির প্রচ্ছদ পত্র না থাকায় প্রণেতার নাম জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ ইয়েটস্ সাহেব প্রণীত। জ্ঞাতব্য বিষয় পুস্তকখানিতে যথেষ্টই আছে। পুস্তকখানিতে ১৮৩ পৃষ্ঠা। ভাষার নমুনা যথা—

"* * তিমি মৎস্য অতি বৃহৎ সে দীর্ঘতাতে প্রায় বাওয়ান্ন হস্ত ও উচ্চতাতে দ্বাদশ হস্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, আর তাহারা এমত বলবান্ যে পুচ্ছআস্ফালন দ্বারা অনায়াসে নৌকা উল্টাইয়া ফেলিতে পারে। তাহারা উত্তরদক্ষিণ কেন্দ্র সাগরের নিকটে বাস করে এবং পুচ্ছ দ্বারা জলেতে গমনাগমন করে। যে সময়ে তাহারা বেগেতে গমন করে তৎকালে স্রোতের ন্যায় জলের ধারা বহে তাহা দেখিয়া জাহাজি লোকেরা তাহাদের স্থান নিরূপণ করিতে পারে। আর তাহাদের মুখ অতি বৃহৎ বটে কিন্তু গলার ছিদ্র অতি সরু। আর মুখের উপরপাটীতে দন্ত নাই কিন্তু মাড়ীতে অতি কঠিন বৃহৎ অস্থি আছে সে অস্থি গজ দন্তের ন্যায় মূল্যবান হয়। আর যে সময়ে মুখব্যাদান করিয়া বেগেতে গমন করে তৎকালে অনেকানেক ক্ষুদ্র মৎস্য তাহাদের মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তাহাতে মুখসংকোচ করিয়া সে সমস্ত গিলিয়া ফেলে; এইরূপে তাহাদের আহার হয়। আর তাহারা ফুস্ফুসি দ্বারা বায়ুগ্রহণ করে এই জন্যে সতত জল মধ্যে ডুবিয়া থাকে না, প্রায় দণ্ডের মধ্যে দুইবার মুখ ভাষাইয়া উঠে। এবং সেই সময় উদরস্থ সমস্ত জল মস্তকের ছিদ্র দিয়া বহির্গত করিয়া ফেলে। কিন্তু তৎকালে কেহ যদি তাড়া দেয় তবে ঘোরতর ঝড়ের মত শব্দ করে" ইত্যাদি (৯৭ পৃষ্ঠা)। অন্যত্র—"কেহ কেহ অনুমান করে, যে মাকড়সা উড়িতে পারে তাহাতেই ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়।

এবং কেহ কেহ বলে মাকড়সা প্রথমে এক বৃক্ষের শাখার অগ্রে কিম্বা এক গৃহের প্রান্তে আপন সূত্র যোগ করে; পশ্চাৎ মুখ হইতে আরও অধিক সূত্র বাহির করিলে ঐ সূত্র ঝুলিতে ঝুলিতে যখন সেইদিগ হইতে বায়ু বহে তৎকালে উড়িয়া অন্য বৃক্ষ কি অন্য গৃহে লাগিলে আঠার দ্বারা বদ্ধ হয়। এমন হইলে মাকড়সা সেই স্থানে থাকিয়া ঐ সূত্র টানিয়া যদি বদ্ধ দেখে তবে পুলের ন্যায় তাহার উপর দিয়া গতায়াত করে আর কখন কখন বায়ুব্যতিরেকেও এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষের সূত্রের যোগ দৃষ্ট হইতেছে। এই নিমিত্তে কেহ কেহ অনুমান করে, মাকড়সা প্রথমে এক বৃক্ষাগ্রে সূত্র বদ্ধ করিয়া ঐ সূত্র যোগে বৃক্ষের মূল দিয়া নীচে নামে। পরে অন্য বৃক্ষের শাখাগ্রে উঠিয়া সেই সূত্র বদ্ধ করিয়া টান দিয়া সমান করে" ইত্যাদি (পৃষ্ঠা ১২৯)।

জন. ডি. পিয়ার্সন (১৭৯০—১৮৩১)—

জন ডি. পিয়ার্সন এই যুগের আর একজন সাহেব লেখক। ইহার রচিত অনেক পুস্তকের মধ্যে দুইখানি পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য: পত্র কৌমুদী ও নীতিকথা। পত্র কৌমুদীখানি স্কুল বুক সোসাইটী হইতে ১৮২০ সালে প্রকাশিত হয়; মূল্য ।০ আনা। গার্হস্থ্য বিষয়ের ও ব্যবসা বিষয়ের এবং অন্যান্য অনেক প্রচলিত বিষয়ের ২৬০ খানি পত্রের নমুনা এই পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত আছে। পুস্তকখানির রচনার নমুনা যথা: আর বালকেরা এস্তাহাম দিবার নিমিত্তে অতিশয় ব্যাগ্র হইয়া বেড়াইতেছে। * * * ইতিমধ্যে সাহেব ও মুছলমান ও বাঙ্গালি লোকেরা গাড়ী ও পালকিতে চড়িয়া আইলেন * * *"

পিয়ার্সনের অপর পুস্তক নীতিকথা or Moral Fables. এই

পুস্তকখানি স্কুল বুক সোসাইটী হইতে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়।

প্রাচীন মহিলা লেখিকা—

একটা কথার উল্লেখ এখানে বিশেষ দরকার বোধ হয়। এখনকার অনেক বিদুষী মহিলা দেখিয়া কেহ মনে করিবেন না যে ইহা বর্ত্তমান শিক্ষাবিস্তারের একটা মস্ত নিদর্শন। প্রাচীনকালের স্ত্রীলোকেরাও লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতেন। তখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যেও অনেক মহিলা লেখিকার নাম দেখিতে পাওয়া যায়; আমরা এ স্থলে কয়েকটী মাত্র মহিলা লেখিকার নাম উল্লেখ করিব: দীনেশবাবু লিখিয়াছেন আনন্দময়ীর রচনায় যেরূপ পারিপাট্য দেখা যায় "তাহাতে তাঁহাকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী মহিলাগণের অন্ততঃ সমকক্ষ গণ্য করিতে হইবে।" আনন্দময়ীর স্বামী অযোধ্যারামও সংস্কৃতে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

রাসসুন্দরী (১৮১০)—

আর একটী মহিলা লেখিকার নাম উল্লেখযোগ্য: ইঁহার নাম রাসসুন্দরী; ইনি হাইকোর্টের তদানীন্তন উকীল বাবু কিশোরীলাল সরকারের মাতা। "ইঁহার স্বরচিত জীবন চরিত "আমার জীবন" প্রাচীনকালের সরল গদ্য রচনার আদর্শস্বরূপ। এরূপ অনাড়ম্বর সহজ সুন্দর ভাষা প্রাচীন রমণীরা লিখিতে পারেন, ইহা আমাদের পূর্ব্বতন স্ত্রী শিক্ষার গৌরব প্রদর্শন করিতেছে।" রচনাকাল ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে; ভাষার নমুনা যথা—"একদিবস আমার সঙ্গিনী একটী বালিকা আমাকে গোপনে বলিল তোমার মায়ের কাছে গিয়া জলপান চাহিয়া আন আমরা দুইজনে গঙ্গাস্নানে যাই। শুনিয়া আমি ভারী

আহ্লাদিত হইয়া মায়ের নিকট গিয়া বলিলাম মা আমি গঙ্গাস্নানে যাইব। মা হাসিয়া বলিলেন গঙ্গাস্নানে যাইবে কি চাও। আমি বলিলাম একটা বোচ্‌কা চাই। গঙ্গাস্নানের অর্থ আমি বিশেষ কিছুই জানি না এইমাত্র জানি পথে বসিয়া জলপান খায় আর কাপড়ে একটা বোচ্‌কা বাঁধিয়া মাথায় করিয়া পথে হাঁটিয়া যায়। আমার মা আমার ঐ সকল অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া একখানি কাপড়ে কিছু জলপান দুটী আম বাঁধিয়া একটী পুটলী করিয়া আমাকে আনিয়া দিলেন।"

এই স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা' নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডে (৭—৮ পৃষ্ঠায়) যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। ইহা হইতে স্ত্রী শিক্ষার সম্বন্ধে তখনকার সংবাদপত্রে কি লিখিত হইয়াছিল, বা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এতদ্দেশীয়গণের তখনকার মতামত কি ছিল—তৎসম্বন্ধে কতকটা জানিতে পারা তো যায়ই; বরং অধিকন্তু তৎকালীন সংবাদ পত্রাদিতে প্রচলিত রচনাদিরও কতকটা নমুনা পাওয়া যায়:—

[তারিখ ৬—৪—১৮২২] "স্ত্রীশিক্ষা॥—এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যা বিধায়ক এক গ্রন্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রমাণ সহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহার কিঞ্চিত দেওয়া হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণেরা ইদানী বিদ্যাভ্যাস করেন না কিন্তু বিদ্যাভ্যাস করণে দোষ লেশও নাই। যদ্যপি শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক দোষ থাকিত তবে পূর্ব্বতন সাধ্বী স্ত্রীগণেরা বিদ্যাশিক্ষাতে অবশ্য পরাঙ্মুখ হইতেন। তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ী অনসূয়া দ্রৌপদী রুক্মিণী চিত্রলেখা লীলাবতী কর্ণাটরাজস্ত্রী লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী ও খনা ইত্যাদি পূর্ব্বতন স্ত্রী সকল অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তত্তৎশাস্ত্রের পারদর্শিতরূপে বিখ্যাত

ছিলেন এবং ইদানীন্তন মহারাণী ভবানী হটী বিদ্যালঙ্কার শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী এঁহারা লেখাপড়া ও নানা শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে অতিতৎপরা হইয়া অতিসুখ্যাতি প্রাপ্তা হইয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষাতে তাহারদিগের কোন অংশে মানক্রুটি কিম্বা অপযশ হয় নাই বরং যশোবৃদ্ধি হইয়াছে।

এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে স্পষ্ট লিখিয়াছেন অনেকের বোধের অগম্য যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা মৈত্রেয়ী চরিতার্থা হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি অদ্যাপি আছে এবং ব্রহ্মার পুত্র অত্রি তাঁহার স্ত্রী অনসূয়া অশেষ শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিদ্যাবতী হইয়া অন্যকে শাস্ত্রোপদেশ করিয়াছিলেন এবং দ্রুপদ রাজকন্যা পাণ্ডবপত্নীর পাণ্ডিত্য লিপিবাহুল্য। এবং রুক্মিণী পত্র লিখিয়া সুদাম ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। এবং চিত্রলেখার শাস্ত্রদৃষ্টি ও শিল্পবিদ্যা ঐ শ্রীমদ্ভাগবতে উষাহরণ প্রকরণে স্পষ্ট লিখিয়াছেন এবং উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী এমত পণ্ডিতা ছিলেন যে তাঁহার স্বামীর সহিত শঙ্করাচার্য্য যৎকালে বিচার করিলেন তখন ঐ লীলাবতী উভয়ের মধ্যস্থা ছিলেন এবং তাঁহার রচিত অনেক অনেক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। এবং সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থকর্ত্তা ভাস্করাচার্য্যের কন্যা দ্বিতীয় লীলাবতী অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার তুল্য ছিল না। এবং কর্ণাট দেশের রাজরাণী এমত পণ্ডিতা ছিলেন যে কালিদাস প্রভৃতির কবিতা তুচ্ছ করিয়াছেন। এবং লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী যে যে কবিতা রচনা করিয়াছেন পণ্ডিতেরা সে সকল প্রসঙ্গ করিয়া জ্ঞানীর নিকট প্রতিপন্ন হইতেছেন। এবং পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে লিখিত আছে যে তালধ্বজ পুরীতে বিক্রম নামক রাজার পুত্র মাধব যখন সুলোচনাকে বিবাহ করিতে দীব্যাস্তি নগরে গিয়া

সুলোচনাকে পত্র লিখিয়াছিলেন তখন ঐ সুলোচনা পত্র পাঠ করিয়া সদুত্তর লিখিয়াছিলেন। এবং বীরসিংহ রাজার কন্যা বিদ্যা ব্যাকরণাদি নানা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ও রাজসাহীর রাজা মহারাজ রামকান্ত রায়ের স্ত্রী মহারাণী ভবানী বিদ্যাভাস দ্বারা চিরকাল রাজ্যশাসন করিয়াছেন কাশীতে তাঁহার অন্নপূর্ণা খ্যাতি আছে অদ্যাপি প্রাতঃকালে উঠিয়া লোকেরা তাঁহার নাম স্মরণ করে। এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার নামে খ্যাতা হইয়া বৃদ্ধাবস্থাতে কাশীতে অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং সেখানে তাঁহার সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ হইত। এবং কোটালীপাড়া গ্রামে শ্যামাসুন্দরী নামে এক ব্রাহ্মণী ব্যাকরণাদি ন্যায় পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন।"

পুনশ্চ [তারিখ ১৩—৪—১৮২২] "স্ত্রীশিক্ষার শেষ—স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক বিষয়ের অবশিষ্ট যে ছিল তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইদানীন্তন বিদ্যাবতী অনেক স্থানে অনেক স্ত্রী আছেন এই কলিকাতা মহানগরের মধ্যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের অনেক স্ত্রী প্রায় লেখাপড়া জানেন। এবং বীরনগরের শরণসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের দুই কন্যা বার্ত্তাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ব্যুৎপন্না হইয়াছিলেন ইহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। এবং মালতীমাধব নাটকগ্রন্থে অতি সুস্পষ্ট লিখিত আছে যে মালতী চতুষ্পাটীতে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাবতী হইয়াছিলেন। এবং কর্ণাট দ্রাবিড় মহারাষ্ট্র তৈলঙ্গ ইত্যাদি দেশে অনেক বিদ্যাবতী অদ্যাপি আছেন কেহবা স্বয়ং রাজকার্য্য করিতেছেন এবং সংস্কৃত বাক্য অনেকে কহেন এমত অনেক স্ত্রী কাশীতে আছেন। এবং অহল্যাবাই নামে একজন পুণ্যবতী

ছিলেন তাঁহার কীর্ত্তি কাশীতে ও গয়াতে অদ্যাপি দীপ্তিমতী আছে তিনি তাবৎ রাজকার্য্য স্বয়ং করিতেন ও সংস্কৃত বাক্য অনর্গল কহিতেন এখনও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে ইংগ্লণ্ডীয় স্ত্রীগণের আনুকূল্যে কন্যারদিগের পাঠার্থে যে পাঠশালা হইয়াছে তাহাতে বালিকারা শিক্ষা করিতেছে তাহার মধ্যে কেহ এক বৎসর কেহ দেড় বৎসরে লিখাপড়া শিখিয়াছে তাহারা যে ভাষা পুস্তক কখন দেখে নাই তাহা অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। ইহাতে বোধ হয় যে স্ত্রীলোক যদি বিদ্যাভাস করে তবে অতিশীঘ্র জ্ঞানাপন্না হইতে পারে। অতএব যেমত গৃহ-কর্ম্মাদি শিক্ষা করান সে মত বালককালে বিদ্যাশিক্ষা করান উচিত। যেহেতুক স্ত্রীলোকেরা অবীরা হইলেও বার্ত্তাবিদ্যা দ্বারা আপন ধন রক্ষা করিয়া কাল যাপন করিতে পারে অন্যের অধীন হইতে হয় না এবং অন্যে প্রতারণা করিতে পারে না। আরও আপন মনোভিলষিত স্বামির নিকটে লিখিতে পারে। স্ত্রীলোকের পূর্ব্বাপর সিদ্ধ ব্যবহার কর্ম্ম যে আছে তাহা তাহারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সে এই যে বাল্যকালে পিতা মাতার বশীভূতা হইয়া আজ্ঞানুসারে চলিবে। যৌবনাবস্থাতে স্বামির বশীভূতা থাকিয়া তাঁহার সেবা ও শ্বশুরাদির সেবা ও গৃহের রক্ষণাবেক্ষণাদি করিবে। বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্রের বশীভূতা থাকিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানাদি করিবেক। অতএব স্ত্রীলোক কখনও স্বতন্ত্র থাকিতে যোগ্য নহে। পিতা রক্ষতি কৌমারে ইত্যাদি।

অনেক শাস্ত্রে লিখিত আছে স্ত্রীলোকের অকর্ত্তব্য এই এই দুষ্ট বুদ্ধিতে অন্য পুরুষাবলোকন ও সহবাস ও যাত্রোৎসবে গমন ও একাকিনী গমন ও ব্যভিচারিণীর সংসর্গ। এ সকল কর্ম্ম স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশের কারণ হয়। যে স্ত্রী গৃহকর্ম্মে নিপুণা ও পতিপ্রিয়া ও

প্রিয়াভাষিণী ও অপ্রগল্‌ভা ও লজ্জিতা ও পতিপরায়ণা ও ধর্ম্মশীলা সে স্ত্রী ইহকালে পরকালে অপার সুখভাগিনী হয়।"

শতবর্ষাধিক পূর্ব্বেকার সংবাদ পত্রে যে পুস্তকখানি পূর্ব্বোক্তরূপে অনুশীলিত হইয়াছে সেখানির নাম 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক'; পুস্তকখানি দুইভাগে বিভক্ত: প্রথমভাগ--দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন; দ্বিতীয় ভাগ—স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রমাণ; উহার লেখক—কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার; উহা ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বোক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু পাদটীকায় বলিয়াছেন তাঁহার কাছে ঐ পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণের একখণ্ড আছে।

লঙ্‌ সাহেবের সুবিখ্যাত ক্যাটালগে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গৌরমোহন দে কর্ত্তৃক বিরচিত "স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক" নামক যে পুস্তকের উল্লেখ দেখা যায়—সম্ভবতঃ ইহা সেই পুস্তক। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে "স্ত্রী দুরাচার" নামে উহার প্রতিবাদ পুস্তকও প্রকাশিত হয়।

বৃন্দাবন পরিক্রমা (১৮১১)—

দীনেশবাবু তাঁহার বঙ্গসাহিত্য পরিচয় নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে ১৬৭৪ পৃষ্ঠায় সন ১২১৮ সালের একখানি পুঁথি হইতে—'বৃন্দাবন পরিক্রমা' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার ভাষার নমুনা যথা—"দক্ষিণে হরিদ্বার বৈরাগ-গঙ্গা তাহার দক্ষিণে গোরুও কুণ্ড তাহার পশ্চিম ব্রহ্মকুণ্ড তাহার দক্ষিণ সূর্য্যকুণ্ড তাহার দক্ষিণ গ্রাম মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের রত্ন সিংহাসন হিন্দোলা অক্ষয়বট ৮৪ চৌরাশী খাম্বা এক ঘেরার মধ্যে আর ব্যাসদেবের সহ স্থির লিখন আছে পাষাণে তাহার নিকট শ্রীগোপীনাথ জীএর সেবা তাহার মধ্যে

দক্ষিণ গ্রাম মধ্যে গোবিন্দজীএর সেবা শ্রীমন্দিরে একদিনে শ্রীবৃন্দাদেবী আর একদিনে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ বাস মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্রঠাকুর বিরাজমান তাহার সৌভাগ্য বাক্য-অগোচর শ্রীবৃষভানুপুরের বায়ব্য কোণে পাহাড়ের উপর * * * পেছলা খেলা তাহাতে যাবকে চিহ্ন আছে তাহার পূর্ব্ব একক্রোশ বৃষভানুপুরের ঈশান কোণে প্রেম-সরোবর তাহার চৌদিগে কেলি কদম্বের বন” ইত্যাদি। উপরিস্থ উদ্ধৃতাংশ হইতে তখনকার বচন-বিন্যাস রচনাপদ্ধতি শিল্পচাতুর্য্যপ্রভৃতির কতকটা জানিতে পারা যায়।

এই বৃন্দাবন পরিক্রমা সুপবিত্র বৃন্দাবন ভূমির ভক্তিভাবাত্মক বর্ণনা। এইরূপ 'পরিক্রমা' তখনকার বঙ্গভাষায় আরও দৃষ্ট হয়, যথা মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের কাশী পরিক্রমা, নবদ্বীপ পরিক্রমা ও নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা ইত্যাদি; তবে সেগুলি পদ্যে। এই বৃন্দাবন পরিক্রমা হইতে আরও কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল: “তাহার অগ্নিকোণে রাসস্থল কিশোরীবট সেই স্থানে গুপ্তস্থল জাবট গ্রামের পশ্চিম কোকিল-বনকোকিলের কুলি হইতেছে শ্রীমতী শুনিয়াছিলেন সেই স্থানে এক কুণ্ড তাহাতে কেলিকদম্বের গাছ বেষ্টিত আছে তাহা হইতে দুই ক্রোশ চরণ পাহাড়ী তাহার উপর শ্রীবলরামজীএর চরণ চিহ্ন ১ হাত প্রস্থ অষ্ট অঙ্গুলি শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন তিনপোয়া প্রস্থ সাত অঙ্গুলি ঐ পাহাড়েতে গোধনের পাঁজ আর মোষের পাঁজ আর উটের পাঁজ সেই পাহাড়েতে দুই ভাই মুরলীধ্বনি করিয়াছিলেন পাহাড়ে হাঁটুগাড়া চিহ্ন আছে তাহার পশ্চিম সাতঘর্য্য খেলার চিহ্ন আছে তাহার পশ্চিম চরণগঙ্গা তাহার দক্ষিণ অর্দ্ধক্রোশ বড় বেটন গ্রাম তাহাতে সেবা শ্রীমুরলীধর ঠাকুর জীউ।”

বৃন্দাবন লীলা—

পবিত্র শ্রীবৃন্দাবনধামে যে সব বিবিধ বন, মন্দির প্রভৃতি আছে, এ পুস্তকখানিতে কোন বিশিষ্ট ভক্ত প্রবর সেইগুলির ভক্তিরসচ্ছুরিত নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। বেশ রীতিমত পরিষ্কার বাঙ্গালা গদ্য এই পুস্তকখানিতে প্রথম দেখিতে পাই, ইহার ভাষা সম্বন্ধে সুশীলবাবু বলিয়াছেন—

"This is the first attempt at sustained prose writing—the widening and varying of the range and methods of prose by its application to new subjects—pure narration, description or conveyance of information in an intelligible way." তাঁহার মতে "ease and fluency was attained here for the first time." ইহার ভাষার নমুনাও কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইল: "স্রীস্রাবৃন্দালিলা কিঞ্চিত লিক্ষতে। আদৌ স্রীস্রীবৃন্দাবন তাঁহার মধ্যে স্রীস্রীগোবিন্দজীর মন্দির তাহার উত্তরে শ্রীশ্রীগোপিনাথ জীর মন্দির তাহার পশ্চিমে কিছু দুর হয় মদনমোহন-জীর মন্দির শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিম দিগে কালিদহ সপ্তকেলি কদম্ব তাহার উত্তরে কালিদহর উত্তর কিনারে শূর্য্যঘাট তাহার উত্তরে জুগলঘাট তাহার পুর্ব্বে ধির সমির তাহার পুর্ব্বে চিরঘাট বিনাম চ যেন ঘাট কেহ কেহ গোবিন্দ ঘাট কহেন তাহার পুর্ব্বে কেশীঘাট তাহার পূর্ব্বে বংশীবট তাহার পুর্ব্বে পুলিবন তাহার পুর্ব্বে বিরক্তমণ্ডল তাহার দক্ষিনে কিছু দুর হয় জমুনাজীর পশ্চিমধারে ভোজন-ঠিলা যেখানে জজ্ঞপত্নির স্থানে অন্ন মাগিয়া খাইয়াছিলেন তাহার পশ্চিমে দাবানল তাহার পশ্চিমে পুনশ্চ কালিদহের দক্ষিণ কিনারা শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে

শ্রীশ্রীগোবিন্দ গোপিনাথ মদনমোহন মদনগোপাল বঙ্ক •বেহারী অটলবেহারী চিববেহারি বৎসবেহারি লালবেহারি রাশবেহারি কুঞ্জবেহারি বেহারিজি রাধাবল্লভ রাধাদামোদর রাধামাধব রাধাকান্ত রাধাকৃষ্ণ রাধামোহন রাধারমন জুগলকিশোর কিশোরকিশোরি চকরচকোরি স্যামাস্যাম শ্যামসুন্দর কালিমর্দ্দন * * * এবং অনেক অনেক বিগ্রহ আছেন অসংক্ষী সংক্ষা কে করিবেক প্রতি ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে সেবা অসংক্ষ আছেন * * * ”

বৃন্দাবন পরিক্রমা ও বৃন্দাবনলীলা এই দুই পুস্তকে পূর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতর ও জটিল পদবিন্যাস প্রথম দেখিতে পাই। এইরূপে ক্রম-বিকাশের ধারা একটু অভিনিবেশ সহকারে অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই—ক্রিয়াবিহীন তিনচারিটী শব্দযুক্ত সূত্রাকারে রচিত বাক্য-বিন্যাস হইতে ক্রমে প্রশ্নোত্তরাকারে রচিত সরল নীতি মূলক জ্ঞানগর্ভ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বাক্য বাঙ্গালা গদ্যে রচিত হইতে লাগিল। তারপর দেখিতে পাই বিধিব্যবস্থা, দর্শন, ভৈষজ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ক প্রবন্ধই বাঙ্গালা গদ্যে রচিত হইতে লাগিল। বাক্যও দীর্ঘ সমাস সম্বলিত হইতে লাগিল; বাক্যে অলঙ্কারচ্ছটাও ক্রমে বাড়িতে লাগিল। এমন কি, অতঃপর মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া কিছু কালের জন্য বাঙ্গালা গদ্য সংস্কৃতমূলক দুরূহ শব্দ জালে দুর্ব্বহ সমাস বেষ্টনীতে এবং দুর্ব্বোধ্য অলঙ্কার ভারে নিতান্ত আড়ষ্ট হইয়া থাকিল। এই আড়ষ্টভাব কতকপরিমাণে মোচন করেন ডাক্তার উইলিয়ম কেরী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ, আর কতকটা মোচন করেন প্রমথনাথ শর্ম্মা ও টেকচাঁদ ঠাকুর। পরে আরও বিস্তৃতভাবে এ বিষয়ে অনুশীলন করিব।

ইংরেজ যুগে হাতে লেখা পুথির অনাদর—

ইংরেজের হাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের যেমন প্রভূত উপকার ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তেমনি পরোক্ষভাবে কিঞ্চিদ্ অপকারও ঘটিয়াছে; যখন আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলন ছিল না—তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, ছাত্রেরা, চিকিৎসকেরা সকলেই হাতে লেখা পুথির সাহায্যেই জ্ঞানার্জ্জন করিতেন। পুথির তখন বড় আদর ছিল। কত বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক তখন পুথি লেখার ব্যবসায়ে জীবন ধারণ করিতেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যেমন বিদ্যাবুদ্ধি কম হইলেও 'টাইপরাইটিং' জানা থাকিলেই চাকুরি লাভ সুলভ ছিল, তখনকার দিনে মূর্খ লোকেরাও হাতের লেখা ভাল থাকিলে শুধু পুথি লেখা দ্বারা যথেষ্ট দু'পয়সা রোজগার করিতে পারিত। এইরূপে একই পুস্তকের অসংখ্য নকল দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িত। কিন্তু ছাপা পুস্তক প্রচলন হওয়া অবধি দেশে পুথির আদর কমিয়া গেল। বহু দিনের যত্ন-সঞ্চিত পুথি-স্তূপের মধ্যে পূর্ব্বপুরুষগণ যে কি অমূল্য সদ্‌গ্রন্থরাজি ও শাস্ত্রসম্পদ্ সযত্নে সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা খুলিয়া দেখিবারও স্পৃহা ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। তখনকার পুথিতে যেমন পাচালী, মঙ্গল, লীলামৃত, চৌতিশা, বারমাস্যা প্রভৃতি নামে পদ্যময় গ্রন্থ সকল বহু যত্নে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত হইত, মুদ্রাযন্ত্র প্রচলন হওয়াতে তাহার স্থলে নবীন গদ্যময় গ্রন্থের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই প্রকারে অনাদৃত হইয়া প্রাচীন অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য পুথি সকল কালপ্রভাবে, জল হাওয়ায় ও কীট কবলে ক্রমশঃ ধ্বংস পাইতে লাগিল।

পরিষৎ-প্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—

বর্ত্তমান যুগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রচেষ্টায় অনেক বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির লুপ্তোদ্ধার সংসাধিত হইয়াছে। উক্ত পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' নামক পুস্তকে অনেক পুরাতন বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থেরও নামোল্লেখ দেখা যায়; সে গুলি ঠিক সন তারিখের অনুক্রমে সাজান নয়; এবং অধিকাংশ স্থলে সেগুলির তারিখ জানাও নাই; তবে এই যুগ হইতেই পুথির আদর কমিতে থাকে এবং পরিশেষে পুথি লেখা বন্ধ হইয়া যায়। উক্ত পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পুথি হইতে যে সকল বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সেই গুলির বিষয় সংক্ষেপে এইখানে একটু আলোচনা করিব:—

বিরস পাঞ্চালী—ভ্রমর পদ্মিনা (১৮৫৩)

বিরস পাঞ্চালী—ভ্রমর পদ্মিনী: এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই; প্রণেতার নাম পাওয়া যায় নাই; হস্তলিপির তারিখ আধুনিক—১২১৫ মঘী। ভাষা গদ্য পদ্য মিশানো; রচনার নমুনা যথা— "আরম্ভ:—

হেম ঋতু যত দিন ছিলো, ততদিন ভ্রমর কেতকী ইত্যাদি নানা ফুলের মধু খাইতো। পরে বসন্ত ঋতু আইসে উপস্থিত হওয়াতে পূর্ব্বাকার আহ্লাদে পদ্মিনীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাতে অনেক দিনের পর ভ্রমর আইসাতে পদ্মিনীর মনেতে পরিচিহ্ন হইয়া ভ্রমরকে কি বলেছে তাহা শুন:—

শুন শুন ভ্রমরা বন্ধু, খাইয়া কেতকীর মধু,
রঙ্গে ভঙ্গে কৈরে ফের ছলা।

সাধে বোলে বার যাইতে, সাধে এ বেড়াস্ পথে পথে,
পদ্মিনী হইয়াছে এখন হেলা ॥
তাইতে তোরে যাইতে বলি, শুনরে কমলের অলি,
প্রেমের কথা ছাফা নাহি রহে (রএ)
এখন হইয়া কেতকিনীর বশ, সদাএ করস্ রঙ্গরস,
দেখন তোর ঐ চিহ্ন আছে গাএ ॥" ইত্যাদি

মন্ত্রাদির পুঁথি—ইহার কোন নাম নাই ; পুস্তকে সর্পাদিদংশনের ঝাড়া ও ঔষধ এবং অপরাপর কতকগুলি রোগের ঔষধ ও ঝাড়ন মন্ত্রাদি লিখিত আছে।

রচনার নমুনা—"আরম্ভ :—শ্রীদুর্গা জয়। গণেশায় নমঃ মহাদেবায় নম। রাজমোহানি মন্ত্র অমৃতপরা। * * সাপের মন্ত্র। * * শিতালার মন্ত্র। * * *" ইত্যাদি সাপের ঔষধ :—"তিন বৎসিআ (?) মরিছ গাছের শিকড়।"

গায়েতে রাখিলে সর্পের ভয় নাই।
ছোট জাতি আইস্বর মুল খাবাইলে বিষ্ণ জায়ে
সোনালী রূপালী দুই সর্পের ঔষধ জানিবা।

কুক্কুর দংশনের ঔষধ :—রাঙ্গা জাতিয়া বিষকাটালীর আগা ও সমুদ্রের ফেনা বাটি খাওয়াইবেন।

সামুদ্রিক গ্রন্থ (১৮৩৭)—সন তারিখ জানা নাই। ১৮৩৭ ইংরেজীতে বাঙ্গালা গদ্য কিরূপ ছিল, নিম্নোদ্ধৃত 'অনুষ্ঠান পত্র' হইতে তাহার সুন্দর আভাস পাওয়া যাইবে। "যেহেওক ইংরেজি বিদ্যাভ্যাস বিসয়ে এতদ্দেসিয় প্রজাসমুহের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের নিতান্ত অনুরাগ ও আকিঞ্চন য়াছে এবং যেহেতুক ঐ বিদ্যোপার্জ্জন অত্যন্ত ফলোদয়

এবং নিঃসন্দেহরূপে বিশেষ প্রত্যুপকার সম্ভাবনা অতএব এখানকার শ্রীযুক্ত জজ ও মেজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের নিতান্ত বাসনা ও স্পৃহা হইয়াছে জে এতদ্দেসিয় ব্যক্তিদিগের ইংরেজি বিদ্যোপদেশ জন্য এস্থানে এক স্কুল অর্থাত চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত এবং তাহা এতদ্দেসিয় সিষ্ট বিসিষ্ট মহাশয়েরদিগের স্বেচ্ছাধীন আপাতত্ আনুকুল্যতা ও অতঃপর মাসিক দানসৌণ্ডতা দ্বারায় সুসম্পন্ন হয় কিন্তু এতদ্বিধায় এক্ষণে অধিক প্রয়াস ও অন্যান্য প্রজাত্মব আদৌ ইহার অনুসন্ধান অত্যাবশ্যক যে এই উপস্থিত কল্পনা বিসয়ে মহাশয়েরদিগের স্বেচ্ছানুরূপ আনুকুল্যের দ্বারায় কি পর্য্যন্ত সাহায্যতা হইবার সম্ভাবনা ও তাহা নিশ্চয়রূপে সুজ্ঞাত হইলে অর্থাৎ প্রাথমিক ও মাসিক দাতব্য মুদ্রা সঞ্চয়ের নির্দ্দিষ্টতা জানিতে পারিলে অনেক স্কুল মাষ্টার অর্থাত শিক্ষা-গুরু ও পুস্তক এবং অন্যান্য প্রওজনিয় বিষয়োপার্জ্জনের সদুপায়ে প্রবর্ত্ত হওয়া জাইবেক এক্ষণে এই অনুষ্ঠান পত্র কেবল এস্থান নিবাসী ইওরোপিয় অর্থাৎ সাহেব লোক ও এদ্দেসিয় মহাশয়েরদিগের সুবিদিত এবং তাহাতে তাঁহারদিগের বাস্তবিক কি অভিপ্রায় ইহার নিশ্চিত অবগত জন্য উল্লেখিত হইল। ইতি তাং মাঘ ১২৪৩ বাং মোং ত্রিপুরা।"

বৈদ্যক গ্রন্থ (১৮১৯)—ইহাতে কবিরাজী, মুষ্টিযোগ ও 'মধা' শাস্ত্রমত ঔষধ লিখিত আছে। ইহার সঙ্কলয়িতা বোধ হয়, পটীয়া—থান মোহনাবাসী ৺বৈদ্যনাথ ঠাকুর। সন ১২২৬ বাঙ্গালার হস্তলিপি। নিম্নে একটি রোগের ঔষধ ও ব্যবস্থা দেখান হইল:

৩ দফে জরমাংতাইর ঝোলা আগা পাছা নামাইলে তাহার প্রওগ।

পীপই	১
গোলমরিচ	১

কাচা হলদ্রা	১
লেম্বুর রস	১
ষুট	১
লাটাগুলা	১
দারুহরিদ্রা	১

'এহারে বাটী গুলি বানাই কাচা জল অনুপমে খাইবো পুন একগুলি জল করি চক্ষুতে দিলে বিশ ছাড়িবো অষুদের পরীক্ষা এই অষুদে চক্ষুর জল স্রবিব জদি না স্রবে তবে সে লোক না বাচিবো।' অনেক বড় বড় রোগের এইরূপ সুলভ চিকিৎসা আছে।

বালক বোধ শ্লোক—ক্ষুদ্র সন্দর্ভ ; গদ্যপদ্যে রচিত ; নমুনা—

"আরম্ভ ঃ—তোঙ্কার নাম কি। আমার নাম শ্রীঅমুক অমুক দাস। নাম বোলি কারে। বস্তুবাচবিয় নামানি। জিজ্ঞাসা বোলি কারে— জ্ঞাতো মৈৎছ জিজ্ঞাসা।

ব্রহ্মার সৃজন সৃষ্টি চরাচর জথা।
মায়ে বাপে নাম থুইছে শ্রী পাইলা কথা॥
ব্রহ্মার সৃজন সৃষ্টি বিষ্ণুর পালন।
লক্ষ্মই (লক্ষ্মী) দেবি দিছেন শ্রী জিজ্ঞাস কি কারণ॥"

১২১৫ মঘীর হস্তলিপি [বাঙ্গালা ১২৬০ সালের ?]

ক্লীবত্ব মোচন—ইহা চট্টগ্রামের পারস্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'তওয়ারিখি হামিদী' প্রণেতা মৌলবি অগ্রগণ্য ৺হামিদুল্লাখান বাহাদুরের রচিত ; শ্মশ্রু ছেদনকারী মুসলমানদিগকে শ্লেষ করিয়া গদ্যে পদ্যে তিনি ইহা লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি ১২৭৭ সালে মুদ্রিত। আবরণ পত্রে লিখিত আছে—

"শ্রীশ্রীপরমেশ্বর।

এই পুস্তকের নাম ক্লিব ও (ক্লিবত্ত ?) মোহ্না অর্থাৎ নপুংসকও (?) বিনাসন। তাহাতে পড়ামুখ নপুংসক বানরের ন্যায় স্ত্রিলোকের নিন্দা আর দাড়ি ও কেষ লেষ ইত্যাদি রাখন ও কাটনের নিম্নয় আর তাহার হেতু ও মর্ম্ম ও সার কথা। এবং তাহাতে সস্ত্রের অর্থাত সবার আদেশ ও তাহার প্রশংসা আর নিসেধ ও নিসেধিয় কাজ্যের নিন্দা ইতি। চাটিগ্রামের প্রধান রইছ শ্রীযুত মোহাম্মদ হামিদোল্লাহ্ খান বাহাদুর ছাহেব ছ্লামাবাদির কৃত লোকের উপকারার্থে প্রাণপোনে শ্রেমেতে বিশেষরূপে করিয়া * * * ছাপা হইল।"

আরম্ভ :—"হিজড়ার ন্যায় লোকর্দ্দেশের গতি। আমি তাহার পোনর প্রকার দোস লিখিতেছি। মহামহিম মহাসয়েরা মনজোগ করিবেন।

ওহে ভাই যদি তুমি আপনাকে না মর্দ্দ খোজার ন্যায় বনাইতে চাহ তবে দাঁড়িকাট কেননা খোজা ও নামর্দ্দের দাড়ি হয়ে না।" ইত্যাদি কিঞ্চিৎপরে 'পদবন্দি'; নমুনা এই :—

শুন ভাই নিদাঁড়িয়া লোকদ্দের গত।
মুখতার লোমহিন বানরের মত॥
হিজরার ন্যায় কিবা শ্রদ্ধা তার মনে।
ঘসিতে অন্যের সঙ্গে বদনে বদনে॥" ইত্যাদি

সপ্তবারের কিতাব—ইহা এক প্রকার-মূর্খলোক-ভুলানো জ্যোতিষ গ্রন্থ। কোন রোগী আসিয়া যদি রোগের কারণ-জিজ্ঞাসু হয়, তবে তাহাকে নিম্নাঙ্কিত চিত্র-মধ্যস্থ যে কোন একটি 'ঘর' বাছিয়া ধরিতে বলা হয়।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

চিত্রমধ্যস্থ সংখ্যাগুলি যথাক্রমে রবি, সোম প্রভৃতি সপ্তবার নির্দ্দেশক

উহার ১ম ঘরের (রবিবারের) ফলাফল যথা :—

"রবির খেণেতে যদি কোন জনে রোগির জন্য জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহারে জিজ্ঞাসা করিব, তুমি বারি (বাড়ী) থাকি আসি মন কিছু বেজার হইআছে, রাস্তাতে কোন জন্নার (জানোয়ার) দেখিআছ, দুইজন লোক এক জাগাতে বসিআছে তাহা দেখিয়াছ, রাস্তাদি আসি লোকের লাগৎ পাইআছ, এইমত এই রকম জদি রুজু বলে, তবে হারিয়া (নৈঋত) কোনেতে থাকি যুঙ্গ (?) দেবতার দিষ্টি হইয়াছে, তাহার ডালি পিঠালি দিয়া মনিস্যের মুক্তি বানাইব, ভাত তরকারি উপহার জেই মিলে দিব। রাজা (ঈশান) কোণেতে বারাইব তবে আরাম ৬ ছও দিনে হইবেক।"

কবিরাজী পুঁথি : তারিখাদি জানা নাই ;

আরম্ভ :—"নম গণেসায়। অথ প্রেমেহুর অউসদ। হলদ্রার ছরা ১ তোলা করি (কড়ি)? পোরা কাকি ১ এক তোলা। এই দুই পদ বাটিআ বাণ্ডা (ঠাণ্ডা?) জলে * * করি খাইলে। তবে প্রেমেহু ধাউ ভাল হবে।" শেষ :—পুনশ্চ লোকের চৈখেতে খারিস্থে ধরে চৈউক পেচুরাএ তাহার ঔসদ। সাদা তামাকুর বচুর (?) রস সত্ একপদ দুই পদ একত্র সীলে ঘসী রস লইয়া বিকালে যুইতে চৌক্ষুতে দিলে থোরা জলী (জ্বলি) উঠে তবে খাবিস্থা ভালা হএ।"

অজ্ঞাত পুথি :—"জীবের জর্ম্ম কিসে। পিতৃবির্জ্জে মাতৃরজে। গঠন পঞ্চবিংশতি তত্বে। ২৫। স্থিতি পঞ্চভূত আর বেদ য়োয়াশক্তি?

হৃত (কৃত বা যুত ?)। পিতার চাইর ৪ মাতার চাইর ৪। মাংস অস্থি মার্জ্জ (?) শুক্র ৪ রোম চর্ম্ম রক্ত মেদ ৪ পৃথিবী ১ অব ২ তেজ ৩ বায়ু ৪ আকাস ৫ পৃথিবীর গন্ধগুন শুভ্রবর্ণ নাসিকাতে স্থিতি। তার প্রতিক্ষ্য (?) গুন পঞ্চ ৫ 'অস্থি মাংসনখঞ্চৈ রোমং ত্বজঞ্চ পঞ্চমং' পৃথিবী পঞ্চগুন প্রোক্তো ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে।১। অপগুণ গৌরবর্ণ জিহ্বাতে স্থিতি। তার প্রতিক্ষ্য পঞ্চগুণ শুক্র স্থনিত মার্জাঞ্চ মলমূত্রঞ্চ পঞ্চমং অপ পঞ্চ।" ইতি রচয়িতার নাম জানা নাই।

সীতারাম সম্মিলন :—ইহা একখানি নাটক। সীতা উদ্ধারের পর অগ্নি-পরীক্ষান্তে রামের সহিত সীতার সম্মিলন বৃত্তান্ত ইহার প্রতিপাদ্য। ইহার রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়। ইহার ভাষা গদ্যপদ্য দুইই। গদ্যের নমুনা—"সীতাদেবী। প্রাণ সই কি করি এ অসিম দুঃখ আর সহ্য করিতে পাচ্ছি না, হৃদয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তত্রাচ আমি তোমার বাক্যের অধিন, কেবল মাত্র তোমার স্নেহময় বাক্যে এতদিন জীবন ধারণ করেছি, এখনও তুমি যাই বল তাই কর্ত্তব্য।" ইত্যাদি।

ভদী বিদ্যানিধির সং :—ইহাও ষষ্ঠীচরণ মজুমদারের রচনা; ইহা একখানি বিদ্রূপাত্মক প্রহসন; ভণ্ডামির মস্তকচর্ব্বনার্থ লিখিত; নমুনা—

"আরম্ভ :—ভদী বিদ্যানিধির সঙ্গ।

চাউল কাচকলা থোর কচু পেয়ারা ইত্যাদি দ্রব্য এক বোতল কিত্রিম সরাব একত্রে এক গাঠুরিতে বান্ধিয়া কান্ধে কর্য্যে (প্ররভু হরি কিঁঞ্চ কিঁঞ্চ মোরে খিঁচে টেনে নেও নেও আমার তানির সঙ্গি কর কর পেটটা, পরাণটা পুরুছে হে হে হায় এতখানি মিষ্টি সামিগ্রি জজমান বাড়িতে ছরাদ্ধ (শ্রাদ্ধ) করাইয়ে পেয়েছি খালি ঘড়ে (ঘরে)

কোথায় নেব হায় কারে খাবাব হুরূজা হাটে নিয়ে বেচে ফেলি কিছু জমা হলে পরে তীরিথ করূব পরূথম্ (প্রথম) গয়ায় গিয়ে আমার তানির পিণ্ড দিয়ে মুকৃথ (মুক্ত) কর্ব এ বলিতে বলিতে ডোমনচন্দ্র বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য আসিন্ (আসীন)। (পরূভু হরি কিষ্ণ কিষ্ণ) বল্‌তে বল্‌তে সভায় আইসা। মোরে খেচে টেনে নেও" ইত্যাদি।

শ্রীমন্মহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত—ইহা গদ্যগ্রন্থ। উমাচরণ রায় কানুনগো রচিত। আবরণ পত্রে লিখিত আছে: "শ্রীমন্মহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত। চট্টগ্রাম নিবাসিন শ্রীউমাচরণ রায় কানুনগো কর্তৃক সঙ্কলিত। ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। ১৭৮২ শকাব্দ।" ইহার উপক্রমণিকায় লিখিত আছে—"এ অভাজনের চীরাকিঞ্চন ছিল যে শ্রীমন্মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত সঙ্কলন করি, কিন্তু তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত না থাকাতে এবং কোন পুরাবৃত্ত না পাওয়াতে তৎকল্প সম্পূর্ণ করণে অপারগ হইয়া ভগ্নোৎসাহই ছিলাম ইদানীং শ্রীমন্মহারাজের বংশধর শ্রীযুক্তবাবু গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অনুকম্পায় বিক্রমপুর রাজনগর-নিবাসী মৃত গুরুদাস গুপ্তের বিরচিত পদ্যপূরীত শ্রীমন্মহারাজের জীবন চরিতের অত্যন্ত জার্ণ শীর্ণ পুরাতন এক গ্রন্থ পাইয়া তাহার বাহুল্যাংশ বর্জ্জন পুরঃসর স্থূলাংশ উদ্ধার পূর্ব্বক যথাসাধ্য যত্ন ও শ্রম সহকারে এই জীবন চরিত প্রচার করিলাম।"

কবিরাজী পাতড়া—ইহাতে অনেক রোগের ঔষধাদির ব্যবস্থা আছে; নমুনা: "সর্পের ওষধি। কাট লটি আর শিখর সর্প্পের গাএ ঠেকাইলে মাথা তুলিতে পারে না ইহার সিখর ও গাছ সর্ব্বসুদ্ধ

চিবাইয়া আদ পাওয়া রষ রোগিকে খাওয়াইবেক. সর্পের বিষ ও সকল বিষ ভালো হএ বারেক বমি হএ।

একটা পানে করিয়া আঠালিআ মাটি কিঞ্চিৎ লবন দিআ খাওয়াই দিলে সর্পের বিষ ভালো হএ।" ইত্যাদি।

ঐ পুস্তকের অপর পুথি: ইহারও সন তারিখ জানা নাই। অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ; খুব প্রাচীন মনে হয়; কাগজ যেন তামাকের পাতা। ইহাতে নানা রকম রোগেয় ঔষধাদির ব্যবস্থা আছে। সর্প মন্ত্রাদির সমাবেশও আছে। সুমন্ত্র কুমন্ত্র উভয়ই আছে; একটি কবচও দেখা যায়। নমুনা, যথা—"কুকুরে কামড়াইলে প্রয়োগ। মঘা শাস্ত্র মতে।

আসারুআ পোক	/০ মাসা
গোলমরিচ	৵০
আদ্রক	/০
সিংগৃপ (?)	/০

এহারে বাটি সাতগুলি বানাই তপ্ত জল অনুপানে খাইব, আড়াই প্রহর বাদে কিছু খাইব। শারোআ গাছের জর ছেদি আদ পাবা রস লই—খাবাইলে প্রতিকার পাইব।"

প্রেম নাটক—সন তারিখ জানা নাই; পুস্তকের প্রচ্ছদ পত্রে লিখিত আছে: শ্রীশ্রীকালী ভরসা॥ প্রেম নাটক নামক গ্রন্থ। কলিকাতা শ্যামপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্তৃক গৌড়ীয় সাধু ভাষায় পয়ারাদি বিবিধ প্রকার অভিনব ছন্দে বিরচিত হইয়া ইদানিন্তু জ্ঞানদীপক যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।" পুস্তকখানি গদ্য পদ্যে রচিত। গুণক ছন্দে গণেশ বন্দনা ও ভুজঙ্গ প্রয়াত ছন্দে

সরস্বতী বন্দনার পর—"কোন নগরস্থ এক গৃহস্থ বিশিষ্ট কুলোদ্ভবা কামিনী ভাগিনী অনঙ্গমোহিনী গজেন্দ্রগামিনী ভ্রূকুটীভঙ্গিনী পূর্ণেন্দুবদনা কুন্দকুসুমদশনা কোমলরসনা ইন্দীবরনয়না ভ্রূকামধনু-গঞ্জনা গৃধিনী-শ্রবণা।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান—১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ পত্রে লিখা আছে: "শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং॥ পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান। নামক গ্রন্থঃ॥ অর্থাৎ॥ পারস্য ভাষানুবাদপূর্ব্বক॥ তন্ত্র পরিবর্ত্ত বঙ্গভাষা সর্ব্বজন হিতার্থে॥ সংগ্রহ॥ শিবাদহ নিবাসী॥ শ্রীপীতাম্বর সেন দীং॥ সিন্ধুযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল॥ সন ১২৪৬ সাল॥" আরম্ভে দীর্ঘ ভূমিকা—দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদসম্বলিত; ভূমিকার শেষে—"ভারতবর্ষের অধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্তডিপোটি গবর্নর জানেরেল্ বাহাদুরের গত বৎসরের ২৩ জানেওয়ারির লিখিত আজ্ঞা পত্রের অভিপ্রায় সংগ্রহ পত্র" ইত্যাদি। অতঃপর অভিধান ভাগ, যথা—

"অকিল্	বাদে নিযুক্ত ন্যায়ে নিযুক্ত।
অকুক্	প্রজ্ঞা বুদ্ধি মতি ধী।
অঙ্গুর	দ্রাক্ষাফল বিশেষ।
ছিয়াম্	ত্রিংশ ত্রিশা।
ছিএকম্	একত্রিংশ একত্রিশা।
ছিদোএম্	দ্বাত্রিংশ বত্রিশা।" ইত্যাদি

আচার-রত্নাকর (১৮৪১)—ইহাতে অরুণোদয় হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সময়ের কর্ত্তব্য সদাচার কথিত হইয়াছে। আচরণে লেখা আছে: "শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া ইদানীং শিবাদহের শ্রীপীতাম্বর সেন দীং সিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৪৮ সাল।"

অজ্ঞাতনামা পুথি—রাধাকৃষ্ণের লীলাই ইহার বর্ণনীয় বিষয়; "দূতীসংবাদ" নাম হইলেই ইহার উপযুক্ত নাম হইত। ভাষা অধিকাংশ স্থলে গদ্য; নমুনা যথা—"আমি এলাম শ্রীরাধে। তুমি কে হে। তুমি কেহে এত রাত্রে X হাক দিচ্ছ। আমি তোমার কৃষ্ণ। তুমি কোন্ পক্ষের কৃষ্ণ। শুকুলা পক্ষের কৃষ্ণ, না কৃষ্ণ পক্ষের কৃষ্ণ। আমি উভয় পক্ষের কৃষ্ণ। আমাদের কৃষ্ণ জিনি তার থালের থাল বোজায় আছে। আমার আছে হে। আমাদের কৃষ্ণর একটী পরিজট আছে। আমার আছে হে। আমাদের কৃষ্ণর একটী অষ্টউত্তর শতো নাম আছে। আমার আছে হে। কি কি নাম। সামসুন্দর মদনমোহন।" ইত্যাদি।

আইন-সার সংগ্রহ—ইহা একখানি ছাপা বহির প্রতিলিপি। ইহার মলাটে লেখা আছে—"ইঙ্গরেজি ১৭৯৩ সালাবধী ১৮৩২ সাল পর্য্যন্ত॥

আদালত বিষয়ক আইন॥

সান্তিপুরের মুনসেফ পদাভিসিক্ত সদ্বিচারক শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংগ্রহ. হইয়া বহরা গ্রামে। শ্রীহরিশচন্দ্র দত্ত দীং বিদ্যাকর যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল। বঙ্গাব্দা ১২৪৮ সংখ্যক। শ্রীপ্রাণকিসোর রায় শ্বয়ঙ্কর॥" ইহাকে আমরা সেকেলে বাঙ্গালা গদ্যের নিদর্শনস্বরূপ অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারি। ভূমিকা যথা—"শ্রীশ্রীপরমেশ্বর জীবের সৃষ্টি স্ব স্ব কার্য্য সৃজন করিয়াছেন তাহাতে আহার নিদ্রাদি সকল জিবের তুল্য জিবের মধ্যে প্রধান মনুষ্য কারণ এই তাহারদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান সৎপথাবলম্বন ও শ্রবণ মনন বেদবাক্য দ্বারা পরমেশ্বর তত্ত্বজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার যে সকল মনুষ্যেরা তত্ত্ববিষয়ে

নিরুৎসুক আছেন তাঁহারা পশুজিবের তুল্য যাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানাদিতে প্রবর্ত্ত থাকেন শৌচবাহ্যাদির ন্যায় বিষয় কর্ম্ম করিলেও সৎকর্ম্মের প্রতিবন্ধক জর্ম্মে না যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথাবলম্বি হয় তাহার পাপশরীর ধ্বংস হইয়া পুণ্যশরীর প্রাপ্ত হয় তাহাকে দ্বিজ কহা যায় অর্থাৎ দ্বিজাত যেমন তৈলপায়িকা কুমরকিয়া পোকাদ্বারা দ্বিজাত হইয়া পুর্ব্বশরীর নাস হইয়া উত্তমতাকে পায় শ্রেয়ঃ কর্ম্মের বিঘ্ন আছে বিঘ্নধ্বংসকারি শ্রীশ্রীপরমেশ্বর তাহার তত্ত্বনিরূপণ সকঠিন অসাধারণ বিসেসন দ্বারা শ্রীশ্রীপরমেশ্বরের স্বরূপ নিরূপিত আছে অম্বয় ব্যতিরেকে এ বিশ্বের সৃষ্টি যাঁহা হইতে হইয়াছে এই বিশ্ব তাহা ব্যতিরেকে নাই তিনি বিশ্ব ব্যতিরেকেতেও আছেন এবং তিনি আপনাতে আপনি দিপ্তবান আছেন পরেমেশ্বর তত্ত্বপ্রকাসক পুস্তক তিনিই প্রকাশ করিয়াছেন আর যিনি তেজঃদ্বারা কুহককে নিরস্ত করিয়াছেন তিনি সত্য কেন না ধ্বংসের অপ্রতিযোগি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে বহুবিধ প্রণতি স্তুতি ও ধ্যান করোতো বিষয়িদিগের অবস্থ জ্ঞাতব্য কানন কানন বহুবিধ থাকিতেও সংক্ষেপোক্তি সারদ্ধার পূর্ব্বক আইন সার সংগ্রহ নামক গ্রন্থ করিতে প্রবর্ত্ত হইতেছি—" ইত্যাদি

ইতিপূর্ব্বে কবিরাজী পাতড়া নামক একখানি পুথির উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু দেখা যায়, কবিরাজী পাতড়ার পুথি একাধিক ছিল; ইহাতে দ্রব্যগুণ বিষয়ক অনেক জ্ঞাতব্য জিনিষ লিপিবদ্ধ আছে; সাধারণের চিত্তাকর্ষণের জন্য কবিরাজী পাতড়ার আরও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম—"বাই অম্বলের প্রতিকার। শুপারি খণ্ড। শুপারি কাটিয়া জলেতে সিদ্ধ করিব। তবে দুগ্ধে সিজাইব। শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিব। তবে বকাল তোলাইব। ধন্যা ত্রিকটু গুড়ঞ্চক (?) জ্যৈষ্ঠ

মধু তেজপত্র এলাইচ নাগেশ্বর তালিশপত্র রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ দেবদারু কালজিরা মছুরী লবঙ্গ। * * *"—পূর্ব্বোক্ত সুশীলবাবু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত।

অন্যত্র:—"মাঘ মাসের মসিনায় কাষ্ঠ ভস্ম করিয়া পুরিয়াতে রাখিবেক নিরালা তিসির তৈল সিসিতে রাখিবেক তারপর নবীন বস্ত্র দুই হাত মাঘ মাসে ছোলার জমীতে প্রাতে নিহারে ভিজাবে ৭ দিন ছায়াতে সুখাবেক তহ করিআ রাখিবেক মেঘের কালে লোহার কড়াই অগ্নিতে রাখিবেক তৈল কিছু দিয়া ৺ইচ্ছাতে জদি মেঘে সিল বিষ্টি হয় তবে ওই সিল হাতে গোল করিয়া বিভূতি নাগাবেক কাপড়ের টুকরাতে বিভূতি দিয়া কাপড় বাধিয়া তৈলে ভাজিবেক ৺করেন মোতি হয় বেহা করিয়া রাখিবেক।

কুড় মধু ঘৃত একত্র করিআ বাটিআ খাইলে বৃদ্ধ তরুন হঅ * * * ধবলগিরি কর্ণিকা পুষ্যানক্ষত্রে মুল গলে লাগাইলে গলগন্দ ভাল হঅ।

কুচুল্যা গব্য ঘোলে সপ্তাহ রাখীবে পরে মরীচ আফিং সমভাগে আদার রসে বারো প্রহর বটিকা মটর প্রমান সিত কম্পজ্বর বেদনা * * * অনুপান লবঙ্গ পান ওলাওটাতে অতব চাউলের জল ঘোর সন্নিপাতে পান লবঙ্গ পেটের বেদনাতে বেলপাতের সত্তর সহিত খাবে। * * *

গরু বিআইলে জদি পেটে ফুল বন্ধ হঅ তবে তেলাকুচার পত্র লতা সহিতে অর্দ্ধসের জবানি অর্দ্ধ ছটাক আর লবন অদ্ধ ছটাক সহিত ছেচিআ খাআইলে ফুল পড়ে তারপর গরুর নাড়ে জদি বেদনা হঅ তবে অদ্ধসের কলাই লাউ অদ্ধখানা রসুন চারিটা মরিচ অদ্ধতোলা সকাল সকাল সিদ্ধ করিআ খাওআইলে ভাল হঅ আর সাল পত্র একটা

আর জমানি এক তোলা খাআইলে গরু চারা করে * * *"—শিবরতন বাবু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত ; লিপিকাল, রচয়িতা অজ্ঞাত।

পূর্ব্বোক্ত শিবরতনবাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১১৪৬ সালের নিম্নোদ্ধৃত গদ্যাংশেও অনেক কবিরাজী গাছগাছড়ার গুণাগুণ বর্ণিত থাকায় তাহাও এইখানে সন্নিবেশিত হইল :—

"৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রী৺কামিক্ষা দেবী : বআনির বিচ কাঁজি সহ বাঁটিএ তৈলে নস্য করিলে চুল কাল হয় ০।১ সেজেনের আটা তিল তৈলের সহিত দিলে কাল চুল পাকা হয় ০।২ হস্তি দন্ত আমলকি ভিঙ্গরাজ তৈলে পাক করিএ চুলে দিলে কাল হয় ০।৩ কাল জিরা বচ বাটিএ ভিঙ্গরাজের রস কেসর‍্যার রস কালতুলসীর রস একত্রে বাটিএ কেঁআর রস সহিত পাক করিএ মাথায় নিলে বিস্তর চুল কাল হয় ০।৪ সামুকের চুণ কলার খার সাত দিন থুঞে হরিতাল সহিত নেপিলে লোম উৎপাটন হয় ০।৫। বিড়ঙ্গ গন্ধক ছাগমুত্ত সহিত মাথাতে লইলে য়কুন মরে ০৬। আলগ লতা সত্ত দুর্ব্বার সত্ত নস্ত করিলে নাকের জলপড়া ঘোচে ০৭। দেবদারু কাষ্ঠ গুড়ি করিএ ছাগমুত্তে পাক করিএ তাহার জল চক্ষুতে অঞ্জন করিলে চক্ষুরোগ ঘোচে ০।৮। পূর্ব্বমুখে তিনবার জল নিলে চক্ষুরোগ ঘোচে ০।৯। রক্তচন্দন পেপ্যালি মধু সহিত অঞ্জন করিলে চক্ষুরোগ ঘোচে ০।১০।...

যুক্লবর্ণের তণ্ডুল সর্করা সহিত্ত খাইলে বাই ঘোচে ০।১১৮।...চিত্রা-নক্ষত্রে তুলে লোহাবেলের কাষ্ঠ পঞ্চটী চারি অঙ্গুলে নএে জে ঘরে পোতে সে ঘরে তৈল নষ্ট হয় ০।২২৮। পুনর্ন্নবার মরিচ সহিত খআইলে সকল বসন্ত ভাল হয় ০।২২৯। কণ্টিকারির মূল মরিচ সহ খআইলে বসন্ত ভাল হয় ০।২৩০ ইতি সন ১১৪৬ সাঃ ৬ জৈষ্ঠি"

রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)—

আমাদের আলোচ্য বিষয় বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য। কাহারও কাহারও মতে রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যকে বর্ত্তমান ছাঁদ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বলিয়াছেন "রামমোহন রায় বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভাত নক্ষত্র। ক্রমে প্রদীপ্ত ঊষালোকে এই সাহিত্যে তাঁহার প্রভাব লুকাইয়া গেলেও তিনিই এখন যাবৎ বঙ্গগগনে অতর্কিতে কার্য্য করিতেছেন।" * "তিনিই বঙ্গীয় গদ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একদিকে উপনিষদ্ বেদান্ত-দর্শন প্রভৃতি সমুচ্চ দার্শনিক গ্রন্থনিচয়ের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষাকে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও জ্ঞানগবেষণার সমুচ্চ মাহাত্ম্যে উদ্বুদ্ধ করেন; আবার অন্যদিকে ঐশ্বর্য্যময়ী ইংরাজীভাষা জনসাধারণ্যে সম্যক্ প্রচলিত করিবার উপায় উদ্ভাবিত করিয়া যান। * * রামমোহন স্বয়ং উক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যথাশক্তি সাহিত্যের সেবা করিয়া যান।" ‡

রাজা রামমোহন রায়ের হাতে বাঙ্গালা ভাষার বহুল পরিবর্ত্তন ঘটে। ভাষায়, রচনায়, পদবিন্যাসে, ভাবুকতায়—সকল রকমের পরিবর্ত্তন। এই সময় ধর্ম্মতত্ত্বেরও ঘোর বিপ্লব দেখিতে পাই। ইনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা; পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইনি অনেক সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার প্রথমগ্রন্থ ব্রহ্মতত্ত্ব ১৮১৫ সালে রচিত হয়। পরে ইনি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত বেদান্ত ও উপনিষদের বঙ্গানুবাদ প্রচার করেন এবং

* বঙ্গবাণী—পৃষ্ঠা ৪৫

‡ সাহিত্য—আষাঢ়, ১৩১২

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কৌমুদী নামক বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও ব্রাহ্মণ সেবাধি-নামক একখানি সাময়িক পত্র প্রচার করেন।

স্বনামধন্য কবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই।... রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রাণিটস্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপন করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলা ভাষা কেবল দৃঢ়বাসযোগ্য নহে, উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।"

ইনি গৌড়ীয় ব্যাকরণ নামক একখানি ব্যাকরণও বাঙ্গালাভাষায় লিখিয়াছেন (১৮৩৩)। ইঁহার অপর রচনা বজ্রসূচী, গায়ত্রীর অর্থ, সহমরণ বিষয়ক প্রস্তাব ও কায়স্থের সহিত বিচার ইত্যাদি। "রামমোহন রায় ইউরোপীয়দিগের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার সাহায্যার্থে ইংরেজী ভাষায় বাঙ্গালার এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। ১৮২৬ খৃঃ অব্দে তাহা মুদ্রিত হয়। পরে তিনি সেই ব্যাকরণের আদর্শে বাঙ্গালা ভাষায় উহার এক ব্যাকরণ [গৌড়ীয় ব্যাকরণ] রচনা করেন। তাহা এক প্রকার উপরোক্ত ইংরেজী ব্যাকরণের অনুবাদ বলিলেও চলে।"—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক "সংবাদপত্রে সেকালের কথায়" ৬৬-৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

দীনেশবাবু বলিয়াছেন "He [Raja Rammohan Ray] was a man of stupendous learning—one who was

perhaps unrivalled in the world of his times as a linguist * * * I do not say that Raja Rammohan Ray is the father of the modern Bengali Prose, as some people have said, but I must admit that he was greater than a literary man; he was an ideal teacher and saint. He used language as a vehicle of thought and did not care to decorate it, for the decorating of style often diverts the mind from the subject to literary beauty. * * His writings are pure and blameless, and in this respect he stands superior to Carey. * * He wrote a style the echo of which we find in Devendranathis 'Atmacharit' in a later age"

"Being devoted to highly philosophical and controversial topics his lauguage is generally a bit dry, and as such, not well suited to high artistic puposes. Still as the first harmoniser of the Eastern and western ideas, as the first writer of simple, readable prose, Rammohan will ever occupy a most honoured place in the annals of our literature. Specimen of his prose :

'চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হয়; এই হেতু তখন ব্রহ্মবিচারের অধিকার জন্মে। যদি ব্রহ্ম লক্ষ্য এবং বুদ্ধির গ্রাহ্য না হয়েন তবে কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার হইতে পারে—এই সন্দেহ পরে দূর করিতেছেন। এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও নাশ যাহা হইতে হয়

তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি। যে হেতু কার্য্যকারণ থাকে, কার্য্য না থাকিলে কারণ থাকে না।' History of Bengali Literature by কুমুদনাথ দাস।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সহমরণ নিবারণ করার জন্য লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে রামমোহন রায় প্রভৃতি যে মানপত্র প্রদান করেন তাহা রামমোহনেরই রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইহার ভাষার নমুনা যথা:—"* * * বাস্তবিক ইহারা স্ত্রীপরম্পরার প্রতি আপন আপন সন্দিগ্ধান্তঃকরণের সান্ত্বনার নিমিত্ত এইরূপ ব্যবহারে উদ্যত হইলেন কিন্তু লোকেতে এমত গর্হিত কর্ম্ম হইতে আপনারদিগকে নির্দ্দোষ করিবার মিথ্যা বাসনায় সাক্ষাৎ দুর্ব্বল শাস্ত্রের কতিপয় বচন যাহাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিধবাকে স্বামির জ্বলচ্চিতারোহণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিতেন যেন তাঁহারা এরূপ স্ত্রীদাহ ব্যবহারকে শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে করিতে ছিলেন কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি সন্দেহযুক্ত হইয়া করেন নাই। বস্তুতঃ ইহা অতিশয় সৌভাগ্য যে শ্রীল শ্রীযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয় এতদ্দেশাধিপতিরা যাঁহারদের আশ্রয়ে ঈশ্বরপ্রসাদাৎ এদেশীয় স্ত্রীপুরুষ তাবৎ প্রজারদের জীবন সমর্পিত হইয়াছে তাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা নিশ্চয়রূপ জানিলেন যে ঐ সকল দুর্ব্বল শাস্ত্রের বচন যাহাতে বিধবারদিগকে ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্বলচ্চিতারোহণের অনুমতি আছে তাহাকে কার্য্যের দ্বারা অমান্য করিতেছিলেন এবং ঐ সকল বচনের শব্দের ও তাৎপর্য্যের সংপূর্ণমতে অন্যথা করিয়া পতিবিহীনারদের আত্ম-অন্তরঙ্গেরা ঐ বিহ্বলারদের দাহকালীন তাঁহারদিগকে প্রায় বন্ধন করিতেন এবং তাহারা চিতা হইতে পলাইতে না পারেন এ নিমিত্ত ভস্মোপযোগ্য রাশীকৃত তৃণ কাষ্ঠাদিদ্বারা তাহারদের গাত্র আচ্ছন্ন করিতেন

মনুষ্যস্বভাবের ও করুণার সর্ব্বথা বিরুদ্ধ এই ব্যাপার ভূরিস্থানে পোলীসের সংক্রান্ত আমলা যাহারা প্রাণির রক্ষার ও লোকের শান্তি ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্তে ব্যর্থ নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারদের অস্পষ্ট অনুমতিক্রমে সম্পন্ন হইতেছিল। * * * তাবৎ সহমরণঘটিত ব্যাপার যাহা স্বয়ং অতি দারুণ ও কুৎসিৎ এবং ইংগ্লণ্ডীয় অধিকারের নীতির অতি বিরুদ্ধ তাহার প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রীল শ্রীযুত কৌন্সেলে বিচার ও করুণা উভয় প্রদর্শিত নীতির বিশেষানুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হইয়া ইংগ্লণ্ডীয় নামের মহিমা সূচনার্থ আবশ্যক কর্ত্তব্যবোধ এই এই নিয়মকে নির্দ্ধারিত করিলেন যে শ্রীল শ্রীযুতের হিন্দুপ্রজারদের স্ত্রীলোকের প্রাণরক্ষা অধিক যত্নপূর্ব্বক করিতে হইবেক এবং স্ত্রীলোক প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার অতিশয় পাতক পুনর্ব্বার আর হইতে না পায় এবং হিন্দুরদের অতিপ্রাচীন পরম পবিত্র ধর্ম্মকে তাঁহারা নিজে যেন তুচ্ছ না করেন। সংপ্রতি এ অধীনের জ্ঞাতসার হইল যে ঐ আজ্ঞানুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের প্রতি বিশেষরূপে লিপি প্রস্থাপিত হইয়াছে যে সর্ব্বোপায়ের দ্বারা শ্রীল শ্রীযুতের আজ্ঞাকে প্রতিপালন করেন। * * *

কালীনাথ রায় চৌধুরী

রামমোহন রায়

* * ”

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (১৭৭৫–১৮৪৪)—ইনি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের পাদরী কেরী সাহেবের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করেন। পরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন, শ্রীশচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গরত্নগণ সকলেই ইঁহার ছাত্র। জয়গোপাল—কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি শ্রীরামপুরের মিশনরিগণের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। বঙ্গসাহিত্য ইঁহার নিকট যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (১৮০৪)—জয়নারায়ণ সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত আলঙ্কারিক ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, মহেশ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি ইঁহার ছাত্র ছিলেন। ইঁহার রচিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। বাঙ্গালা ভাষায় ইনি সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রমথনাথ—"নববাবু বিলাস" (১৮২৩)—

গৌড়দেশ চলিত সাধুভাষায় শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মণের নববাবু বিলাস (সন ১২৪৫ সালে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত)। ইহা চারিখণ্ডে বিভক্তঃ অঙ্কুরখণ্ড, পল্লবখণ্ড, কুসুমখণ্ড ও ফলখণ্ড। ভাষার নমুনা :—"অথ স্কুল মেষ্টরের বৃত্তান্ত। * গব্‌ভর্জাত একজন সাহেব আসিয়া বাবুদিগের পাঠকারণ নিযুক্ত করিলেন। সাহেবের মেজের সর্জা এবং খানা ও টীফিন খাওয়া দেখিয়া বাবুদিগেরো প্রায় তদনুরূপ ব্যবহার হইল আর সাহেবের সহিত সর্ব্বদা কথোপকথন দ্বারা গাডামী রাসকেল বেরিগুড্‌ হোট২ নানসেন্স্‌ গোটুহেল এইরূপ কথকগুলিন কথা অভ্যাস করিয়া বাঙ্গালা কথায় মিশাইয়া কহিতে লাগিলেন এবং দুই একখান ইংরাজী চিঠি পাঠ করিতে পারেন এবং ইংরাজী ভাষাতে কোন লোক কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ঐ সাহেবের মত শব্দ উচ্চারণ পুর্ব্বক উত্তর করেন যথা তোমার পিতার নাম কি টোমার নাম ডট্ট অর্থাৎ তোমার নাম দত্ত। আর বাবু সকল যেরূপ ইংরাজী পত্রাদি লিখিয়া থাকেন তাহা অন্য কাহার সাধ্য নাই যে পাঠ করেন বা বুঝিতে পারেন।' ইহাতে তদানীন্তন ভাষার লক্ষ্য করিবার জিনিষ অনেক আছে। রেভারেণ্ড জে লঙ্‌ এই পুস্তকখানিকে 'One of the ablest satires on the Calcutta Babu' বলিয়াছেন। এই পুস্তক অবলম্বনেই

প্যারীচাঁদ মিত্র উত্তরকালে তাঁহার আলালের ঘরের দুলাল রচনা করেন।

পুস্তকখানির ভাষা স্থানে স্থানে নিতান্ত কুৎসিৎ ও কুরুচিপূর্ণ হইলেও ইহাতে সে সময়ের বাবুদিগের উপর যে একটা তীব্র শ্লেষোক্তি বর্ষিত হইয়াছিল এবং সে সময়ের বাবুদিগের আচার ব্যবহারের যে একটা নিখুঁৎ চিত্র অঙ্কিত আছে—তাহা প্রণিধান যোগ্য। পরবর্ত্তী লেখক কালীপ্রসন্নও হুতোমে নিতান্ত কম যান নাই। নববাবু বিলাসের রচনার নমুনা স্বরূপ আরও কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"আর যাহারা বিবাহাদি সময় রাস্তায় সর্ব্বাগ্রে তক্তারামায় [?] আরোহণ করিয়া নৃত্য করে, এমত নর্ত্তকী প্রায় তিন চার সম্প্রদায় আইল; তৎপরে সকলের আগমনান্তর বাবু জনসমাজ পূজ্যা বারাঙ্গনাগ্রগণ্যা বকুনা পেয়ারী প্রভৃতির নিকট গললগ্নকৃতবাস হইয়া করপুটে কহিলেন "আপনারা স্নান করুন" তৎপরে অন্য ভক্তগণ আসিয়া বাবুর আজ্ঞামত আতর মর্দ্দন করাইলেক, কাঁচাগোল্লা দিয়া মাথা ঘসাইয়া দিলেক, নির্ম্মল পুষ্করিণীর জল ক্রীড়াচ্ছলে কুতুহলে ভৃত্যগণের বহু সমাদরে ভক্তগণেরা গোলাপ জলে শরীর ধৌত করাইলেক। সেই সময়ে এক গাটি বস্ত্র আনিয়া উপস্থিত করিলেন। শান্তিপুর, অম্বিকা, বাদাগাছি, ঢাকা, চন্দ্রকোণা, খাসবাগান, বরাহনগর প্রভৃতি নানা স্থানের শাটী, শালপেড়ে, কাঁকড়াপেড়ে, লালপেড়ে, নীলপেড়ে, তাবিজপেড়ে, বরাহনগরের দুরে ব্যক্তিবিশেষে প্রদান করিলেন। তৎপরে আনন্দকাননে অপূর্ব্বাসনে সর্ব্বজন প্রফুল্লবদনে বেশ্যাসম্বিধানে উপবিষ্ট হইলেন, সেই আসনে ভৃত্যগণেরা নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন মদ্য মাংস আনিয়া প্রস্তুত করিলেক; ইতিমধ্যে এক নির্ব্বোধ পূর্ব্বদেশীয়

বাঙ্গাল ব্রাহ্মণ কহিলেক, যে ভোজনকালে পৃথক পৃথক স্থানে করিতে হইবে। এমন সময়ে খলিফার কুলপুরোহিত শিরোমণি কহিলেন 'ওরে নরাধম মূর্খ শাস্ত্র জানিলি না, এক্ষণে এ স্থল ভৈরবী চক্র বলা যায়, ভৈরবী চক্রে জাতি বিচার নাই। প্রমাণং যথা—

আগতা ভৈরবীচক্রে সর্ব্বেবর্ণাঃ দ্বিজোত্তমাঃ
পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।'

ইত্যাদি প্রমাণ শুনিয়া সকলে হৃষ্টচিত্ত হইল। হিন্দু মুছলমান বেশ্যা সাধারণ ভাবতেই নির্ম্মলান্তঃকরণে একাসনে বিবিধ মদ্য মাংস প্রভৃতি নানা দ্রব্য ভোজন করিলেন।"

পুস্তকখানির ভূমিকা সমাসের ঘটায় কাদম্বরীকে অতিক্রম করিয়াছে: "নিশাকর-কর-নিকর-নির্ম্মল-ধবল-কোমল-কমল-মুক্তাফল নির্ম্মল গঙ্গাজলতুল্য-সিতাশেষযশঃ প্রকাশীকৃত ভূমণ্ডল" ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাষা গদ্য পদ্য।

প্রমথনাথের অপর পুস্তক **নববিবি বিলাস**। ইহারও ভাষা গদ্য পদ্য। স্থানে স্থানে হিন্দী বোল আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৭। নব-বাবু বিলাসের মত ইহাও অঙ্কুর, পল্লব, কুসুম ও ফল এই চারিখণ্ডে বিভক্ত। সন ১২৪৭ সালে তৃতীয়বার মুদ্রিত। আবরণ পত্রে লেখা আছে: "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজী শ্রীচরণ ভরষা॥ নববিবি বিলাস অর্থাৎ কুলটাবর্গ্গে কুলকামিনীর দুঃখ প্রকাশ। যথা—

অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুট্টিনী।
সর্ব্বশেষে সর্ব্বনাশে সারং ভবতি টুক্কনী॥"

ভূমিকা যথা: "যদ্যপি নব বাবু বিলাসে নববাবুদিগের স্বভাব

সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থের ফল খণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি, সেই বিবিরূপ প্রধান মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ ফল তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত হয় নাই, এ নিমিত্তে তৎপ্রকাশে প্রয়াস পূর্ব্বক নববিবি বিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।" ইত্যাদি

এই যুগের অন্যান্য পুস্তক—

আরও অনেকগুলি পুস্তক এই যুগে রচিত হইয়াছিল: গৌরমোহন দে প্রকাশিত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক (১৮১৮) ও বেনামী লেখকের তৎপ্রতিবাদ স্ত্রী দুরাচার (১৮৪০); তারাচাঁদ দত্তের মনোরঞ্জন ইতিহাস (১৮১৯); রাজবিবরণ (১৮২০); তিমির দর্শন (১৮২৩); সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস (১৮২৯); ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রসসুন্দর; সাধুভাষায় ব্যাকরণ-সার সংগ্রহ (১৮৪০); কায়স্থ বিবরণ (১৮৪৬) ও কালীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য প্রণীত তৎপ্রতিবাদ 'মুক্তাবলী'; ঠাকুরদাস বসুর দুর্জ্জন দমন নবমী (১৮৪৬); হিন্দুধর্ম্মচন্দ্রোদয় (১৮৪৭); বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৮৫০); রামকমল সেনের নীতি-কথা; প্রেমচাঁদ চৌধুরী প্রণীত জল-চিকিৎসা (১৮৫০) ইত্যাদি। বিস্তৃতি ভয়ে এগুলির আর নমুনা উদ্ধৃত করা হইল না।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১১—১৮৫৬)—

বাঙ্গালীর চির আদরের চিরপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—রঙ্গরসের ব্যঙ্গরচনার অফুরন্ত ফোয়ারা! ইঁহার 'তপ্‌সে মাছ', 'বড়দিন' প্রভৃতি কবিতা যিনি একবার পড়িয়াছেন তিনি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। ইঁহার রচনা পুরাতন হইলেও চির-নূতন। তাই জনৈক সাহিত্যিক বলিয়াছেন 'এ বুড়া কেবল রসের গুঁড়া'। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "ঈশ্বরগুপ্ত Realist এবং ঈশ্বরগুপ্ত

Satirist, ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। ইহার 'সংবাদ-প্রভাকর' তৎকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা সংবাদ পত্র। ইহার রচনার মধ্যে কবিতাই বেশী ; তবে প্রাচীন কবিদিগের জীবনী লিখিয়াছেন গদ্যে ; আর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের একটী উত্তম সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার রচনা পারিপাট্য অপেক্ষা শব্দবিন্যাস চাতুর্য্যেরই সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার নমুনা যথা—"এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন কবিদিগের জীবন-বৃত্তান্ত পূর্ব্বে কেহ লিখিয়া রাখেন নাই এবং সেই সেই কবি মহাশয়েরাও আপনাপন বিরচিত প্রবন্ধ প্রকরণ প্রকটন পুরঃসর তন্মধ্যে স্ব স্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন নাই সুতরাং এইক্ষণে তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকের সুগোচর করা যদ্রূপ কঠিন ব্যাপার হইয়াছে তাহা বিজ্ঞজনেরাই বিবেচনা করুন। আমি এক প্রকার সর্ব্বত্যাগী হইয়া শুদ্ধ এই বিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে আমার অবস্থা যদ্রূপ হইয়াছে তাহা আমিই জানিতেছি এবং যিনি সর্ব্বসাক্ষী তিনিই জানিতেছেন।"

পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন: "বাঙ্গালার রসিক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখনী সরল বর্ণনার জন্য প্রসিদ্ধ। এই সরল কবি বেথুন সাহেবের অনুরোধ ক্রমে 'হিতপ্রভাকর' নামে সহজ ভাষায় একখানা স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই হিত প্রভাকরের একটী প্রবন্ধ 'পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন'। প্রবন্ধটী গদ্যছন্দে লিখিত। এই গদ্যটী আর এক অপূর্ব্ব রসের ফোয়ারা।—'রে মন! পরম-পুরুষের পবিত্র প্রেমপুষ্পের আমোদের আঘ্রাণ একবার নেরে—একবার নেরে। ওরে মন! ভূতনাথকে একবার দেখরে—একবার

দেখরে; মনরে—মনরে—শোনরে শোনরে; ও মন! ব্রহ্মরসে গলরে—গলরে—ও চিত্ত এই লৌকিক সামান্য রস রাখরে—রাখরে—রাখরে। তাঁর প্রেমরস চাক্‌রে—চাক্‌রে চাক্‌রে। তাঁর ভক্তিরস মাখ্‌রে—মাখ্‌রে—মাখ্‌রে।”

দীনেশবাবু বলিয়াছেন—“Iswara Gupta's prose is full of conceits and alliterations. His prose sometimes verges on the poetical. It is on such occasions neither prose nor poetry but a hybrid and medley of a curious kind. * * Iswara Gupta's style, at one time held as model which even Bankim chandra admired and tried to imitate in his younger days, has now grown thoroughiy antiquated.” নমুনা যথা—“কোকিল বসন্তাগমনে—মধুকর কর প্রফুল্ল পঙ্কোজ মধুপানে—চাতক নব-নীল নীরদ-নির্গত-নীরপানে—চকোর পরিপূর্ণ শরদিন্দু সুধাপানে—ভুজঙ্গ সুশীতল মৃদুল দক্ষিণ সমীরণ সেবনে—সাধ্বী-স্ত্রী পতি সুখ সম্ভোগে—রসিকজন রসালাপ আস্বাদনে—এবং দরিদ্র ব্যক্তি প্রচুর ধনপ্রলাভে যে প্রকার সুখানুভব না করে ভাবগ্রাহী অনুরত জনেরা ভারতচন্দ্রের প্রণীত রস-ভেদের কবিতা পাঠেও ততোধিক সুখাস্বাদন গ্রহণ করিয়া থাকেন।

রজনীকান্ত গুপ্ত বলিয়াছেন—“ঈশ্বরগুপ্ত অতি সামান্য বিষয় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিতেন। তাঁহার রচনা যেরূপ সরল সেইরূপ মধুর ছিল। স্বভাব বর্ণনায়ও হাস্যরসের অবতারণায় তাঁহার শক্তি কোথাও প্রতিহত হইত না। তিনি কাব্যজগতে কোনরূপ কল্পনাকৌশল গম্ভীরভাব

ও সৃষ্টিচাতুরী দেখাইতে সমর্থ না হইলেও সরল ও স্বাভাবিক বর্ণনার গুণে বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে সে সময়ে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।"

পূর্ব্বোক্ত কৈলাস বাবু বলিয়াছেন—"তিনি হাস্যরসের প্রবর্ত্তনায় অদ্বিতীয় ছিলেন। হাস্যরসে তাঁহার মত কৃতীলেখক আর দেখিতে পাই না। তাঁহার কবিত্বে যে প্রকার ক্ষমতা ছিল, পাণ্ডিত্যে সে প্রকার থাকিলে তাঁহার রচনা অতীব প্রীতিকর হইত।"

ইঁহার রচনাশক্তি যথেষ্ট থাকিলেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছিল তদধিক। ইনি তৎকালের খৃষ্টান পাদরীদের ও খৃষ্টানদের উপর অজস্র কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। নিজে বারুণীভক্ত ছিলেন বলিয়া বারুণী-সেবন সমর্থন করিয়াছেন। ইঁহার লিখিবার শক্তি প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও ইঁহার রচনা দুর্ব্বহ অনুপ্রাস সমাসাদির ভারে নিপীড়িত হওয়ায় স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। খাঁটি বাঙ্গালা লেখক-দিগের মধ্যে ইনি শেষ লেখক। ইঁহার পর হইতেই বাঙ্গালা রচনা মধ্যে ইংরেজির গন্ধ, ইংরেজি হাবভাব, ইংরেজি ঢং ও ইংরেজি শব্দ প্রবেশ করিতে লাগিল। বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে যে সকল ইংরেজিশব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহার তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখা দরকার: প্রাচীন লেখকদিগের রচনার যে সকল নমুনা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিলাম সে সমুদয় উদ্ধৃতাংশ এত অল্প যে সেরূপ একটু আধটু নমুনা হইতে উক্ত লেখকদিগের লিপিকুশলতার বা রচনানৈপুণ্যের রীতিমত পরিচয় বাস্তবিক পাওয়া যাইতে পারে না। তাঁহাদিগের এক আধখানা সমগ্র গ্রন্থ পাঠ না করিলে তাঁহাদিগের রচনা সম্বন্ধে ঠিক ধারণা করিতে পারা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের অতিদীর্ঘতাভয়ে দীর্ঘ নমুনা দেওয়ার সুবিধা হইল না।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫)—

—রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টান হইলেও সংবাদ সুধাংশু নামক একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইনি বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে জানিতেন। ইজিপ্টের পুরাবৃত্ত, পলচরিত, খৃষ্টচরিত, ষড়্দর্শন সংবাদ, গ্যালিলিও চরিত, স্ত্রীশিক্ষা, বিদ্যাকল্পদ্রুম প্রভৃতি কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইনি বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন; Encyclopædia Bengalensis বা বিদ্যাকল্পদ্রুম ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে।

এই বিদ্যাকল্পদ্রুমের ১৩খণ্ড প্রকাশিত হয়; তন্মধ্যে—

২খণ্ড—রোমের ইতিহাস	২খণ্ড—জ্যামিতি
২খণ্ড—বিবিধ উদ্ধৃতাংশ বিষয়ক	১খণ্ড—জীবনী
১খণ্ড—ইজিপ্টের ইতিহাস	১খণ্ড—ভূগোল
১খণ্ড—সারগর্ভ প্রবন্ধ	২খণ্ড—ওয়াট লিখিত মনস্তত্ত্ব
১খণ্ড—গ্যালিলিও চরিত	

বাঙ্গালীর পক্ষে শিক্ষাপ্রদ অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত আছে; কিন্তু ইহাতে লেখকের মৌলিকতা মোটেই নাই; ভাল ভাল ইউরোপীয় লেখকগণের অনুবাদমাত্র এই পুস্তকে দৃষ্ট হয়। ইহার রচনায় হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি আস্থার শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়।

কালীকমল সার্ব্বভৌম—বগুড়া-বৃত্তান্ত (১৮৫০)—

কালীকমল সার্ব্বভৌম প্রণীত "বগুড়া-বৃত্তান্ত" (অনুমান ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ): ইহার ভাষা বেশ মার্জ্জিত; তবে সাময়িক লক্ষণগুলি সম্পূর্ণরূপেই বর্ত্তমান;—"সেখ পীর খাঁ নাজির অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়াছিল বলিয়া অবশেষে বেড়ি পরিয়া ও মাটি কাটিয়া কারাগারে বিষ্ঠামূত্রে পরিপূর্ণ

হইয়া মরিয়া গেল। পীর খাঁ নাজির মরিলে পর উহার পরিবারকে কোথায় গেল এবং অন্যায় উপার্জ্জিত ধনদৌলতই বা কোথায় রহিল তাহার কিছুই ঠিকানা হইল না। পীর খাঁ নাজির যদি লেখাপড়া জানিত ও সচ্চরিত্র হইত তাহা হইলে তাহার এরূপ দুর্গতি কখনই হইত না।"

রেভারেণ্ড জেম্‌স্‌ লং (১৮১৪-১৮৮৭)—বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধনকল্পে যে সকল ইংরেজ বদ্ধপরিকর হয়েন রেভারেণ্ড জেম্‌স্‌ লং তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। ইনি বঙ্গদেশের ও বঙ্গবাসীর পরম হিতৈষী ছিলেন। ইনি বঙ্গভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; এবং বঙ্গবাসী, বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যবিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইনিই প্রথম বাঙ্গালার প্রবাদ বাক্যগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন ও একখানি কলিকাতার ইতিহাস প্রণয়ন করেন। নীলকর পাষণ্ডদিগের অত্যাচার হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল মহাপুরুষ প্রাণপাত পরিশ্রম ও যত্ন করেন মহাত্মা লং তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম।

লঙ সাহেবের ক্যাটালগ্‌—লঙ্‌ সাহেব তাঁহার সময় পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক সমূহকে বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক পৃথক শ্রেণীবদ্ধ করিয়া একখানি সুবিস্তৃত পুস্তক তালিকা প্রকাশিত করেন। তৎকালীন পুস্তক সমূহের নাম জানিবার পক্ষে লঙ্‌ সাহেবের এই পুস্তক তালিকা অতি মূল্যবান জিনিষ।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)—প্যারীচাঁদ মিত্র নাম ভাঁড়াইয়া 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই উপনামে আলালের ঘরের দুলাল, মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়, রামারঞ্জিকা, গীতাঙ্কুর, আধ্যাত্মিকা, বামাতোষিণী, কৃষিবোধ, যৎকিঞ্চিৎ ও অভেদী প্রভৃতি

কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইনি ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিতও একখানি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সমুদয় গ্রন্থের মধ্যে আলালের ঘরের দুলাল আজিও বাঙ্গালা সাহিত্যিকের নিকট মূল্যবান পুস্তক। ইহাতে তৎকালের সামাজিক নক্সা অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত আছে। ইহাতে রচয়িতার যথেষ্ট মৌলিকতার ও রচনা কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। প্যারীচাঁদের পূর্ব্বে নব-বাবু বিলাস-প্রণেতা প্রমথনাথ ছাড়া আর কোনও লেখক চলিত ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করেন নাই। পূর্ব্বে পুস্তকাদির ভাষা ও কথোপকথনের ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। পুস্তকের ভাষা অধিকাংশ স্থলেই দুর্ব্বহ সমাসভারে প্রপীড়িত হইত; এইজন্য তৎকালে অধিক লোক পুস্তকাদি পাঠে মনোনিবেশ করিত না। প্রমথনাথ ও প্যারীচাঁদই এই চিরাচরিত পন্থা পরিহারপূর্ব্বক প্রথম চলিত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি তৎকালে চিঠিপত্রাদিতে পর্য্যন্ত কিরূপ উৎকট সমাসবদ্ধ পদ প্রযুক্ত হইত।

বঙ্কিমচন্দ্র যাহাকে কথায় কথায় টেকচাঁদী ভাষা বলিতেন— আলালের ঘরের দুলালে সেই ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। প্যারীচাঁদের ভাষা সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন "আমাদের বিবেচনায় হাস্যপরিহাসাদি লঘুবিষয়ের বর্ণনায় আলালীভাষা যেরূপ মনোহারিণী হয়, শিক্ষাপ্রদ বা প্রগাঢ় গুরুতর বিষয়ের বিবরণ কার্য্যে বিদ্যাসাগরী ভাষা সেইরূপ প্রীতিপ্রদ হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, "যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই (প্যারীচাঁদই) তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও

সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টবিশেষের অনুসন্ধান করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। * * * বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চে।"

দীনেশবাবু বলিয়াছেন "Alaler Gharer Dulal cast into shade the Nava Babu Bilas. * * Alaler Gharer Dulal is an elaboration of the tale already told in Nava Babu Bilas with a change in the names of its characters. * * * Some scholars compared Pearychand to Moliere and others to Fielding or Dickens."

বঙ্গবাসী অফিস হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক পুস্তকে লিখিত আছে : "ইংরেজী সাহিত্যে প্যারীচাঁদের প্রতিষ্ঠা যে পরিমাণ বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। প্যারীচাঁদই বাঙ্গালা ভাষার সুচিক্কণ রং ফলাইয়াছেন ; প্যারীচাঁদই বাঙ্গালা ভাষার সজীবতা সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত 'মাসিক পত্রিকা' নাম্নী মাসিক পত্রিকায় সে সাধনার আরম্ভ ; তাঁহার গ্রন্থাবলীতে তাহার পরিণতি। তাঁহার অভেদী—তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ—তাঁহার আধ্যাত্মিকা,—তাঁহার রামারঞ্জিকা ; তাঁহার ভাষা-সৌন্দর্য্যের কমল-কানন। তাঁহার মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়, এবং গীতাঙ্কুর আজ বহুজন পরিচিত। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা, 'বামাতোষিণী' ও কৃষিবোধ ইঁহার আর কয়েকখানি গ্রন্থ। 'রত্নমণী

কাওয়াসজীর জীবন চরিত' ও অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রত্ন—আলালের ঘরের দুলাল। ভাবুকতা এবং রসিকতা তাঁহার গ্রন্থে ভরপূর। পড়িতে পড়িতে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িবে, কিন্তু বুঝিতে পারিলে মর্ম্মগ্রন্থী ছিঁড়িয়া যাইবে। পাদরী লং সাহেব নীল কমিশনের রিপোর্টে প্যারীচাঁদের বিশেষণ দিয়াছিলেন,—'বঙ্গের ডিকেন্স।'

সাহিত্যে যেমন, চরিত্রেও তেমনি। প্যারীচাঁদ যেমন রসিক, তেমনি ভাবুক। তিনি হাসিতেন, হাসাইতেন ; ভাবিতেন ভাবাইতেন। শক্তি বস্তুতই অপরিমেয়। সঙ্গীতেও তাঁহার অনুরাগ খুবই ছিল। * * *

আলালের ভাষা কেমন সরলে সুন্দর !—

'কিয়ৎক্ষণ পরে বর মণিরামপুরে গিয়া উত্তীর্ণ হইল—বর দেখতে রাস্তার দোধারি লোক ভেঙ্গে পড়িল—স্ত্রীলোকেরা পরস্পর বলাবলি কর্‌তে লাগিল—ছেলেরটার শ্রী আছে বটে—কিন্তু নাকটী একটু টেকাল হলে ভাল হইত—কেহ বল্‌তে লাগিল—রংটী কিছু ফিকে একটু মাজা হ'লে আরও খুলতো। বিবাহ ভারি লগ্নে হবে কিন্তু রাত্রি দশটা না বাজতে বাজতে মাধববাবু দরওয়ান ও লণ্টান সঙ্গে করিয়া বরযাত্রী-দিগের আগবাড়ান লইতে আইলেন—রাস্তায় বৈবাহিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা শিষ্টাচারেতেই গেল—ইনি বলেন,—মহাশয়, আগে চলুন ; উনি বলেন,—মহাশয়, আগে চলুন ; বালির বেণীবাবু এগিয়া আসিয়া বসিলেন,—আপনারা দুইজনের মধ্যে যিনি হউন এক-জন এগিয়ে পড়ুন আর রাস্তায় দাঁড়াইয়া হিম খাইতে পারি না। এইরূপ মীমাংসা হওয়াতে সকলে কন্যাকর্ত্তার বাটীর নিকট আসিয়া

ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন ও বর যাইয়া মজলিসে বসিল। ভাট—রেও ও বারওয়ারীওয়ালা চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল—গ্রামভাটি ও নানাপ্রকার বাঘের কথা উপস্থিত হইতে লাগিল—ঠকচাচা দাঁড়াইয়া রফা করিতেছেন—অনেক দমসম দেন—কিন্তু ফলের দফার নাম মাত্র—চেয়োদিগের মধ্যে একটা সণ্ডা তেড়ে এসে বলিল—এ বেটা কেরে? বেরো বেটা এখান থেকে—হিন্দুর কর্ম্মে মোছলমান কেন? ঠকচাচার অমনি রাগ উপস্থিত হইল। তিনি দাড়ি নেড়ে, চোক রাঙ্গিয়ে গালি দিতে লাগিলেন। হলধর—গদাধর ও অন্যান্য নব বাবুরা একে চায় আরে পায়। তাহারা দেখিল যে প্রকার মেঘ করিয়া আসিয়াছে, ঝড় হইতে পারে—অতএব কেহ ফরসা ছেঁড়ে—কেহ সেজ নেবায়—কেহ ঝাড়ে২ টক্কর লাগাইয়া দেয়, কেহ ওর এর মাথার উপর ফেলিয়া দেয়,—কন্যাকর্ত্তার তরফের দুইজন লোক এই সকল গোলযোগ দেখিয়া দুই একটা শক্ত কথা বলাতে হাতাতাতি হইবার উপক্রম হইল—মতিলাল বিবাদ দেখিয়া মনে ২ ভাবে বুঝি আমার কপালে বিবাহ নাই—হয়তো ‘ৎতা হাতে সার হইয়া বাটী ফিরিয়া যাইতে হইবে।’ * * *

বঙ্গের তদানীন্তন কমিশনার জন্ বিমস্ সাহেব আলালের ঘরের দুলাল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—‘Babu Peary Chand Mittra, who writes under thc nom-de-plume of Teck chand Thakur, has produced the best novel in the language, Allaler Ghorer Dulal, or The spoilt child of the House of Allal. He has had many imitators, and certainly claim to be ranked with some of the best comic novels in our own language, for wit, spirit, and clever touches

of nature. He puts into the mouth of each of his characters the appropriate method of talking, and thus exhibits to the full the extensive range of vulgar idioms which his language possesses.—John Beames, Modern Aryan languages of India.' "

রামারঞ্জিকা—প্যারীচাঁদের রামারঞ্জিকা স্ত্রীপাঠিকাগণের উদ্দেশে রচিত। পুস্তকখানির Prefaceএতেই লিখিত আছে "The want of suitable books for the Hindu Females has induced the writer to undertake this little work. * Though he is aware that he has not been able to do justice to the subjects treated of in this publication, he hopes that the imperfections will be overlooked as the book is the first attempt of the kind." বাস্তবিক, সে সময়ে শুধু স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক ছিল না বলিলেই চলে; সে হিসাবে প্যারীচাঁদের এই উদ্যম প্রথম হইলেও পুস্তকখানি ভালই হইয়াছে, বলিতে হইবে। এই পুস্তক পাঠ করিলে স্ত্রীলোকেরা অনেক সদুপদেশ ও জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। ইহার ভাষাও মন্দ নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম: "শিক্ষকেরা বালকদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে যত্নপূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করেন একারণ স্ত্রীলোকদিগের ভদ্র স্বভাব ও ভদ্র ব্যবহার হয়, যদিও তাহারা ইংরাজদিগের বিবিদের ন্যায় অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকে না, নাট্যশালা প্রভৃতি স্থানে গমন করে, তথাপি ধর্ম্মজ্ঞান প্রভাবে তাহাদিগের মধ্যে ভ্রষ্টা প্রায় নাই। জাপান দেশের লোকদিগের স্ত্রীলোকের প্রতি এত বিশ্বাস যে কাহার স্ত্রীর অসতীত্ব প্রকাশ হইলে তাহারা আশ্চর্য্য হয়।

ধর্ম্মের মূল পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাস—ঐ মূল ভালরূপ হইলে কোন উৎপাতেই ব্যাঘাত হয় না। জাপান দেশের লোকেরা পৌত্তলিক বটে কিন্তু সকলেই ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী। যৎকালীন জাপান দেশের লোকেরা বন্ধুবান্ধব লইয়া পরিবার সহিত সদালাপ করে তখন স্ত্রীলোকদিগের শিল্প গঠন সকল বড় আমোদজনক হয়। সুন্দর২ বাক্স, নানা প্রকার ফল, বিচিত্র পাখা, এবং পক্ষী ও জন্তুর চিত্র, পাকেট বহি, ছোট২ বেটুয়া, চুল বাঁধিবার দড়ি ইত্যাদি দ্রব্যের দোষগুণ আলোচনায় নারীদিগের শিল্পবিদ্যানুশীলনে উৎসাহ প্রদত্ত হয়। জাপানদেশেরা স্ত্রীলোকেরা যেমন গুণবতী তেমনি সুন্দরী কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে স্বামী স্বেচ্ছাক্রমে অন্যান্য স্ত্রীলোককে স্ত্রীবৎভাবে প্রধানা স্ত্রীর নিকট রাখিতে পারেন এবং স্ত্রীর এমন সাধ্য নাই যে আপন ভর্ত্তাকে বিষয়াশয়ের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেন। স্ত্রীলোকেরা স্বামির সঙ্গের সঙ্গী, দুঃখের দুঃখী এবং সুখের সুখী অতএব যে২ বিষয়ে পরামর্শ দিতে সক্ষম, সেই২ বিষয়ে পরামর্শ কেন না দিবেন? এ বিষয়ে জাপান দেশের লোকদিগের সভ্যতা সংপূর্ণ হয় নাই।"

হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-১৮৪৪)—ভানুমতীচিত্তবিলাস, কৌরব বিয়োগ, চারুমুখচিত্তহরা, সপত্নীসেবা, রজতগিরিনন্দিনী, রাজ-তপস্বিনী, বারুণীবারণ প্রভৃতি প্রণেতা হরচন্দ্র ঘোষও এই যুগেরএকজন লেখক।

ডব্লিউ ওব্রাএন স্মিথ—"পৌরাণিক ইতিবৃত্ত" (১৮৭০)—সংস্কৃতজ্ঞপণ্ডিত উইলসন, উইলফোর্ড, কোলব্রুক প্রভৃতি বিরচিত গ্রন্থ এবং প্রসিদ্ধ শব্দকল্পদ্রুম সাহায্যে ইনি পৌরাণিক ইতিবৃত্ত নামকএকখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে পৌরাণিক দেবতা, অসুর, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, তথা বিভিন্ন দেশ, জাতি, পর্ব্বত প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত

বিবরণ, অকারাদিক্রমে সংকলিত। ইহার প্রথম খণ্ড মাত্র আমরা দেখিয়াছি। ইহা ১২৭৭ সালে মুদ্রিত। এই গ্রন্থ হইতে রচনার একটু দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি : "অজামিল। কান্যকুব্জ দেশে অতি পাষণ্ড একজন অধম ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে চোর ও দস্যু ছিল। পৃথিবীতে এমন অকার্য্য ছিল না যাহা অজামিল করে নাই। বৃদ্ধ পিতা মাতা ও সতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদোন্মোত্ত এবং দুষ্ক্রিয়ের সক্ত হওত আপনার তুল্য প্রকৃতি একটি ইতর জাতীয়া দাসীতে আসক্ত হয়, ইহারা অষ্টাশী বৎসর যাপন করে। ঐ দাসী গর্ভে তাহার আটটি সন্তান জন্মে, তন্মধ্যে সে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ রাখিয়াছিল। অজামিল মৃত্যুকালে রোগের যাতনায় ঐ কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণকে নারায়ণ বলিয়া যেমন ডাকিল, অদৃষ্টাধীন তৎপরক্ষণেই তাহার মৃত্যু হইল। মরণ সময় নারায়ণ নাম উচ্চারণ করাতে লিখিত আছে অজামিলের প্রচুর পুণ্য উদয় হইল, সেই পুণ্যে সে যম যাতনা এড়াইয়া স্বর্গে যাত্রা করিল।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)—এই যুগের শেষভাগের লেখকদিগের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "He did yeoman service to the cause of our literature by starting the famous journal Tatwabodhini Patrika in 1843 under the editorship of Akshoy kumar Dutt. He published a Bengali translation of the Rig-Veda and the Upanishads and wrote his autobiography and critiical expositions of Brahmoism which bear the stamp of his deep meditation. Some of his

letters published in book form, clearly reveal what high stuff he was made of." ‡

আত্মচরিত—দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আত্মচরিত' —রচনাকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। এ প্রকারের গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় কম হইলেও একেবারে বিরল নহে। উত্তরকালে কবিবর নবীন চন্দ্র সেনও একখানি উৎকৃষ্ট আত্মজীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। এই ধরণের গ্রন্থ সাহিত্যামোদীদিগের নিকট সমধিক মূল্যবান; ইহা হইতে শুধু লেখকের নিজের নহে তদানীন্তন সমসাময়িক লেখক বা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। ভাষার নমুনা যথা—"এতদিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলাম। তত্ত্বজ্ঞানের কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই। ধর্ম্ম কি ঈশ্বর কি কিছুই জানি নাই, কিছুই শিখি নাই। শ্মশানের সেই উদাস আনন্দ, তৎকালের সেই স্বাভাবিক সহজ আনন্দ মনে আর ধরে না। ভাষা সর্ব্বদা দুর্ব্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব! তাহা স্বাভাবিক আনন্দ। তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সময় বুঝিয়াই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন। কে বলে ঈশ্বর নাই? এই তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ।"

দেবেন্দ্রনাথের অপর গ্রন্থের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম দুই খণ্ড, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, উপদেশাবলী, আত্মতত্ত্ববিদ্যা, ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা, বক্তৃতাবলী, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি, পরলোক ও মুক্তি,

‡ History of Bengali Literature by Kumud nath Das.

ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা, উপহার, ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, উপনিষদের বৃত্তি—উল্লেখযোগ্য।

'বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের স্থান' নামক পুস্তকে অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন "বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমারের সংস্কৃত-বহুল ভাষা ও আলালী ভাষার মাঝামাঝি একটা ভাষা ও রচনাপদ্ধতি বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের বাংলা সাহিত্যে অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই মধ্যবর্ত্তী ভাষা ও রচনা পদ্ধতির প্রথম প্রবর্ত্তক। * * [রামমোহন রায়কে] ভাষার শিল্পী বল যায় না। বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী দেবেন্দ্রনাথ।"

দেবেন্দ্রনাথের 'জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি' নামক পুস্তকের সম্বন্ধে অজিত কুমার লিখিয়াছেন " 'জ্ঞানও ধর্ম্মের উন্নতি' বইটিতে বিজ্ঞানের অনেক কথা তাঁহাকে ব্যবহার করিতে হইয়াছে। পশ্চিম মহাদেশের কত তত্ত্বকে তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন, অথচ ইংরাজী কোন শব্দকে গ্রহণ করিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। ইংরাজী দুরূহ কথাগুলির পরিভাষা এমন সহজে তিনি করিয়া গিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁহার যে কোন রকমের কৃতিত্ব আছে তাহা মনে করাই শক্ত।

ক্রম অভিব্যক্তি (Evolution), আপেক্ষিক সত্য (Relative Truth) প্রভৃতি কত কথা আমরা এখন ব্যবহার করিতেছি, অথচ এগুলি প্রথম তাঁহার দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়। * * * "

অজিতকুমার আরও বলিয়াছেন "বাংলা গদ্যসাহিত্যে উৎকৃষ্ট রচনা রীতির তিনি যেমন প্রবর্ত্তক, তেমনি পথ প্রদর্শক।

তাঁহার সমস্ত রচনাবলীর মধ্যে ভাষা ও ষ্টাইলের উৎকর্ষের দিক হইতে দেখিতে গেলে তাঁহার 'আত্মজীবনী' ও 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান'

সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আত্মজীবনীতে তাঁহার নানা জায়গায় ভ্রমণের যে সকল চমৎকার ছবি আছে, তাহাতে দুচারিটি রেখার ছবি আঁকিবার প্রতিভা যেমন ফুটিয়াছে, সমস্ত আশপাশ খুটিনাটি গুলীকে চিত্র পটে পরিষ্কার দেখিয়া ঠিকমত সাজাইয়া তুলিবার নৈপুণ্যও কম প্রকাশ পায় নাই। * * *

'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে' ব্যাখ্যান অংশই সব চেয়ে কম—উপলব্ধির কথাই বেশি। সেই উপলব্ধির পিছনে সুদীর্ঘকালের জ্ঞানের সাধনা ও তপস্যা আছে, নানা সঞ্চয় আছে।"

তাঁহার অপর গ্রন্থের মধ্যে "আত্মতত্ত্ববিদ্যা" ও "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালা ভাষার শৈশবাবস্থায় বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের সহযোগিতায় ইউরোপীয় পাদ্রীগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা গদ্যের দৃঢ় ভিত্তি নির্ম্মিত হইলে পর ও তাঁহাদেরই প্রচেষ্টায় বাঙ্গালায় মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে পর, বাঙ্গালী লেখকগণ দলে দলে স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিতে লেখনী লইয়া অগ্রসর হয়েন। এই সময়ের নানা বিষয়ের অনেক পুরাতন বাঙ্গালা পুস্তক উত্তরপাড়া পাব্‌লিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। তাহার মধ্যে মাত্র কয়েকখানির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল :

পতিব্রতোপাখ্যান (১৮৫৩)

রঙ্গপুরের বিদ্যানুরাগী জমীদার কালীচন্দ্র রায় চতুর্ধুরি হিন্দু স্ত্রীলোকগণের পাতিব্রত্য ও তদুপকারিতা বিষয়ক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দিবার বিজ্ঞাপন দেন ; তদনুসারে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের সুবিখ্যাত পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত এক প্রবন্ধ লিখিয়া উক্ত প্রতিশ্রুত পারিতোষিক লাভ করেন ; এবং উক্ত জমিদার

মহাশয়ের ব্যয়েই ঐ প্রবন্ধ পতিব্রতোপাখ্যান নামক পুস্তাকাকারে ১৮৫৩ সালে মুদ্রিত করেন। এই পুস্তক উত্তরপাড়া পাব্লিক লাইব্রেরিতে দ্রষ্টব্য। পতিব্রতা নারীর যাবতীয় লক্ষণ, গুণাবলী ও কার্য্যাবলী—দৃষ্টান্ত সহিত এই পুস্তকে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৮৫৮)—

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৮ সালে "ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামক একখানি পুস্তক সঙ্কলন করেন। পুস্তকখানি কলিকাতা বাহির মৃজাপুর বিদ্যারত্ন যন্ত্রে গিরিশচন্দ্র শর্ম্মা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত; মূল্য চারি আনা মাত্র।

মহাজিদ শা (১৮৫৯)—

উক্ত কলিকাতাস্থ বাহির মির্জাপুর, বিদ্যারত্ন যন্ত্র হইতে ইংরেজী ১৮৫৯ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত আর একখানি পুস্তক—"মহাজিদ শা"। পুস্তকখানি ১৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী; প্রচ্ছদ পত্রে লিখিত আছে—

Bengal Family Libtary

গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ।

মহাজিদ শা।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

ইংরাজী ভাষা হইতে অনুবাদিত।

এ পুস্তকখানিরও ভাষা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই।

হতভাগ্য মুরাদ (১৮৬১)—১৮৬১ সালে কোন্নগর নিবাসী কবি যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় "হতভাগ্য মুরাদ" নামক একখানি শিশুপাঠ্য গদ্য প্রণয়ন করেন। পুস্তকখানি অনুবাদ মাত্র হইলেও ইহার ভাষা পুস্তক সুললিত এবং বর্ণিতব্য বিষয় সুচারুরূপে সন্নিবেশিত—সন্দেহ নাই।

লেখক পুস্তকখানির prefaceএ লিখিয়াছেন "Murud the Unlucky, like all it sister-tales, points a great moral and illus-trates a great truth. It aims at dispelling a delusion under which most of our countrymeu still labour and encourages a virtue which they still want. It shows that 'success in the world depends more on prudence than upou what is called luck or fortune.' * * * For the present Bengali literature can count evry few books within its pale, which can safely be put in to the hands of boys and young women of this country. Under such consiedrations, the Translator flatters himself with the hope that the book will not altogether be an unworthy present to the young and rising generation of his coun-try as well as to the female portion of it." ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় তখনও বাঙ্গালা ভাষায় শিশুপাঠ্য পুস্তক অল্পই ছিল।

শিবজীর চরিত্র (১৮৬২)—এই স্থলে আর একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়া এই যুগের অনুশীলনের উপসংহার করিব। পুস্তকখানির নাম শিবজীর চরিত্র। ইহার ১৮৬২ সালের দ্বিতীয় সংস্করণের এক খানি পুস্তক উত্তরপাড়া পাব্লিক লাইব্রেরীতে আছে। পুস্তকখানি 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ হইতে উদ্ধৃত।' ইহার ভূমিকায় লিখিত আছে—"বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ কর্তৃক যে সকল পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ করা প্রথম সঙ্কল্পিত হয়, তন্মধ্যে শিবজীর চরিত্র লিখিত ছিল। তৎকালে বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ পত্রের সম্পাদক ঐ পুস্তক প্রণয়নের ভার লইয়াছিলেন,

কিন্তু অবকাশাভাবপ্রযুক্ত তিনি অতি অল্প মাত্র লিখিয়াই বিরত হন। পরে কতিপয় সল্লেখকের সাহায্যে তাহার অবশিষ্ট লিখিত হইয়া বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে ক্রমশঃ প্রকটিত হইয়াছে। অধুনা সেই আদর্শ হইতে এই ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত হইল। * * *"

পুস্তকখানির ভাষার নমুনা যথা—"শিবজী যে এক অসাধারণ পুরুষ ছিলেন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার কোন২ কার্য্য দোষশূন্য ছিল না বটে, কিন্তু ইতিবৃত্ত মধ্যে যে তিনি এক সম্ভ্রান্ত পদবী প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, তাহার সন্দেহ নাই। যখন আমরা চিন্তা করি যে তিনি একদল অর্দ্ধনগ্ন মাওলী সৈন্য সংহতি বন ও উপবন মধ্য দিয়া পদচালন করিতেছেন—যখন আমরা চিন্তা করি যে তিনি জল-বায়ু প্রভৃতির অসদ্ভাব ও শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতির প্রভাব অতিক্রম করিয়া সমভিব্যাহারী সৈন্যদিগকে অসাধ্বস সাহসে উত্তেজিত করিতেছেন—যখন আমরা চিন্তা করি যে তিনি সময়োচিত বুদ্ধির কৌশল এবং যুদ্ধের নূতন২ সন্ধান আবিষ্ক্রিয়া করিতেছেন—যখন আমরা চিন্তা করি যে তিনি বুদ্ধি বিপ্লবকারী সুঘোর সমর-প্রবাহমধ্যে শান্তিপ্রদায়িনী নিয়মপ্রণালী সংস্থাপিত করিতেছেন—তখন আমরা তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা এবং ঐশ্বরিক ভাবের প্রকাশ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হই। তাঁহার দেশীয় লোকেরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ শিবের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিত।"

পুস্তকখানি ১৮৬০ সালের বহুপূর্ব্বে রচিত বলিয়া মনে হয়।

বিদ্যাসাগরের যুগ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)—

এইবার আমরা 'বীরসিংহের সিংহশিশু' বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-পরিচর্য্যা সংক্ষেপে অনুশীলন করিব। অধুনা যে বঙ্গভাষা অনুপম শোভারাশিতে পরিশোভিতা হইয়া পাঠকগণের দর্শনেন্দ্রিয়ের তথা শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে, যে সুমধুর ভাষার সুললিত পদবিন্যাস সপ্তস্বরা বীণার তাললয় পরিশুদ্ধ ঝঙ্কারের মত ইদানীং আমাদিগের কর্ণকুহরে পীযুষধারা বর্ষণ করিতেছে, যে ভাষার ভুবনমোহিনী শক্তি ও বহু বিভূতি বিলোকনে আজ বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয় প্রভূত আনন্দরসে পরিপ্লুত, যে ভাষার ক্রমোন্নতি ও পরিবর্দ্ধমাণ অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়ে আজ যুগপৎ অপলকনেত্রে তাকাইয়া আছে,—সেই বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি-সংসাধনের নিমিত্ত, তাহার হীনবলদেহে শক্তিবারি সিঞ্চনের জন্য, পণ্ডিত প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুভক্ষণে শুভলগ্নে লেখনী ধারণ করেন। তিনিই এই নিপতিত অনাদৃত বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হইয়া সারাজীবন অবিচলিত ধৈর্য্য ও অক্লান্ত উদ্যমসহকারে ইহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালনপালন করিয়াছিলেন। ছেলেবেলা হইতে নিদারুণ দুঃখশোক-ভারাক্রান্ত অবস্থায় যে ভাষায় রোদন করিয়াছি, যে ভাষায় হাসিয়া স্নেহময়ী জননীর প্রীতিসংবর্দ্ধন

করিয়াছি, ছেলেবেলার ধূলাখেলার ও আমোদপ্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে যে ভাষা শিক্ষা করিয়াছি, যে ভাষায় কাঁদিয়া হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রাণের দুঃখকাহিনী ব্যক্ত করিয়াছি, যে ভাষার অপূর্ব্ব মোহিনীশক্তি প্রভাবে প্রাণ-মাতান চিরমধুময় পীযুষপূরিত 'মা' শব্দ আমাদের মনের নিদারুণ শোকানল নির্ব্বাপিত করিয়াছে—সেই ভাষা, আমাদের চির-প্রিয় সেই বাঙ্গালা ভাষা, বিদ্যাসাগরের অমরতুলিকাস্পর্শে নবপ্রাণ লাভ করিয়াছে। অধিক কি, তিনিই বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ই দুরূহ সংস্কৃত ভাষা হইতে অতি সুমার্জ্জিত বঙ্গভাষার সৃষ্টি করিলেন। বঙ্গভাষাকে এইরূপ গঠন করাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান কীর্ত্তি। * * *

বঙ্গসাহিত্যের প্রতি সাধারণ লোকের * * ঔদাসীন্যকালে, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ফলহীন সাহিত্যক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি দেখিলেন যে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্র অরণ্য ও কণ্টকে আবৃত; চতুর্দ্দিকে নীরসতা ও অনুর্ব্বরতার লক্ষণ পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। তিনি স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিয়া অরণ্যগুল্মাদি পরিষ্কৃত করিয়া তথায় ফলবান বৃক্ষাদি বপন করিয়া, সেই মরুসদৃশ কণ্টকাকীর্ণ প্রদেশকে একটী সুন্দর উদ্যানে পরিণত করিলেন। তিনি অমূল্য সুন্দর কোষাগার হইতে অতি মূল্যবান সুন্দর ভাবরত্নমালা সংগ্রহ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপে ব্যবহার করিলেন। এই অপূর্ব্ব অলঙ্কার নির্ম্মাণে, তাঁহার কারুকার্য্য ও দক্ষতা দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইল। তিনি হৃদয়গ্রাহী নূতন বঙ্গগদ্য সৃষ্টি করিলেন।" ‡

‡ বিদ্যাসাগরের নিকট বঙ্গসাহিত্য কতদূর ঋণী—যতীন্দ্রনাথ বসু।

বাস্তবিক বিদ্যাসাগরের ভাষা পূর্ব্বেকার ভাষা অপেক্ষা মধুর এবং প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী এবং সারগর্ভ। তাঁহার প্রথম রচনা বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে)। "এইরূপ সুমধুর পদ বিন্যাস, ভাষা ও ভাবের সমাবেশ ইতিপূর্ব্বে কোন গ্রন্থেই পরিলক্ষিত হয় নাই। রচনা বিষয়ে বেতাল সে সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। ভাষা বিষয়ে বেতালই বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ।" পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—"একমাত্র বেতাল পঞ্চবিংশতির দ্বারাই ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্যের সুদৃঢ় উন্নতিমূল স্থাপিত হইল। তখনও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশবকাল; তখনও লোকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে পারিত না, সুতরাং ইহা দৃঢ়তাসহকারে বলা যাইতে পারে যে, বেতালের তাললয়—সংযুক্ত প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ ভাষার দ্বারাই সুন্দর বঙ্গগদ্যের আদর ও উন্নতির চেষ্টা আরম্ভ হইল। বেতালে একদিকে যেমন শব্দবৈচিত্র্য অপরদিকে তদ্রূপ প্রাঞ্জলতা ও সুললিত ভাবমালার সমাবেশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বেতাল প্রকাশের সহিতই বঙ্গগদ্যসাহিত্য সম্পূর্ণ এক নূতন দিকে ধাবিত হইল। * * * বেতালে ভাবের আদিত্ব নাই, কিন্তু ইহাতে যে লালিত্য, যে বর্ণনা বৈচিত্র্য এবং সুমধুরতা আছে, তাহা তাঁহার স্বরচিত এবং তজ্জন্যই বেতাল সাধারণ লোক কর্ত্তৃক এতদূর আদৃত হইয়াছিল।"

তাঁহার 'জীবন-চরিত' বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম রত্ন। তিনি বালকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তকের অভাব দেখিয়া 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৯), 'বোধোদয়', শকুন্তলা, কথামালা, চরিতাবলী, সীতার বনবাস, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শকুন্তলা প্রকাশিত হয়। "শকুন্তলার সমাগমে বাঙ্গালা সাহিত্য এক অপূর্ব্ব

শ্রীধারণ করিল। বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে কিশোরীর বাল্যলীলায় যৌবনের নবোদয় দেখা দিল। শকুন্তলায় তাহার লিপিচাতুর্য্য রচনা-মাধুর্য্য ও পদলালিত্য দর্শনে পাঠকমাত্রেই মোহিত হইয়া গেলেন এবং চারিদিকে তাঁহার প্রশংসা বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গদ্যে মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ করেন। দুঃখের বিষয় এ গ্রন্থ তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৮৬২ সালে সীতার বনবাস প্রকাশিত হয়। "অনুবাদের ছায়া পড়িলেও ইহাকে একপ্রকার মূলগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের বিষয়গত মৌলিকতা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার না হইলেও, ভাব ও ভাষা বিষয়ে তিনিই ঐরূপ গ্রন্থ প্রণয়নের পথপ্রদর্শক।" তাঁহার সীতার বনবাস দেখিয়া পরবর্ত্তী লেখকেরা রামায়ণাদি সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার হইতে বিষয় ও বস্তু লুণ্ঠন করিয়া 'রামবনবাস', 'রামের বনগমন', 'রামের রাজ্যাভিষেক' প্রভৃতি বহুপুস্তক রচনা করিয়া বিপুল খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। সীতার বনবাস সাহিত্য জগতে ও গৃহস্থের গৃহে এক দুর্লভরত্ন। জানকী চরিত্র হিন্দুমহিলার চিরদিনের আদর্শ চরিত্র। সেই জানকী চিত্র বিদ্যাসাগরের অমর-তুলিকা-সাহায্যে বঙ্গভাষায় চিত্রিত হওয়াতে বাঙ্গালার নারীদের সকলেরই পাঠের সুবিধা হইল। সীতার মত স্বামী-ভক্তিপরায়ণা রমণী অন্য কোন জাতির সাহিত্যে দেখা যায় না। মহারাজ রামচন্দ্রের মহিষী, রাজর্ষি জনকের দুলালী কন্যা, চতুর্দ্দশবৎসর বন-বাসের পর গৃহ-প্রত্যাগতা, আসন্নপ্রসবা জানকী—সেই জানকীর চরিত্রগত অপবাদ লোকমুখে শ্রবণমাত্র, রাজা নির্ব্বিচারে তাঁহাকে একেবারে বনবাসে পাঠাইলেন। তখনও কিন্তু সীতার পতিভক্তি অচলা, তখনও সীতা বলিতেছেন—

কল্যাণ বুদ্ধেরথবা তবায়ং
ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
মমৈব জন্মান্তর পাতকানাং
বিপাক বিস্ফূর্জ্জথুর প্রসহ্যঃ॥

*   *   *

সাহং তপঃ সূর্য্যনিবিষ্ট দৃষ্টি-
রূর্দ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি
ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রযোগঃ॥

এ সীতার কাহিনী শুধু বিষাদ কাহিনী, শুধু চির নির্ম্মল, চিরপবিত্র ত্যাগের কাহিনী; ইহাতে ভোগের গন্ধ নাই, বিলাসের লেশ নাই। এই অপূর্ব্ব সতীচিত্র মহর্ষি বাল্মিকী তাঁহার অমৃতবর্ষিণী তুলিকা সাহায্যে চিরজীবন্ত করিয়া গিয়াছেন। সীতার চিত্র আজিও বাঙ্গালীর গৃহের আদর্শ স্ত্রীচিত্র। এই চিত্রই আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর অন্তঃপুরকে শুদ্ধ ও পবিত্র রাখিয়াছে। বিজাতীয় সভ্যতার বিলাসকলাপূর্ণ স্রোতের ঢেউ বার বার আমাদের অন্তঃপুরে আঘাত করিয়াও আজ পর্য্যন্ত আমাদের এ আদর্শ রমণীচিত্র ভাসাইয়া দিতে পারে নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া উক্ত জানকীচিত্রের উপর যে সমস্ত ধূলিকণা সঞ্চিত হইয়াছিল আমাদের শুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের পবিত্র ব্যজনে সেই ধূলিরাশি অপসারিত হওয়ায় যা জানকীর 'বহ্নৌ বিশুদ্ধা' পবিত্র মূর্ত্তি প্রত্যেক বাঙ্গালীর চিত্তপটে আবার যেন নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। তাই আজ আমাদিগের বাঙ্গালীর গৃহের প্রত্যেক মহিলাকে বলছি—এসো মাতা, এসো ভগ্নি, এসো কন্যা,—এসো ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শুদ্ধান্তঃকরণে

একবার এই রাজনন্দিনী, রাজস্নুষা, রাজমহিষী সীতার চিত্রের দিকে তাকাও, ঐ শোন—রাজ্যের পালনকর্ত্তা, নিজ জীবিতেশ্বর কর্ত্তৃক নিবিড় অরণ্যে নির্ব্বাসিতা হইয়াও, তিনি বলিতেছেন, তিনি তোমাদের শিক্ষা দিতেছেন—

পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ।
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ॥

* * *

নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা॥

* * *

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ॥

* * *

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্॥

এইজন্যই পূর্ব্বোক্ত যতীনবাবু সীতার বনবাসকে বিদ্যাসাগরের 'গৌরব নিশান' আখ্যা দিয়াছেন। আবার পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন "বিদ্যাসাগর রচিত সীতার বনবাসকে অনেকে 'কান্নার জোলাপ' কহে।" এখনও অনেকে স্ব স্ব গৃহের মহিলাগণকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ', 'মডেল ভগিনী' বা 'ঘরে বাইরে' পড়িতে না দিয়া 'সীতার বনবাস' বা 'শকুন্তলা' সাদরে পাঠ করিতে দিয়া থাকেন।

বিদ্যাসাগরের রচনানৈপুণ্যের আর একটী প্রধান বিশেষত্ব এই যে তিনি যে তুলিকা সাহায্যে বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস

প্রভৃতি রচনা করিয়া ভাষার পরিপুষ্টি ও মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন সেই তুলিকা দিয়াই 'বিধবা বিবাহ', 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না' প্রভৃতি সামাজিক ও স্মৃতি বিষয়ক গভীর গবেষণাপূর্ণ রচনাদ্বারা বঙ্গসাহিত্যের গৌরববর্দ্ধন ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন,—আবার সেই তুলিকা দিয়াই সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠোপযোগী বর্ণ-পরিচয়, বোধোদয়, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি রচনাদ্বারা বালকদিগের জন্য বাঙ্গালা শিক্ষার সোপান চিরদিনের জন্য তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন। শুধু বর্ণপরিচয় হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভূত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময়ে সাধারণ লোকের অজ্ঞতাপ্রযুক্ত বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে তেমন চর্চ্চা হইত না। তাহার কারণ, তখন শিশুগণের শিক্ষার উপযোগী তেমন ভাল পুস্তকই ছিল না। বর্ণপরিচয় প্রকাশ করাতে লোকের সে অভাব বিদূরিত হইল।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বিদ্যাসাগরের রচনায় তাদৃশ মৌলিকতা নাই। শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতি আংশিকভাবে অনুবাদ হইলেও উহাতে বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিদ্যাসাগরের আরও অনেক গুণ ছিল। তাঁহার অসীম দয়া দেখিয়া সে সময়ে সকলে তাঁহাকে 'দয়ার সাগর' বলিতেন। উপরন্তু বিদ্যাসাগর বঙ্গসাহিত্যের আর এক বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন; তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় বিরাম যতির ব্যবহার ছিল না। তিনিই প্রথম বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরাম যতির ব্যবহার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন লেখকেরই রচনায় , ; : ! ? প্রভৃতি যতি চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। ইহারও নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট অশেষ পরিমাণে ঋণী।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি অন্যান্য সৎকার্য্যের দ্বারা নিজেকে যশস্বী নাও করিতেন, তথাপি কেবলমাত্র বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির দ্বারা তাঁহার নাম বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত। তিনি মৌলিকভাব পূর্ণ পুস্তক অধিক প্রণয়ন করেন নাই বটে, কিন্তু কেবলমাত্র অনুবাদ ও ভাব-সংগ্রহের দ্বারা তিনি বঙ্গভাষাকে এমন পরিমার্জ্জিত করিয়া গিয়াছেন, যে তাঁহার পূর্ব্বে কেহ সেরূপ পারেন নাই, ভবিষ্যতে কেহ পারিবেন কি না সে বিষয়েও ঘোর সন্দেহ আছে। * * প্রকৃত সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি কেবল স্বদেশীয় সংস্কৃত ভাষা হইতে নহে পরন্তু বিদেশীয় ইংরাজী সাহিত্য হইতেও ভাবসমূহ সগ্রংহ করিয়া বঙ্গভাষাকে সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং স্বদেশীয় সামাজিক কুরীতির বিনাশ মানসে বিধবা-বিবাহ ও বহু বিবাহ সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সমাজের বহু উপকার করিয়া গিয়াছেন।

আরও তিনি যে সময় সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন, সে সময় বঙ্গসাহিত্যের পরিবর্ত্তনের সময়। * * * সাধারণ লোকে—এমন কি বিদ্বান লোকেও ইংরাজী শিক্ষার দিকে এতদূর আকৃষ্ট ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তন্নিবন্ধন এতদূর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল যে, তৎকালে পুরাতন সংস্কৃত ভাষা বা মৌলিক বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। * * * তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত এক মধ্যপথ অবলম্বন করিলেন। সংস্কৃত হইতে ভাবমালা লইয়া তিনি শকুন্তলা, সীতার বনবাস ইত্যাদি প্রণয়ন করিলেন; হিন্দি হইতে বেতালপঞ্চবিংশতি ও ইংরাজী হইতে বঙ্গের ইতিহাস, বোধোদয়, ভ্রান্তিবিলাস, কথামালা ইত্যাদি রচিত হইল। * * * হইতে পারে, স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় বঙ্গগদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু বর্ত্তমান কালের 'বিদ্যাসাগরী ভাষার'

স্থষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়। * * * তাঁহাকে সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের ঠিক পিতৃসদৃশ না বলিলেও তাঁহাকে ইহার পরিপোষণকর্ত্রী মাতা বলা যাইতে পারে। তাঁহারই যত্নে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের বর্ত্তমান সুমার্জ্জিত ও নির্ম্মল অবস্থা।

প্রায় সকল দেশের ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে নিপুণ উৎকৃষ্ট লেখক কখন কোন দেশে একা দেখা দেন না। ইংলণ্ডেও Golden age of English Literature ছিল; গ্রীস রোমেও তাই। সংস্কৃতে বিক্রমাদিত্যের সময়ও তাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে, দেখিতে গেলে, বিদ্যা-সাগরের সময় হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত কালকে Golden age of Bengali Literature বলা যাইতে পারে। কারণ, দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সঙ্গে বা কিছু পরে পরেই অনেকগুলি সাহিত্য-রথী বিভিন্ন বিষয় লইয়া বঙ্গসাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সাধারণ গদ্যসাহিত্যে বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি, বৈজ্ঞানিক ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ লইয়া অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি, সামাজিক ও পারিবারিক প্রবন্ধ লইয়া ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, ধর্ম্মমূলক ও ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ লইয়া রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি, ধর্ম্ম গ্রন্থানুবাদ ও সামাজিক বিদ্রূপাত্মক রচনা লইয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লইয়া রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি, প্রত্ন-তত্ব লইয়া রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি, পদ্য-কাব্য, নাটকাদি ও সামাজিক শ্লেষাত্মক কবিতাদি লইয়া মাইকেল দীনবন্ধু, রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি, ভাষা-তত্ব লইয়া রামগতি ন্যায়রত্ন, গভীরভাব ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লইয়া কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বিদ্রূপাত্মক সামাজিক সমালোচনা লইয়া ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভৃতি এবং সর্ব্ববিষয়িণী রচনার ডালি লইয়া সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষার চরণকমলে অর্চ্চনাঞ্জলি দিয়াছিলেন।

যেমন কোন রমণীর গাত্রের রং শুধু গৌরবর্ণ হইলে হয় না, চোক মুখের গড়ন ভাল চাই, কাপড়চোপড় চাই, উপরন্তু গা সাজানো অলঙ্কারাদিও চাই;—তবে সে রমণীকে অনিন্দ্যসুন্দরী দেখাইবে বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী যে সব সাহিত্যিকের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইল তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি যে বিষয়ে নিপুণ ও সিদ্ধহস্ত তিনি সেই বিষয়ক রচনারূপ অলঙ্কারাদি লইয়া বঙ্গভাষা-সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গে যথাবিধি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দেন; ফলেআমরা বঙ্কিমের সময়ে বঙ্গভাষার অনিন্দ্যসুন্দরী মোহিনীমূর্ত্তি দেখিতে পাই।

এক্ষণে আমরা বিদ্যাসাগরের যুগের উল্লিখিত সাহিত্যসেবিগণের বিষয়ে সংক্ষেপে অনুশীলন করিব।

দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়(১৮২০-১৮৮৫)—

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে ইনি অন্যতম; ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত, গীতমঞ্জরী, আত্মজীবন-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। বর্ত্তমান যুগের প্রসিদ্ধ নাটককার ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইঁহার সুযোগ্য পুত্র। ইঁহার ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত বাঙ্গালা ভাষায় এক মূল্যবান পুস্তক। ইহাতে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

মহারাজ মহাতাব চান্দ (১৮২০-১৮৭৯)—পরম সাহিত্যা-মোদী বর্দ্ধমানের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা মহাতাব চান্দ বাহাদুর তাঁহার সভাপণ্ডিত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের মুখে মহাভারতের ব্যাখ্যা শুনিয়া সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশে অভিলাষী হন, এবং

অবিলম্বে তজ্জন্য পণ্ডিতমণ্ডলী নিযুক্ত করেন। বলা বাহুল্য এই অনুবাদ-কার্য্যে তাঁহাকে বিপুল অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় তিনি তাঁহার এই বিরাট সদনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। "বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে কেবলমাত্র মহাভারত নহে, হরিবংশ এবং রামায়ণের বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান রাজবাটীর এ কীর্ত্তি এ দেশে চির প্রতিষ্ঠিত রহিবে।"

দ্বারকানাথ বিদ্যাভুষণ (১৮২০-১৮৮৪)—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—নীতিসার দুইভাগ, রোম ও গ্রীসের ইতিহাস, ভূষণসার নামে বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বিশ্বেশ্বর বিলাপ প্রভৃতি রচনা করেন। ইনি সোম প্রকাশের সম্পাদক ছিলেন। "বাঙ্গালা ভাষায় সুপদ্ধতিক্রমে ও সুরুচি সহকারে সংবাদ পত্র প্রচার-প্রথা ইনি প্রথমে দেখাইয়া দেন।" ‡ সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "সোমবার আসিলেই লোকে সোমপ্রকাশ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তি-যুক্ততা, তেমনি নীতির উৎকর্ষ। * * * 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদন বিষয়ে অক্ষয় বাবুর চিত্তের অদ্ভুত একাগ্রতার অনেক গল্প শুনিয়াছি; আর সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়াছি; তাহার অনুরূপ সমগ্র হৃদয়মনের একীভাব আর কখনও দেখি নাই।" "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত যেমন বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেইরূপ বাঙ্গালা সংবাদপত্রের জন্মদাতা। এজন্য এদেশের লোক চিরদিন ইহার নিকট ঋণী থাকিবেন।" ‡

‡ দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)—দরিদ্রের সন্তান অক্ষয়-কুমার দত্ত বলবতী জ্ঞানপিপাসা লইয়া দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করতঃ বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের যথেষ্ট পরিপুষ্টি সংসাধন করেন। পরে দেখিব—৺রজনীকান্ত গুপ্তও অক্ষয়কুমারেরই মত দারিদ্র্যের সহিত আজীবন কঠোর সংগ্রাম করিয়া সাহিত্য পরিচর্য্যা করিয়া গিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার রচিত চারুপাঠ তিনখানি আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই শিক্ষার জিনিষ, অক্ষরজ্ঞানের ভাণ্ডার। ভাষা হিসাবে বালকের নিকট জ্ঞানপ্রদ, বিজ্ঞানতত্ত্ব হিসাবে সকলের শিক্ষার জিনিষ। তাঁহার যেরূপ বুদ্ধি-প্রাখর্য্য, গবেষণাকৌশল ও বিচার নৈপুণ্য, তাঁহার রচনাও তদ্রূপ ওজস্বিনী, গাম্ভীর্য্যময়ী ও চিত্তচমৎকারিণী। "তিনি কল্পনার শরণাপন্ন হইলেন, কল্পনা তাঁহার প্রশস্ত মনোমন্দির অপূর্ব্ব ভাবরাশিতে সজ্জিত করিল। তিনি প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, প্রকৃতি তাঁহাকে যত্নসহকারে আপনার কার্য্যকারণ পরম্পরায় সহিত সুপরিচিত করিয়া দিল; তিনি অতীত বিষয়ের পরিচিন্তনে অগ্রসর হইলেন, অতীত যেন বর্ত্তমানের ন্যায় সমুজ্জ্বলভাবে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইল; তিনি আত্মাবিষয়ে উপদেশ সংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন, উপদেশগুলি যেন চির-পরিচিত বন্ধুর ন্যায় অবলীলাক্রমে তাঁহার মানসপথে উদিত হইতে লাগিল।" ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, পুরাবৃত্ত ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে সন্তোষবিধায়িনী রচনা লিখিয়া তিনি পাঠকবর্গের চিত্ত-চমৎকৃত করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার একজন বিশিষ্ট প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাপন্ন লেখক ছিলেন। রজনীকান্ত গুপ্ত বলিয়াছেন—"তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার ইতিহাস যখন স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয় তখন

শাস্ত্রনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যানুরাগের সহিত অক্ষয়কুমারের সেই—গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, সেই যুক্তিবিন্যাসচাতুরী ও সর্ব্বোপরি সেই দীপ্তিময় বহ্নিস্তূপের ন্যায় ভাষার অপূর্ব্ব ওজস্বিতার সমক্ষে হৃদয় অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আনত হইয়া উঠে। * * * অক্ষয়কুমার বিদেশীয় সাহিত্যভাণ্ডার হইতে বর্ণনীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই বিষয় তাঁহার অনুসন্ধানগুণে যেন নবীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যে বিষয়ের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই বিষয়েই নিগূঢ়তত্ত্ব নিরূপণে যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন। * * বিজ্ঞানের নিগূঢ়তত্ত্বের নিরূপণ, তাঁহার বিশুদ্ধ আমোদের মধ্যে পরিগণিত ছিল।”

এক্ষণে বাঙ্গালাভাষায় ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সরল মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিষয়ে কতই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সে সময়ে অক্ষয়কুমারই এই ধরণের পুস্তক প্রথমে লেখেন। ইহার প্রথম রচনা বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার দুইভাগ; তৎপরে চারুপাঠ তিনভাগ। শেষ জীবনে অক্ষয়বাবু ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ দুইভাগ উল্লেখযোগ্য; উহাতে তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বাধীন গবেষণা অনুসন্ধিৎসা ও সারগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেকের মতের অনৈক্য থাকিতে পারে। বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম্মের উপর তাঁহার সমধিক ভক্তি বা আস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত রচয়িতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—“বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং বাবু অক্ষয়কুমারের রচনা হইতে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে

তাঁহাদিগের মাতৃভাষা অনাদরের সামগ্রী নয়, ক্ষমতাবান লেখকের হস্তে তাহা অসাধারণ শক্তিবিকাশ করিতে পারে। * *

বাঙ্গালা ভাষার পিতৃস্থানীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সমবেত যত্নে, বাঙ্গালা সাহিত্যের এক বিভাগে অর্থাৎ গদ্যাংশে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইয়াছিল।"

কবি যথার্থই বলিয়াছেন, অক্ষয়কুমারকে পাইয়া বঙ্গভাষা সগর্ব্বে বলিতে পারিতেন—

কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার,
পেয়েছি কপালগুণে অক্ষয়কুমার।

শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার 'বঙ্গবাণী'তে লিখিয়াছেন: "বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারই [প্রথম] বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত আদর্শে সুমার্জ্জিত এবং সুগঠিত করিয়া আগামিনী প্রতিভার উপযুক্ত রঙ্গভূমিরূপে রাখিয়া গিয়াছেন।"

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১)—ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সি, আই, ই—প্রাকৃতিক ভূগোল, শিল্পিকদর্শন, পত্র কৌমুদী, ব্যাকরণ প্রবেশ, মিবারের ইতিহাস, শিবাজীর জীবনী, রহস্যসন্দর্ভ ও বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। যে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান বিষয়ে এক্ষণে এত আগ্রহ, এত যত্ন দেখা যাইতেছে রাজেন্দ্রলাল তাহার পথপ্রদর্শক। প্রত্নতত্ত্বালোচনা বিষয়ে ইনিই অগ্রণী, ইনিই প্রথম উৎসাহদাতা।

কালীকৃষ্ণ মিত্র (১৮২২-১৮৯২)—কৃষিবিদ্যা বিষয়ে ইহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক অনুরাগ ছিল। লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া আদর্শ উদ্যান স্থাপন করিয়া ইনি পাশ্চাত্য

প্রণালীতে কৃষক ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে কৃষি বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেন। ইনি বিধবা বিবাহ, কৃষি-বিদ্যা, স্ত্রীশিক্ষা, মাদক নিবারণ, গার্হস্থ্য ব্যবস্থা ও শিশুচিকিৎসা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত ইহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)—মাইকেল মধুসূদন ইনি এইযুগের একজন অসাধারণ প্রতিভাবান লেখক। গদ্যসাহিত্যে যেমন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার নূতন যুগের সৃষ্টি করেন, পদ্যসাহিত্যে সেইরূপ মাইকেলও এক অপূর্ব্ব নূতন যুগের সৃষ্টি করেন। বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের ইনিই প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা। অবশ্য, ইহার জন্য কবিকে প্রথম প্রথম প্রভূত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কাব্য বা পদ্য-সাহিত্য আমাদের এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। তবে, মাইকেলের নাম এ প্রবন্ধে উল্লেখ করিবার দুইটী কারণ আছে; প্রথম, তিনি যে নব-যুগের সৃষ্টি করেন তাহা শুধু বাঙ্গালা পদ্যসাহিত্যের বা কাব্যের নহে, সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের। 'প্রদানিল', 'উত্তরিল', 'মর্ম্মরিল', 'নির্ম্মিল', 'পীড়িল', 'স্বনিল' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ তিনিই প্রথম বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহার করেন। ইহার জন্য তাঁহার উপর চারিদিক হইতে যথেষ্ট শ্লেষোক্তি বর্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সে সময় মৌনভাবে সমস্ত সহ্য করিয়াছিলেন। প্রতিভাবান লেখকমাত্রেই কিছু না কিছু নূতনত্ব আমদানি করেন যাহার জন্য তাঁহাকে পরে শ্লেষোক্তিবর্ষণ মাথা পাতিয়া লইতে হয়। কিন্তু প্রতিভাবান লেখক সে শ্লেষোক্তি গ্রাহ্য করেন না। রবীন্দ্রনাথকেও যথেষ্ট তীব্র শ্লেষোক্তি সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু অধুনা রবীন্দ্রনাথের ভাষাই আদর্শভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মধুসূদন বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টিকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ 'হেক্টর বধ' (১৮৭০) নামে তাঁহার একখানি গদ্যগ্রন্থও ছিল; তবে এখানিতে তাঁহার লেখক বা সাহিত্যিক নামের গৌরব বৃদ্ধি না করিয়া বরং হ্রাস করিয়াছে। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এ খানিকে একখানি 'সামান্য অকিঞ্চিৎকর পুস্তক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন, 'গদ্য রচনা মধুসূদনের প্রতিভার উপযোগী ছিল না।" তবে ইঁহার নাম বর্তমান প্রবন্ধে আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই নিমিত্ত যে, এই মাইকেল এককালে 'পৃথিবী' শব্দ শুদ্ধভাবে লিখিতে অসমর্থ হইয়া সহাধ্যায়ী স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে (বাঙ্গালা ভাষার উপর অবজ্ঞাচ্ছলে সাহেবী ঢঙে) বলিয়াছেন 'Oh no, it must be প্র—থি—বী'; এই মাইকেল বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উঠিলেই সাতিশয় অবজ্ঞার সহিত বলিতেন, "বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল"; আর এই মাইকেল উত্তরকালে এমন 'মধুচক্র' রচনা করিয়াছিলেন—

'গৌড়জন যাহে
আনন্দে [করিছে] পান সুধা নিরবধি'

আবার এই মাইকেলই বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে এই সনেট রচনা করিয়াছিলেন—

'হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!
* * * পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপখনি, পূর্ণ মণিজালে।'

এ পরিবর্ত্তন কি অভাবনীয় নয়? পূর্ব্বোক্ত বাবু কুমুদনাথ দাস লিখিয়াছেন—"Before his death, he wrote a Bengali prose translation of Homer's Iliad and a half finished Bengali drama—Mayakanana—which bear marks of a completely spent-up genius. * * * It is in Madhusudan's writings that we first meet with that virile aud all-round influence of the Western Literature upon the Eastern, an influence which has shaped the destiny and guided the tendencies of the Bengali language and has been instrumental in its phenomenally rapid development."

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী (১৮২৫-১৮৮৬)—প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী বয়সে কিঞ্চিৎ ছোট হইলেও বিদ্যাসাগরকে ইংরেজী পড়াইতেন এবং তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা পরি ভাষায় পাটীগণিত ও বীজগণিত লিখিয়াছিলেন। গণিত বিষয়ক বাঙ্গালা পরি ভাষা ব্যবহারে ইনিই অগ্রগামী ও পথপ্রদর্শক। গণিত, জ্যোতিষ এবং ইংরেজী সাহিত্যে ইঁহার সমধিক ব্যুৎপত্তি ছিল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪)—ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইনি মাইকেলের সহাধ্যায়ী। শিক্ষিত বংশেই ইঁহার জন্ম; বাল্যকাল হইতেই ইনি অসাধারণ মেধা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইনি সারাজীবন শিক্ষাবিভাগেই অতিবাহিত করেন এবং উত্তরকালে শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

তিনি যৎকালে শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত ছিলেন তৎকালে ছাত্রদিগের পাঠের জন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ড, পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস, ইউক্লিডের জ্যামিতি তৃতীয় অধ্যায়, ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রভৃতি রচনা করেন।

শিক্ষাবিভাগে সারাজীবন কাটাইয়া তিনি যে শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহাতে শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক উৎকৃষ্ট উপদেশ আছে। তাঁহার 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' অনুবাদের ছায়া পড়িলেও উহাতে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানিতে স্থানে স্থানে ইতিহাসোক্ত ঘটনার ব্যত্যয় ঘটিলেও উপন্যাস হিসাবে বড় সুন্দর হইয়াছে। যে উপন্যাসরাশি রচনা করিয়া বঙ্কিমবাবু অতুল যশ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, ভূদেবের এই উপন্যাস সেই শ্রেণীর প্রথম উদ্যম হইলেও সফলকাম হইয়াছে—বলিতে হইবে। ইহাতে বর্ণিত দিল্লীর প্রাসাদ, সাজাহানের ময়ুর সিংহাসন, শিবাজীর স্বদেশ-প্রীতি আওরঙ্গজেবের ধূর্ত্ততা, রামদাস স্বামীর শিষ্য-বাৎসল্য, বিশেষতঃ সম্রাট-নন্দিনী রোশীনারার 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' চিত্র—বঙ্কিমের চিত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। এতদ্ব্যতীত ভূদেব পুষ্পাঞ্জলি, পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গভীর গবেষণাপূর্ণ সারগর্ভ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধে কয়খানি সংস্কৃত নাটকের সুন্দর সমালোচনা দেখিতে পাই। "সাহিত্য ক্ষেত্রে ভূদেব সমালোচক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বজ্ঞ এবং ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ। তিনি সুকুমারমতি শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার জন্য কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার, ঐতিহাসিক উপন্যাসেও তদীয় লিপিচাতুর্য্য ও বর্ণনা বৈচিত্র্য পরিস্ফুট

হইয়াছে ; কিন্তু সাহিত্য সংসারে ভূদেব ইহা অপেক্ষাও অধিকতর কর্ম্মপটুতা ও সারগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। মধুসূদন ও ভূদেব দুই জনেই হিন্দু সন্তান, দুইজনেই সমসাময়িক, দুইজনেই সহাধ্যায়ী এবং দুইজনেই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন ; কিন্তু একই শিক্ষার যে একই ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষে ফলের ইতর বিশেষ ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। মধুসূদন যাহার বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া উন্মার্গগামী হইয়াছিলেন ; মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ভূদেব তাহার আকর্ষণে স্খলিত পদ হ'ন নাই। মধুসূদন জাতীয়ভাব পদদলিত করিয়াছেন ; ভূদেব জাতীয় ভাবের প্রাধান্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। একের প্রতিভা বিজাতীয় ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া, স্বদেশের চিরারাধ্য. চিরপ্রসিদ্ধ চরিত্রের হীনতা ঘটাইয়াছে ; অপরের প্রতিভা স্বদেশের বিশ্বজনীন উদার ভাব নিচয়ের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে।" কুমুদ বাবু বলিয়াছেন He might well be called the Addison of Bengal.

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০)—

রাজনারায়ণ বসু মাইকেলের পরম বন্ধু ছিলেন। ইতি ব্রাহ্ম হইলেও হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী ছিলেন না। ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা ১ম ও ২য় ভাগ, ব্রহ্মসাধন, হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা ১ম ও ২য় ভাগ, সেকাল আর একাল, হিন্দু ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত, বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, আত্মচরিত, গ্রাম্যোপাখ্যান প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা সে সময় বাঙ্গালা সাহিত্য যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৩)—

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর—কবি বা নাটককার বলিয়া বিশ্রুত

হইলেও, ইহার কিঞ্চিৎ গদ্য রচনাও আছে; সেই স্বল্প গদ্য রচনা হিসাবেই এ প্রবন্ধে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইল। মাইকেলের গদ্যরচনা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে ইহার সম্বন্ধেও ঠিক তাহা বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধু যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ, পোড়া মহেশ্বর প্রভৃতি গদ্য উপন্যাসগুলি না লিখিলে বোধ হয় ভালই হইত। স্থানে স্থানে উৎকট সমাস ভারে নিপীড়িত তাঁহার গদ্য রচনাগুলি আমরা বিশেষ প্রশংসনীয় বা উল্লেখযোগ্য মনে করি না। তবে তিনি সমাজ-সংস্কার কল্পে যে চাবুক উত্তোলিত করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা তৎকালে মহদুপকার সংসাধিত হইয়াছিল। দীনবন্ধু খুব রসিক লোক ছিলেন। "তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অনেক খোসগল্প সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেইগুলি পুস্তক মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন। সেরূপ করায় অনেক স্থলেই মধুর হইয়াছে সন্দেহ নাই।" ইহার রচনাতে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার দোষগুণ খুব বেশী পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। হাস্যরসে দীনবন্ধুর সমকক্ষ লেখক বাঙ্গালাভাষায় বিরল।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন (১৮৩০-১৮৮৫)—

তারাশঙ্কর তর্করত্ন ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা রচনা করিয়া হেয়ার সাহেবের Prize Fund হইতে পুরস্কার লাভ করেন। ইনি ১৮৫৪ সালে কাদম্বরী ও ১৮৫৯ সালে রাসেলাস— এই দুই খানি দুই ভাষার অতি কঠিন পুস্তককে—অতি যোগ্যতার সহিত সুললিত বাঙ্গালায় অনূদিত করেন। ইঁহার কাদম্বরী সীতার বনবাসের পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। ইতিপূর্ব্বে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শোভাবাজারের বিদ্যোৎসাহী রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরও জনসনের রাসেলাসের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন।

রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪)—

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস (১৮৫৮), বস্তু বিচার, বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথমভাগ (১৮৫৯), রোমাবতী (১৮৬২), দময়ন্তী (১৮৬৯), মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ (১৮৭২), রামচরিত (১৮৮১), নীতিপথ (১৮৮২), বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—ইঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আজকাল দীনেশবাবু প্রমুখ লেখকগণ এই শ্রেণীর গ্রন্থ অনেক লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন; কিন্তু রামগতির এ গ্রন্থ অনেক আগেকার; সুতরাং এই গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাকে বিপুল পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। ভাষা ও সাহিত্যা-মোদিদিগের নিকট ইহা একখানি বড় মূল্যবান পুস্তক; ইহার রচনা-প্রণালীও বিশেষ প্রশংসনীয়। অধুনা বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইলেও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সেই পুরাতন গ্রন্থ আজিও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। পণ্ডিত রামগতির মৃত্যুর পর ইঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় বি, এল, এই পুস্তকের কলেবর পরিবর্দ্ধিত করিয়া নূতন সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছেন।

যে সময়ে ভারতবর্ষের ভাল ইতিহাসের অভাব দেখিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতবর্ষের একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন করেন, ইহার পরে ইনি গোষ্ঠী কথা রচনা করেন। অতঃপর ভূদেব বাবুর উৎসাহে সংস্কৃত মহাবীর চরিত বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন; পুস্তকখানির নাম দেন রামচরিত, এবং ভূদেব বাবুর নামেই উৎসর্গ করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শিশুপাঠ্য নীতিপথ রচনা করেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বাঙ্গালায় একখানি উপন্যাস রচনা করেন; সেখানির নাম "ইলছোবা" বা স্বপ্নলব্ধ উপাখ্যান। পুস্তকখানি উপন্যাস হিসাবে বঙ্কিমের কোন উপন্যাসের সমতুল না হইলেও, ইহার ভাষা "প্রাঞ্জল ও বিশদ"।

ব্রহ্মমোহন মল্লিক (১৮৩২—?)—ইনি রণজিৎসিংহের জীবনী, ইউক্লিডের জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি প্রণয়ন করেন। ইতিপূর্ব্বে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষায় জ্যামিতি লিখিলেও, ব্রহ্মমোহন বাঙ্গালা ভাষায় জ্যামিতি শাস্ত্র বিষয়ক অনেক নূতন সুষ্ঠু পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—যাহা তাঁহার দ্বারাই প্রথম উদ্ভাবিত হয়।

সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯)—

সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমের অগ্রজ; ইঁহার রচনা মাধবীলতা, কণ্ঠমালা, জালপ্রতাপ চাঁদ, পালামৌ, রামেশ্বরের অদৃষ্ট, দামিনী প্রভৃতি। ইঁহার রচনা বঙ্কিমের তুল্য না হইলেও নিতান্ত অপকৃষ্ট নহে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৩৫-১৮৯০)—

তখনকার দিনে ধনী লোকেরা বিদ্যাশিক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ ধনীর সন্তান হইয়াও শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, সাহিত্যামোদীও ছিলেন। তিনি বিপুল অর্থব্যয়ে ও বহু পণ্ডিতের সহযোগিতায় মূল সংস্কৃত মহাভারতের বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং বিদ্বজ্জন মণ্ডলীকে তাহা বিনামূল্যে বিতরণ করেন। কলিকাতা শোভাবাজারের স্বনামধন্য স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব ব্যতিরেকে ইতিপূর্ব্বে কেহ শিক্ষা বিস্তার বিকল্পে

ঈদৃশ বহু অর্থ ব্যয় ও বিপুল কষ্ট স্বীকার করেন নাই। আজ পর্য্যন্ত কালীপ্রসন্নের মহাভারতই মূল সংস্কৃত মহাভারতের সরল, প্রাঞ্জল ও শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক অনুবাদ। "যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার এ কীর্ত্তি চিরোজ্জ্বল রহিবে!" এতদ্ব্যতিরেকে কালীপ্রসন্নের হুতোম পেঁচার নক্সা তৎকালীন সমাজের একখানি উৎকৃষ্ট নক্সা। ইহার দ্বাদশ গোপাল প্রভৃতি যিনি একবার মাত্র পড়িয়াছেন, তিনি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। বলা বাহুল্য, এ প্রবন্ধে আমরা তাঁহার সাহিত্য রচনাশক্তির অনুশীলন করিতেছি, তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের বা অন্য মনোবৃত্তির নহে। ইনি কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটক নিজে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া নিজ বাড়ীতে প্রথম অভিনয় করান। বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের তিনি একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৩৬-১৮৮৯)—গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ সমুচ্চয়ের যথাযথ বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গ ভাষার পরিপুষ্টি সংসাধন করেন। অধুনা বঙ্গ ভাষায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে;—ইনিই তৎসমুদয়ের পথ প্রদর্শক। ইহার চিকিৎসাপ্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব১ম ও২য় খণ্ড—চিকিৎসা বিষয়ে বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ; ইঁহার অন্য রচনা শারীর বিদ্যা, মাতৃশিক্ষা ইত্যাদি। বঙ্গের গৌরব সরস্বতীর বরপুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইঁহারই পুত্র।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (১৮৩৬-১৯১০)—চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার—শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপের বক্তৃতা, ৫ ভাগ,

কুসুমাঞ্জলি, চন্দ্রবংশ চন্দ্রালোক, উদ্বাহ চন্দ্রালোক, শুদ্ধি চন্দ্রালোক, শিক্ষা প্রভৃতির রচয়িতা।

চন্দ্রশেখর বসু (১৮৩৭-১৯১৭)—চন্দ্রশেখর বসু প্রলয়তত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, বেদান্ত প্রবেশ, বেদান্ত দর্শন, সৃষ্টি, অধিকার তত্ত্ব, বক্তৃতা-কুসুমাঞ্জলি, হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ প্রভৃতির রচয়িতা। বাঙ্গালায় আধ্যাত্মিক বিষয় রচনার জন্য ইঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি। ইঁহার সমস্ত পুস্তকই শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম ক্রিয়া ও ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক। এই সকল গ্রন্থ বিস্তর রাজা, মহারাজা, জমীদার, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্যান্য ভদ্রলোককে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

হরিমোহন প্রামাণিক (১৮৩৮-১৮৭৩)—

ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ শীর্ষক একখানি অতি মূল্যবান পুস্তক প্রণয়ন করেন।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)—

বাঙ্গালা ভাষায় কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি ভক্তিরসাপ্লুত। 'বিধান ভারত', "নবসংহিতা", 'জীবন বেদ" 'সেবকের নিবেদন' প্রভৃতি কেশবচন্দ্রের রচনা; এতদ্ভিন্ন 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'সুলভ সমাচার' নামক দুইখানি সাময়িক পত্রের ইনি প্রকাশক। ইনি 'অশোক-চরিত' নামে একখানি বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ইনি বঙ্কিমের সমসাময়িক ছিলেন। "বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। ইনি বাঙ্গালাভাষার শ্রীবৃদ্ধি-কারিদিগের একজন অগ্রগণ্য।" ‡

‡ দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)—

এইবার আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের বিষয় অনুশীলন করিব। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগরের পর সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী,—কবিতা, সাধারণ সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, পুরাণ, **উপন্যাস**— এমন কোন বিষয় নাই যাহা লইয়া বঙ্কিম কিছু না কিছু রচনা করেন নাই।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত 'বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "ঈশ্বর গুপ্ত যে গদ্য প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহা প্রাণশূন্য, বলশূন্য। তাঁহার কবিতার ন্যায় সে ভাষা আড়ম্বর অনুপ্রাসভারে পীড়িত, শব্দের শৃঙ্খলে বদ্ধ, অপরিস্ফুট, বেগশূন্য। প্রথম অভাব ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর মোচন করিলেন। গদ্যে প্রসন্নতা, নির্ম্মলতা জন্মিল। আর একদিকে অক্ষয় কুমার দত্ত ভাষার এই গুরুতর অভাব মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই দুইজন লেখক অসাধারণ ক্ষমতাশালী; কিন্তু অনুবাদেই তাঁহাদের ক্ষমতা পর্য্যবসিত হইল। মৃণ্ময়ী প্রতিমা গঠিত

হইল মাত্র; প্রতিমার অলঙ্কার, প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা, সমস্তই অবশিষ্ট রহিল। প্যারীচাঁদ মিত্র কতক পরিমাণে ইহা জীবন্ত করিয়া তুলিলেন। তাহার পর এই উভয় কর্ম্ম অত্যাশ্চর্য্য কৌশলের সহিত সম্পাদিত করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। ভাষার সর্ব্বাঙ্গে তিনি যে মহামূল্য অলঙ্কার পরাইয়াছেন তাহার তুলনা কোথায় হইবে? ব্রাহ্মণ কুলতিলক বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা স্বরূপ পৌরহিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতর ব্যক্তি কে? বঙ্গদর্শনের অভ্যুদয়ে বঙ্গসাহিত্যে বিচিত্র বিপ্লব উপস্থিত হইল। সাহিত্যের পল্লী সহসা বিস্তৃত হইয়া সাহিত্যের রাজ্যে পরিণত হইল, দগ্ধ মরুভূমে শীতল সলিলা কুলপ্লাবিনী স্রোতস্বিনী বহিল। দরিদ্রের কুটীর সহসা ধনধান্য মণিমুক্তা পরিপূর্ণ হইল। সমগ্র শিক্ষিত বঙ্গবাসী সেই অভিনব আনন্দপূর্ণ রাজ্যের প্রজা হইল। সকলে একবাক্যে হর্ষজয়ধ্বনি করিয়া বঙ্কিমের শিরে রাজমুকুট পরাইল। * * তিনি জানিতেন সাহিত্য সাধনার সামগ্রী, অযোগ্য ব্যক্তির ক্রীড়া কৌতুকের নহে। ভাবের, ভাষার উৎস মুক্ত করিয়া দিয়া তিনি স্বয়ং প্রহরী হইয়া দাঁড়াইলেন; পাছে কেহ সেই নির্ম্মল সলিল আবিল করে। সেই সলিলে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানাবর্ণ উৎপাদিত করিল। বঙ্গবাসী বিস্মিত, মুগ্ধ, আনন্দিত হইয়া সেই প্রবাহ এবং সেই বর্ণ বৈচিত্র্য দর্শন করিতে লাগিল।

বঙ্গ ভাষার স্তরে স্তরে যে রূপরাশি এতদিন লুক্কায়িত ছিল বঙ্কিম একে একে তাহা উদঘাটিত করিতে লাগিলেন। ভাবের অভাবে যে ভাষা মৃতপ্রায় ছিল ভাব প্রাচুর্য্যে তাহা সৌভাগ্যশালিনী হইয়া উঠিল।

যে ভাষা নিরর্থ শব্দভারে প্রপীড়িত হইয়াছিল সেই ভাষা ছন্দোময়ী, আবেগময়ী হইয়া উঠিল। মহামহিমাময়ী প্রতিভা, অপূর্ব্বসৃষ্টি-কুশলী কল্পনা বঙ্গভাষার অভাব মোচনে দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত নিযুক্ত হইল। মহাশক্তিশালী ঐন্দ্রজালিকের কৌশলে ভাষায় মোহমন্ত্র বিরচিত হইল। যেমন বেগ তেমনি সংযম, যেমন তীব্রতা তেমনি কোমলতা, যেমন মাধুর্য্য তেমনই গাম্ভীর্য্য। কে জানিত এই সঙ্কীর্ণ দরিদ্র ভাষায় এত বল এত বৈচিত্র্য ছিল! পল্বলের গোস্পদের ন্যায় সঙ্কীর্ণভাষা সমুদ্রগামিনী পূর্ণ প্রবাহিণীর ন্যায় সহস্রমুখী হইয়া নানাতরঙ্গভঙ্গে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া অপ্রতিহতগতিতে প্রবাহিত হইল। বাঙ্গালীর হৃদয়ের নির্জ্জন প্রদেশে কোথায় একতারা বাজিতে-ছিল, সহসা একেবারে সপ্তস্বরা বীণা বাজিয়া উঠিল। * * এই দুর্ব্বল বঙ্গভাষা বঙ্কিমের লেখনীর মুখে শাণিত অসির তীক্ষ্ণতা, বজ্রবিদ্যুতের বলধারণ করিয়াছে। তর্কে, সমালোচনায়, এই তীব্র তেজের পরিচয় পাওয়া যায়। একমুষ্টি ঈষিকা গ্রহণ করিয়া পুরাকালে সমরাচার্য্য যেরূপে শত্রু নিবারণ করিতেন বঙ্কিমচন্দ্র সেইরূপে সংক্ষেপে অবলীলা-ক্রমে সাহিত্যসাধনক্ষেত্র হইতে ভণ্ড অক্ষমকে খেদাইয়া দিতেন। তাঁহার হস্তে ব্যঙ্গ বজ্র হইয়া উঠিত।" ‡

তিনি আরও বলিয়াছেন "প্রতিভা কিরূপ বলবতী হইতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কোমলতা গভীরতা তন্ময়তা বঙ্গসাহিত্যে ইতিপূর্ব্বেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন বলবত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বলে বঙ্কিম সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে চরিত্র গঠনে অতুলনীয়। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সমূহে এই বল সর্ব্বত্র

‡ ভারতী—আষাঢ়, ১৩০১

জাগিয়া রহিয়াছে। এই বলে তাঁহার করুণা এমন মর্ম্মস্পর্শী প্রেম এত বলবান, পরোপকার এরূপ সর্ব্বত্যাগী। এইজন্য কোনস্থানে তাঁহার রসভঙ্গ হয় নাই, কুত্রাপি দুর্ব্বলতার চিহ্ন নাই। মনুষ্য হৃদয়তন্ত্রী সর্ব্বদা তাঁহার সম্মুখে সুরে বাঁধা থাকিত, যখন যে তারে অভ্রান্ত সিদ্ধ হস্তে আঘাত করিতেন, সেইরূপ প্রতিশব্দ হইত। এই জীবনব্যাপী সাধনা ও একাগ্রতায় তিনি কদাপি আত্মবিস্মৃত হন নাই, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার বলদৃপ্ত প্রতিভা উচ্ছৃঙ্খল হইতে পায় নাই। আড়ম্বরের লেশ নাই, ঐশ্বর্য্যের পরিপূর্ণতা আছে। ভাবে, যুক্তিতে, রসিকতায়, সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্র আদর্শ মিলন। কোথাও আয়াস নাই, অঙ্গভঙ্গী নাই, নীরস চপলতা নাই। শব্দ বিন্যাসের অন্ধকার ঘনঘটা কোথাও নাই শ্রুতি মধুর শব্দপ্রবাহ, নয়নরঞ্জন উজ্জ্বল কারুকার্য্য সর্ব্বত্র আছে। নিরবচ্ছিন্ন অমৃতনিষ্যন্দিনী ভাষা, অথচ শব্দলালিত্যের নিমিত্ত ভাব-গৌরব কোথাও বিনষ্ট হয় নাই। স্মরণ করিতে হইবে যে যখন বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন ভাষা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, সঙ্কীর্ণ। কিঞ্চিৎ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। যদি বঙ্কিম উপন্যাস রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলে ভাষার পরীক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত। কিন্তু ভাষার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা, সর্ব্বোপযোগীতা বঙ্কিমচন্দ্রের ব্রত। কাব্যে, উপন্যাসে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, সমালোচনায়, কূটপ্রবন্ধে, বিশুদ্ধ রহস্যে; ধর্ম্মের গভীর আলোচনায় তিনি এই দুর্ব্বল বঙ্গভাষা পরিচালিত করিলেন—দেখাইলেন কোথাও অসামঞ্জস্য নাই, ভাষার কোন অভাব নাই। সর্ব্বত্র তিনি ভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, সর্ব্বত্র অবিশ্রান্ত অপরিসীম বলবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। * * *

বঙ্কিম যখন সাহিত্যে প্রথম আদর্শ অন্বেষণ করিতেছিলেন তখন রসিকতার নামান্তর গালি ছিল। ইতর অশ্লীল ভাষায় গালি দেওয়াকে লোকে কৌতুক বিবেচনা করিত। ঈশ্বরগুপ্ত ও গুড়গুড়ে যখন অশ্রাব্য ভাষায় ভয়ানক দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেন তখন লোকে আনন্দে হাসিয়া অস্থির হইত। উচ্চশিক্ষার ফলে, উচ্চ আদর্শের গুণে, নির্ম্মল প্রতিভার বলে, সে দোষ বঙ্কিমকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। লোকের গায়ে কাদা ছিটাইয়া তিনি কখন লোক হাসান নাই। বিশুদ্ধ রসিকতা প্রতিভার অতি উচ্চ অঙ্গ। বঙ্কিম পূর্ণমাত্রায় তাহা পাইয়া ছিলেন। নির্ম্মল হাস্য কৌতুক পরিহাসের আদর্শ তিনি বঙ্গসাহিত্যে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যে রসিকতা অতি গভীর, অতি বিশুদ্ধ, যে হাসির গভীর তলদেশে অশ্রুজল লুকায়িত থাকে বঙ্কিম স্বজাতিকে তাহাই দিয়া গিয়াছেন।"

বঙ্কিম চন্দ্রের সাহিত্য-পরিচর্য্যা বিশ্লেষণ কালে বঙ্গবাণী প্রণেতা শশাঙ্ক মোহন সেন লিখিয়াছেন; "বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বাঙ্গালা গদ্যকে নিখুঁত আর্য্য-আদর্শে সংস্কৃতের অনুগত করিয়া যান। * * বঙ্কিমের প্রতিভাই অনুপম স্বভাব শীলতা এবং স্বাধীনতার গুণে, একদিকে বিদ্যাসাগর এবং অন্যদিকে প্যারীচাঁদ প্রভৃতির মধ্যপথে, প্রকৃত বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। * *

উপন্যাসের ক্ষেত্রে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছেন। তাই বা কেন, তিনি বঙ্গদেশে এই এক নবসাহিত্য-পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কপালকুণ্ডলার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রতিভার যেই মেঘ গর্জ্জন দূর হইতে শুনা গিয়াছে, চন্দ্রশেখর বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে তাহাই ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালী

গৃহস্থের গৃহদ্বারে আসিয়া তাহাকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব পুলকে পুলকিত করিয়াছে। বাঙ্গালী এই ধ্বনি ইতিপূর্ব্বে আর শুনে নাই। *

বঙ্গীয় কথাসাহিত্যে এবং গল্পের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের চির-পূজ্য আসন; * * যথোচিত ঘটনা এবং চরিত্রের সৃষ্টি, উপাখ্যানের নৈতিক ভিত্তি, ভাষার শাণিত দীপ্তি, ত্বরিত গতি এবং সর্ব্বত্র হৃদয় গ্রাহিতার গুণে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অধিকার লাভ করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি, বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পী; তাঁহার ভাষা ভাব ও বস্তুবিষয় সর্ব্বত্র সুমার্জ্জিত এবং সংযত; * *

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আধুনিক ইংরাজী বা ইয়োরোপীয় উপন্যাসের বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র বা প্রকাণ্ডতা নাই; মনুষ্য জীবনের সর্ব্ববিধ ভাল-মন্দের ঘাত-প্রতিঘাতে ওজস্বী কিংবা বৈচিত্র্যময় চরিত্র সমাবেশ নাই। তাঁহার উপন্যাসের আয়তন ক্ষুদ্র; বর্ণিত চরিত্র গুলিও বড় প্রকাণ্ড নহে; এবং মানব জীবনের এক একটা সরল এবং ব্যাপক ভাবকে আশ্রয় করিয়াই উহারা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। * * *

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গুলি এক একটা প্রেমের খেলা; দাম্পত্য প্রেমে সন্দেহ অথবা ব্যভিচারই প্রায় তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসের মেরুদণ্ড। বঙ্গদেশে গার্হস্থ্য জীবন ভিন্ন জীবন; এবং গার্হস্থ্য প্রেম ব্যতীত মহত্তর বা ব্যাপকতর ভাব নাই। বৈষ্ণব কবিদের সময় হইতে বাঙ্গালী এই প্রেম লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া আসিতেছে; প্রেমের বিষয়েই বাঙ্গালীর প্রতিভা বিশেষ ফুটিয়াছে। 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'—এই বাক্য আমরা ভালরূপে বুঝিয়াছি, এবং অন্যকে বুঝাইতেছি। আবার, এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সমধিক বিকশিত হইয়াছিল। * *

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গুলির প্রধান গুণ এই যে, উহারা রচনার বস্তুভিত্তি, গভীর আন্তরিকতা এবং সর্ব্বত্র ঋজুতার দরুণ সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ। বঙ্কিমের রচনা প্রণালীর মধ্যেও কোনরূপ একদেশিতা বা সঙ্কীর্ণতা নাই, উহা সর্ব্বত্র আত্ম-সংযত এবং আপনার মধ্যেই সম্পূর্ণ। * *

এই দেশের পরিবার, রাষ্ট্রীয় অবস্থা, ইতিহাস এবং ধর্ম্ম আদর্শের দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বঙ্কিমের উপন্যাস এবং সন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এ' ক্ষেত্রে বঙ্কিমের প্রতিভা এবং বঙ্গদর্শনের আহ্বান অনেক বিশিষ্টকর্ম্মা ব্যক্তিকেই প্রলুব্ধ করিয়াছিল। * * *

বঙ্কিম শেষ বয়সের উপন্যাসাদিতে এবং ধর্ম্মতত্ত্বে, দেশের বহু প্রচলিত 'একান্ত বৈরাগ্য' এবং 'সংন্যাসের' আদর্শকে বিপ্রতিপন্ন করিয়া, গীতোক্ত 'ভাগবতধর্ম্ম' এবং সেশ্বর ভক্তি আদর্শের প্রচার করিয়াছেন।"

শশাঙ্কমোহন সেন আরও লিখিয়াছেন: "রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার বঙ্গভাষার পদ-গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ওই পদ-গৌরবে বঙ্গভাষা যথেচ্ছ ভাবে চলিতে পারিতে ছিল না; * * * বঙ্কিমচন্দ্রের কথা হাসিতে, নাচিতে, ছুটিতে, কাঁদিতে জানিত; প্রেম করিতে, কলহ করিতে, যুদ্ধ করিতে জানিত; ঘৃণা করিতে, আঁস্ফালন করিতে, ভীত ও বিস্মিত শান্ত এবং স্তিমিত হইতেও জানিত; * * রামমোহন তর্ক করিতে, নিরস্ত করিতে, ধ্যানস্থ করিতে জানিতেন; কেশবচন্দ্র উদ্দীপ্ত করিতে, অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেন; বিদ্যাসাগর বুঝাইতে, কাঁদাইতে জানিতেন; সঞ্জীবচন্দ্র দেখাইতে, দীনবন্ধু হাসাইতে জানিতেন; বঙ্কিমচন্দ্র ন্যূনাধিক সমস্ত এবং তাহারও অধিক জানিতেন। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণ গঠিত—পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য, তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে

কোন অযথা দৌর্ব্বল্য বা প্রাবল্য নাই। তাঁহার ভাষা ও ভাব, অর্থ ও ছন্দ পরস্পকে ব্যভিচরিত করে না বলিয়া সম্পুর্ণ আত্মসিদ্ধ এই সরস্বতী শ্রেষ্ঠ—কাব্যশিল্পীর উপযুক্ত। বঙ্গভাষায় বঙ্কিমের আবশ্যক ছিল। * * *

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষীয় শিল্পী; আমাদের পরম আনন্দের বিষয় এই যে, তিনি কেবল ইয়োরোপীয় উপন্যাসাদর্শের অনুকরণ করিতে যান নাই। স্বকীয় অন্তঃকরণতত্ত্বের প্রবল স্বাতন্ত্র্যবশে, কতকটা জাগ্রতভাবেই তিনি ইয়োরোপীয় সংশ্রব যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিতে ছিলেন। ভারতবর্ষে প্রণয়পূর্ব্বক বিবাহের প্রতিষ্ঠা নাই—প্রথম রচনা দুর্গেশনন্দীতেও, তাই বঙ্কিম একান্তভাবে প্রণয় পূর্ব্বতার অবতারণা করেন নাই। আবার, ভারতবর্ষীয় দাম্পত্য আদর্শে পরিণয় কেবল চুক্তি নহে; এই আদর্শে ব্যভিচার করিয়া দম্পতি নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বিশেষে পুনর্মিলিত হইতে পারেন না! দাম্পত্য তন্ত্রে, যাহা ভাঙ্গে, তাহা আর পূর্ব্ববৎ জোড়া লাগে না। রাণী ভবানী সিরাজ-দ্দৌলাকে লিখিয়াছিলেন—'স্ত্রীলোকের সতীত্ব মৃৎপাত্রের ন্যায়, ভাঙ্গিলে আর জোড়া লাগেনা'; জুড়িয়া দিলেও, রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যবর্ত্তিনীর' মত সেই অতীত পাপছায়া দম্পতির মিলন মধ্যস্থলে জাগিয়া থাকে। এই তত্ত্ব নির্দ্দয়, নির্ম্মম হইতে পারে; কিন্তু ইহা অধ্যাত্ম জীবনের চিরন্তন সত্য। উহাকে উপেক্ষা করার যো নাই। * *

কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি, শ্রেষ্ঠ পারিবারিক উপন্যাস। উহার পরিসর ক্ষেত্র ক্ষুদ্র, একটীমাত্র বঙ্গীয় পরিবার। * * কিন্তু ঐ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই বঙ্কিম যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও শিল্পী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। উহা বঙ্গসাহিত্যে

অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ইংরাজি সাহিত্যেও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। দাম্পত্য প্রেমের এই পরম সূক্ষ্ম আদর্শ প্রাচ্য ঋষির আবিষ্কার। * *

আনন্দমঠ গ্রন্থে স্বদেশ-প্রেম ও দাম্পত্য ধর্ম্ম সমঞ্জসিত আদর্শ অন্বেষণ করিয়াছে। আনন্দমঠ রচনার সময় বঙ্কিমের বয়স ৪৩ বৎসর। স্বকীয় শিল্প-প্রতিভার সুবর্ণ-সুযোগের চরম রেখা তিনি অতিক্রম করিতেছিলেন। * * বঙ্কিম একদিকে নিষ্কাম কর্ম্ম সংন্যাসের মধ্যেই দেশানুরাগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; অন্যদিকে, ভারতবর্ষীয় সংযম-নিষ্ঠা, উন্নত জীবন সাধনা এবং দম্পতির পরস্পর-প্রাণতার স্থির আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। * *

বঙ্কিমচন্দ্র জগতের মঙ্গলকামী দার্শনিক বলিয়া তাঁহার শিল্পশক্তি সচেতন ভাবেই সমাজের মঙ্গল মুখী। * * *

বঙ্কিমচন্দ্র কবি ; গদ্যের ক্ষেত্রে লেখনী পরিচালন করিয়া থাকিলেও, তাঁহার রচনায় কবিত্ব শক্তি—কল্পনী, দাপনী ও রসনী শক্তি—অসাধারণ! তাঁহার ভাষা এবং রচনারীতি সর্ব্বত্র ঋজু, সংযত, সংহত অথচ ভাবার্থের প্রকাশে ত্বরিতশক্তিমতী ; প্রচলিত অথচ গৌরবান্বিত ; অমায়িক অথচ গভীর! তাঁহার গদ্যপ্রবাহে সময় সময় ভাবোচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের সুর পাওয়া যায় ; অমিত্রচ্ছন্দের কবিতা, এই গদ্য! * *

এখন যাহারা সরস্বতীর অন্তঃপুরে 'উকি দিয়া' দেখিবার সৌভাগ্যও পায় নাই, তাহারাও বিশত্রিশ খানি তিন বলুম নবেল লিখিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং অর্থ অর্জ্জন করিয়া যাইতেছে অবশ্য সারস্বতী খ্যাতি কিংবা শিল্পীর 'পরমার্থ' নহে। এইরূপ এক একটী নবেলের পাঠ শেষ করিয়া, চিন্তা করিলেই দেখিবেন—হয়ত ক্ষুধাতৃষ্ণা এবং আহার-নিদ্রা ভুলিয়া পরম নিবিষ্ট ভাবেই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে হইয়াছিল ; উহা যেন কয়েক

ঘণ্টাকাল মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবৎ আবিষ্ট রাখিয়া ছিল! কিন্তু উহার মধ্যে এমন একটা শব্দ, একটি পংক্তি, একটা দৃশ্য নাই, যাহা মনে মুদ্রিত হইতে পারিয়াছে! সমস্ত গ্রন্থ একটি ক্ষণ প্রদীপ্ত উল্কা-জ্বালার মতইইন্দ্রিয়-পথে বিস্ফুরিত হইয়া নিবিয়া গিয়াছে! * ঐ গ্রন্থের কিছুমাত্র সারস্বত আকর্ষণ নাই ; * * উহা 'মস্তিষ্কের অহিফেন' ব্যতীত আর কিছুই নহে। * *

ওয়াণ্টার স্কটের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রও প্রকৃত কবিত্বশক্তি লইয়াই উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সাধারণ গল্প কথকের ন্যায় কেবল ভূয়োদর্শন, পুঞ্জীকরণ বা আমোদনের প্রণালীই তাঁহার শরণ্য ছিলনা। * * চরিত্র-সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ শিল্প-সাহিত্যের একটা প্রধান গুণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। * * বঙ্কিমচন্দ্রও কবিগুণধর শিল্পী। * * শিল্পী মাত্রেরই প্রধান গুণ—সৃজন ও দর্শন শক্তি বঙ্কিমচন্দ্রে সম্পূর্ণ ভাবে রহিয়াছে ; বঙ্কিম কাব্য লিখিতে যান নাই—গল্প লিখিতে গিয়াছেন ; এবং এই গল্পেই তাঁহার কবিত্বশক্তি প্রমাণিত হইয়াছে। * * বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব সামর্থ্য অসাধারণ ; * বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তি আমাদের সাহিত্যে অনন্য সাধারণ। সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, সত্যের দর্শন, অনুরূপ চরিত্র সংঘটনার বিষয়ে বঙ্কিম বঙ্গ সাহিত্যে একক।"

বাবু রজনী কান্ত সেন তাঁহার বঙ্কিম প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "বঙ্কিম চন্দ্র টেকচাঁদ ঠাকুরের রচনা প্রণালীর যে ত্রুটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি স্বকীয় প্রতিভাবলে সেই ত্রুটীর সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। * * তাঁহার (টেকচাঁদের) রচনার ভাব গ্রহণে যেরূপ কোন কষ্ট হয় না, সেইরূপ সরল শব্দযোজনার গুণে উহা পাঠকেরও অপ্রীতিকর হইয়া উঠে না। * * বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর ও অক্ষয়কুমার রচনাগত গাম্ভীর্য্য রক্ষার জন্য সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। টেকচাঁদ

ঠাকুর ভাষার এই স্তর হইতে অতি নিম্ন স্তরে গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্যের এই উভয় স্তরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। ব্যোমযান বিহারী আকাশ পথে উত্থিত হইলেও, বায়ুমণ্ডলের সমতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলেন। বায়ুপ্রবাহে যে স্তরে থাকিলে তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া অব্যাহত থাকে, জীবনী-শক্তির অপচয় না ঘটে, তিনি ততদূর উঠিয়াই, আত্মক্ষমতার পরিচয় দিয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা নিম্নস্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চস্তরে উত্থিত হইলেও জীবনী-শক্তি বিসর্জ্জন দেয় নাই।"

বঙ্কিমের রচনাকালকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, পাঠকের মনোরঞ্জন ও পাঠক সংগ্রহ,—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী প্রভৃতির দ্বারা। এই সকল গ্রন্থদ্বারা পাঠক সংগ্রহ করতঃ তিনি ক্রমশঃ তাঁহার উদ্দেশ্যের সীমা বিস্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত করিলেন। দ্বিতীয়ে, তিনি উপন্যাসচ্ছলে মানবমণ্ডলীকে শিক্ষদান ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, কমলাকান্তের দপ্তর, রাজসিংহ, রজনী প্রভৃতি রচনা করেন। এই শ্রেণীর গ্রন্থই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পরে তৃতীয়ে তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যের আয়তন আরও বিস্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত করতঃ পাঠক পাঠিকাগণকে সমগ্রজীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয়ে শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম এই শ্রেণীর রচনা। উপন্যাস ব্যতীত বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র, লোক রহস্য, কমলা কান্তের দপ্তর প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ ছিল। প্রাচীন বয়সে বঙ্কিম ধর্ম্ম-চর্চ্চায় নিবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার বিশ্বাস কেবল ধর্ম্মমূলক ছিল না। অসামান্য যুক্তি কৌশলে তিনি বিশ্বাসকে দৃঢ় করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন প্রথমে পাঠকবর্গের নিকট, সাধারণের নিকট আদৃত হয় নাই, বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীও প্রথমে পাঠকবর্গের নিকট সম্যগরূপে আদৃত হয় নাই। তখন কেহ বুঝিতে পারেন নাই যে পাঠকের কদর্য্য রুচির খাদ্য সরবরাহ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; তিনি চাহিতেন পাঠকের রুচি উন্নত করিতে; তিনি চাহিতেন 'নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য।' যুগ সাহিত্যের স্রোতে বা তৎকালে প্রচলিত পাঠকবর্গের রুচির স্রোতে তিনি তাঁহার রচনাবলীর গা ঢালিয়া দিতে সম্মত ছিলেন না। রুচি মার্জ্জিত করা, সমাজ সমুন্নত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভাষার পরিপুষ্টি-সংসাধন ও তৎসঙ্গে পাঠক মণ্ডলীকে সৎপরামর্শদান ও তাহাদের সমক্ষে সদ্দৃষ্টান্ত সমুপস্থাপিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য এবং ব্রত।

বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। * * সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য কি বিজ্ঞান কি ইতিহাস কি ধর্ম্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

* * আমাদের মধ্যে যাহারা সাহিত্য ব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কি চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোন কালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত একতারে

বাঁধা ছিল, কেবল সহজস্বুরে ধর্ম্মসঙ্কীর্ত্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে একএকটী করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

* * বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন; তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্য স্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, একথা কোন বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্য।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী প্রথমে পাঠক-বর্গের নিকট সমধিক আদর লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু বঙ্কিমকে চিনিতে বা বঙ্কিমের আদর্শ ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পাঠক বর্গের অধিকদিন বিলম্ব হয় নাই। পাঠকবর্গের মনোরূপ ক্ষেত্র তখন বেশ উর্ব্বরই ছিল তাহার উপর বঙ্কিমের রচনারূপ বীজ অঙ্কুরিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল বটে; কিন্তু অঙ্কুরিত হওয়ার পর হইতেই সত্বর চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শাখা বিস্তার পূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বিদ্যাসাগর বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন —"বর্ত্তমান কালের বঙ্গসাহিত্যকে একটী শস্যক্ষেত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে ইহা সংস্কৃত-বাঙ্গালারূপ লতাগুল্মাদি দ্বারা পরিকীর্ণ প্রান্তরের ন্যায় ছিল। রামমোহন

সেই কন্টকপরিপূর্ণ প্রান্তর হইতে লতাগুল্মাদি উৎপাটন করিয়া, পরিষ্কার করিয়া চলিয়া গেলেন অর্থাৎ তাঁহার দ্বারাই বঙ্গগদ্য সাহিত্যের ভিত্তি সৃষ্টি হইল। তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই অনুর্ব্বর ভূমিকে পরিশ্রমের সহিত কর্ষণ করিলেন, বিদেশজাত ফলফুলের বীজাদি সংগ্রহ করিয়া সুন্দর রূপে বপন করিলেন, ভূমিতে ইংরাজি ও সংস্কৃত সাহিত্যরূপ সারদিতে ভুলিলেন না এবং সেই বঙ্গসাহিত্য বীজগুলি যাহাতে 'ঈত্যা'দির দ্বারা না নষ্ট হইয়া যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। তাঁহার পর অক্ষয়কুমার নীতিরূপ জল হইয়া, সেই সুকুমার বঙ্গসাহিত্য চারাবৃক্ষগুলির মূলদেশে সেচন করিতে লাগিলেন, এবং কয়েক বৎসর পরে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্য বৃক্ষগুলি বড় হইয়া ফলভারাবনত হইয়া পড়িল; সেই বৃক্ষগুলিতে দুইপ্রকার সুমিষ্ট ফল ফলিল। একপ্রকার ফল লইয়া মাইকেল হেমচন্দ্র প্রভৃতি মহোদয়গণ সাধারণ লোকদিগকে কবিত্বের আস্বাদ দিলেন, অপর দিকে প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মহাশয়গণ অন্যপ্রকার ফল লইয়া লোকদিগকে উপন্যাসের আস্বাদ দিলেন। লোকে এই দুই প্রকার ফল খাইয়া, পরিতৃপ্ত হইয়া বৃক্ষের বপনকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল, এবং যাহাতে সাহিত্যবৃক্ষে তদ্রূপ আরও উপন্যাস ও কবিতাফল জন্মায় সেইরূপ পরিশ্রম করিতে লাগিল।

* * বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গসাহিত্যকে বহু পরিশ্রমের সহিত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিলে পর, আধুনিক বঙ্গলেখকগণ তাহার উন্নতি-চেষ্টায় নিযুক্ত হন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, মাইকেল, বঙ্কিম ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্য সেবকগণ বঙ্গসাহিত্যের শোভা বিস্তার করাইয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত উদ্ধার

সাধন না করিলে, তাহাকে নূতন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে না ধরিলে, বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান উন্নতি হইত কি না সন্দেহ; এ সম্বন্ধে আর একটী প্রমাণ এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঙ্গালা সাহিত্য গঠনের পর হইতেই এত কৃতবিদ্য বঙ্গলেখক দৃষ্ট হইতেছে; উচ্চ ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত উপাধিধারী বঙ্গবাসীগণ এবং সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিদ্যাসাগরের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতেছেন, অর্থাৎ প্রথমোক্ত সম্প্রদায় ইংরাজি সাহিত্যপুস্তক সমূহ হইতে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদ করিতেছেন; এবং শেষোক্ত দল স্বদেশীয় মনীষাসম্পন্ন প্রাচীন পণ্ডিতদিগের গ্রন্থাদি হইতে লুপ্তপ্রায় রত্নাদি উদ্ধার করিয়া বঙ্গসাহিত্যাগারে সঞ্চিত করিয়া রাখিতেছেন। আর একটি কথা এই, যে বর্ত্তমান কালে যে কোন ব্যক্তি জীবনচরিত, ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি বা নীতি গ্রন্থাদি বা অন্য কোন প্রকার ভাবপরিপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করুন না কেন, তাঁহাকে বিদ্যাসাগরী ভাষার অনুসরণ করিতে হইবেই। * * *

সেইজন্য ইহা দৃঢ়তা সহকারে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন কালে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যে এত উন্নতি তাহার আদি কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয়। আজকাল যে এমন সুশ্রাব্য ও সুমিষ্ট বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, বিদ্যাসার মহাশয়ের বেতালপঞ্চবিংশতিই তাহার মূল। তাঁহার এক এক খানি অনুবাদগ্রন্থ এক একখানি মূল গ্রন্থাপেক্ষাও মূল্যবান। সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষা হইতে কি প্রকার সরল বঙ্গানুবাদ করিতে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাহার পথ প্রদর্শক; তিনি মাসিক পত্রিকাদির লিখন প্রণালীর পথ প্রদর্শন করিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যচর্চ্চা প্রবল করাইয়া গিয়াছেন ও ব্যাকরণাদি প্রণয়ন করিয়া

সংস্কৃত শিক্ষার উপায় দেখাইয়া দিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিপথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা বঙ্গগদ্য সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল। সেইজন্য ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, যতকাল বাঙ্গালা ভাষা আদৃত হইবে, যতকাল লোকে বঙ্গ গদ্যের প্রশংসা করিবে, ততকাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম সমগ্র সাহিত্যজগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

আজ পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গদেশ কাঁদাইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে অনাথা করিয়া, জগৎকে শোকসাগরে ডুবাইয়া অনন্তকাল-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু বর্ণপরিচয় হইতে সীতার বনবাস পর্য্যন্ত সমগ্র গ্রন্থ গুলিতে তাঁহার নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে; যতকাল লোকে বাঙ্গালা কথা কহিবে বা বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি প্রণয়ন করিবে, ততকাল লোকে তাঁহার পরলোকগত আত্মার সম্প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে জগৎপাতা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে এবং যদি সৌভাগ্যক্রমে ভবিষ্যৎকালে বঙ্গসাহিত্য, সংস্কৃত বা ইংরাজি সাহিত্যের সমকক্ষ হইয়া, তাহাদিগের ন্যায়, জগৎপ্রসিদ্ধ খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হয়, তখন সাহিত্য বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবনত মস্তকে ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র আত্মাকে অভিবাদন করিয়া বলিবে 'আমি আপনার নিকট চিরজীবন ঋণী, আপনি আমার বিপদে রক্ষাকর্ত্তা ও পিতৃসদৃশ পালন কর্ত্তা।'

ঈশ্বরচন্দ্র এই নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া গেলেও, বঙ্গ-সাহিত্য জগতে চিরকাল অবিনশ্বর রহিবেন"*

* ভারতী—মাঘ, ১৩০১

জীবদ্দশায় নিজরচনার সম্যগ্ আদর দেখিতে পাওয়া, অথবা উচ্চ অঙ্গের রচনাদ্বারা-বিপুল সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হওয়া, অতি অল্প লেখকেরই ভাগ্যে ঘটে। বিলাতে স্যর ওয়াল্‌টর স্কট, লর্ড বাইরন প্রভৃতি এবং আমাদিগের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনেশ সেন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি কেবল সাহিত্য রচনা দ্বারায় বিপুল যশঃ ও প্রভূত সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মহাকবি কালিদাসের অপূর্ব্ব বর্ণনালালিত্য থাকিলেও সৃষ্টি কৌশল তদনুরূপ নহে; তাঁহার তিনখানি নাটকের গল্পাংশ প্রায় এক; কিন্তু ইংলণ্ডের মহাকবি শেক্ষপীয়রের যেমন বর্ণনা-বৈচিত্র্য তেমনি সৃষ্টি কৌশল। আমাদিগের বঙ্কিমচন্দ্রেরও সৃষ্টি কৌশল যথেষ্ট। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন—কিন্তু কোনটারই গল্পাংশ অন্য কোনটার সহিত মিলে না। বঙ্কিমের সৃষ্টিকৌশল যথার্থই প্রশংসনীয়। এক দুর্গেশনন্দিনীতেই আমরা তিনটী তিনপ্রকার অপূর্ব্ব নারী চিত্র দেখিতে পাই। আয়েষা কবির অপূর্ব্ব-সৃষ্টি—যেন মানসী প্রতিমা। "স্ত্রীরত্ন সৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে।" গল্পাংশে বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী স্কটের আইভ্যানহোর সঙ্গে স্থূলভাবে মিলিলেও ইহাতে বঙ্কিমের কৃতিত্ব, বঙ্কিমের মৌলিকতা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা hat, coat, gown বা helmet, gauntletএর কোন চিহ্নও দেখিতে পাই না; জগৎ সিংহ ওসমানের দ্বন্দ্বযুদ্ধ duel tournament-এর অনুকরণ মনে হইলেও—তাহা মনে করা অন্যায়। সংস্কৃত নাটকাদিতেও দ্বৈরত সমরের বা দ্বন্দ্বযুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ফল কথা, ইহাতে ইংরেজির গন্ধ মাত্র দেখিতে পাই না; আহারে বিহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে, কথায় বার্ত্তায়—সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে

বাঙ্গালী ধরণের। আবার অনেকে বলেন বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার পূর্ব্বে Ivanhoe মোটেই পড়েন নাই। তাঁহাদের মত সমর্থন কল্পে তাঁহারা অনেক প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের উপন্যাস লইয়াও এই বিভ্রাট দেখিতে পাই।

অধুনা বঙ্কিমের অনুশীলন এত অধিক হইয়াছে যে তৎসমুদয় একত্র করিলে একখানি স্বতন্ত্র বিপুলকায় গ্রন্থ হইতে পারে। অধ্যাপক স্বর্গীয় ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন) তাঁহার নিজের অননুকরণীয় ভাষায় অতি সুন্দররূপে নিরপেক্ষভাবে ধারাবাহিক রূপে বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্তৃতানুশীলন করিয়াছেন। তাঁহার অনুশীলন যেমন সারগর্ভ, তেমনি সুযুক্তিপূর্ণ, তেমনি হৃদয়গ্রাহী। ইহার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন আরও অনেকেই করিয়াছেন। রায় সাহেব হারাণ চন্দ্র রক্ষিতকে তাঁহাদিগের পথ প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। এক্ষণে আমরা হারাণবাবুর 'বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিম' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম—"বঙ্কিমের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। * * বঙ্কিমের প্রাণময়ী মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষা পড়িতে পড়িতে এক একবার আমার মনে হয়, যেন গদ্যে কোন গীতি কবিতা পড়িতেছি। * * বিদ্যাসাগর মহাশয় এক হিসাবে ভাষার জন্মদাতা ও গুরু বটেন,—ভাষাও তাঁহার খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু সত্য বলিতে কি, তাঁহার ভাষাতেও যেন কেমন বিনাইয়া বিনাইয়া, শ্রোতৃবৃন্দের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া রচিত বলিয়া মনে হয়। * *

এক্ষণে যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে নানা শ্রেণীর নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে,—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস; জীবন বৃত্তান্ত, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েইকোন না কোন গ্রন্থ দেখা যাইতেছে,—ইহার মূল বঙ্কিম। বঙ্কিমই প্রথম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রচলিত করিয়া,—রাজার

দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ইংরেজ যে, এখন বাংলা সাহিত্যের একটু খোঁজ খবর রাখেন,—ইহার মূলেও বঙ্কিম। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি বাঙ্গালা সাহিত্য একমাত্র সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত হইত, তাহা হইলে ইহার এরূপ পুষ্টি ও প্রচার কখনই সম্ভবপর হইত না। * * বঙ্কিম বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে না নামিলে,—বঙ্কিমের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা না করিলে, বাঙ্গালা সাহিত্য আজ কখনই রাজা প্রজা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না; * * * সত্যের অনুরোধে মুক্তকণ্ঠে বলিতে হয়,—বঙ্কিমের নিকট বাঙ্গলা দেশ কৃতজ্ঞ,—সমগ্র বাঙ্গালী জাতি কৃতজ্ঞ * * *

বঙ্কিম প্রতিভাবান কবি; তাই তিনি ভাব ও চিন্তার আদর্শে ভাষা গঠিত করিয়াছিলেন,—ভাষার আদর্শে ভাব বা চিন্তা ব্যক্ত করেন নাই। কেবল কাণে মিষ্ট লাগিবার জন্যই যে, তিনি স্থান বিশেষে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিতেন তাহা নহে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে ভাষা সহজে ও শীঘ্র লোকের হৃদয় আকর্ষণ করে—যেটি একটী জীবন্ত মূর্ত্তির মত পাঠকের চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়, সেই ভাষাই অধিক ফলদায়িকা। এই জন্য সাধু শুধু সংস্কৃত মূলক ভাষা অপেক্ষা চলিত অথচ কবিত্বময়ী বাঙ্গালা ভাষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন এবং কাব্যে তাহার প্রাধান্যও দিতেন।

* * * কেবলমাত্র উপন্যাসের দিক হইতে দেখিলে একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি,—কি ভাব, কি ভাষা, কি বর্ণনা, কি চরিত্র-চিত্র, কি রচনানৈপুণ্য, কি লিপিকুশলতা, কি উদ্ভাবনী শক্তি; কি সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, কি ঘটনাসামঞ্জস্য, কি নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত,—সকল বিষয়েই আমাদের বঙ্কিম, উপন্যাস জগতে **রাজ রাজেশ্বর**।"

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটীর স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কারে ফেলে কারে রাখি'—নির্ণয় করা কঠিন। অনেকের মতে বিষবৃক্ষ তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। আবার হারাণচন্দ্র রক্ষিত বলিয়াছেন "বঙ্কিমবাবু নিজে তাঁহার কৃষ্ণকান্তের উইলকে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিতেন। অপিচ, লিপিকুশলতা, চরিত্রচিত্র, ভাষার পারিপাট্য, সূক্ষ্মদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার একথা ঠিক বটে।" হারাণবাবুর নিজের মতে "কাব্যাংশে কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এবং এই কপালকুণ্ডলাই কাব্যাংশে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কারণ, ইহা বিশেষ কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত নহে। কাব্যের যাহা চরম লক্ষ্য,—নিরবচ্ছিন্ন বিমল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি,—অত্যুন্নত, উদার, অনন্ত, অপূর্ব্ব সুখ-কল্পনা-প্রসূত স্বপ্নময়ী সৃষ্টি,—তাহা এই প্রকৃতিপালিতা, সরলা স্বভাব-সুন্দরীর চরিত্রচিত্রে প্রস্ফুটিত। * * মিরন্দা দ্বীপবাসিনী হইলেও পিতাকে জানিত, পিতার স্নেহ পাইত, সংসারী জীবের সুখ দুঃখের মাত্রা বুঝিত।—শকুন্তলা নির্জ্জন তপোবনে পরিবর্দ্ধিতা হইলেও ঋষিকুমারী-গণের নিকট প্রায় সাংসারিক সকল অভিজ্ঞতাই লাভ করিয়াছিল।—কিন্তু এ, কি এ! এ যে বজ্রকঠোর-দৃঢ়তার পার্শ্বে প্রস্ফুটিত কমলিনী! তান্ত্রিকের তান্ত্রিক মূর্ত্তিমান কাপালিকের পার্শ্বে স্নেহ-মমতা-সরলতাময়ী ক্ষুদ্র বালিকা! 'কপাল কুণ্ডলা' বঙ্কিমের চরম সৃষ্টি,—উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি। এ সৃষ্টির পার্শ্বে বঙ্কিমের অন্যান্য সৃষ্টি ধরিলে ম্লান ও মলিন হইয়া যায়। শুধু কাব্যাংশে কেন,—নাট্যাংশেও কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। * * * এই কপালকুণ্ডলাতেই বঙ্কিম অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।"

স্বদেশভক্তি ও জাতীয়তা বঙ্কিমচরিত্রে অনুশীলনের আর একটা জিনিষ। তিনি সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়তা লক্ষ্য করেন। রজনীকান্ত গুপ্ত বলিয়াছেন "জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদন বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয়-কীর্ত্তি। তিনি মাতৃভাষার পরিচর্য্যার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন: বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষার পরিচর্য্যা করিয়াই লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বব্যাপিনী ছিল। একাধারে তিনি কবি, উপন্যাস-কার, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিৎ ও ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ ছিলেন তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায় বাঙ্গালা ভাষার অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে স্বদেশীয় ভাষার জ্ঞান বিস্তার না হইলে, কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না এবং কোন জাতি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় ভাষায় জ্ঞানবিস্তার করিয়া স্বজাতিকে অভিজ্ঞ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। * * * যিনি স্বদেশীয়দিগকে এইরূপে জ্ঞান সম্পন্ন করিয়া পরস্পর সমবেদনাপর, পরস্পর একতাবদ্ধ, পরস্পর একাত্মভাবে অবস্থিত, মহাজাতির মহিমান্বিত পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার স্বদেশভক্তি ও স্বজাতিপ্রীতির পরিচয় দিয়া অসামান্য কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। এই জন্য তাঁহার এত গৌরব, এই জন্য তাঁহার এত সম্মান।"

এইবার আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের লেখকগণের রচনার সংক্ষিপ্তানু-শীলন করিব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯-১৮৯৩) ইনি একজন বঙ্কিমের সমসাময়িক লেখক; ইনি চিকিৎসা বিষয়ক অনেক পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রভূত পরিপুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। শরীর পালন, ধাত্রী শিক্ষা, সরল জ্বর চিকিৎসা

(তিন খণ্ড), বাঙ্গালীর মেয়ের নীতি শিক্ষা, রোগ বিচার, চিকিৎসা উদ্ভিদ্‌বিচার প্রভৃতি ইঁহার রচনা। ইঁহার চিকিৎসাকল্পদ্রুম সে সময়ের মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ের শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ।

কালীময় ঘটক (১৮৪০–১৯০০) : কালীময় ঘটকের গদ্য রচনার মধ্যে চরিতাষ্টক ১ম ও ২য় ভাগ তৎকালের বালকদিগের উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক। ইঁহার অন্য গদ্য গ্রন্থের মধ্যে ছিন্ন মস্তা, শর্ব্বাণী, কৃষি শিক্ষা, কৃষি প্রবেশ, সুরেন্দ্র জীবনী উল্লেখ যোগ্য।

রাজা স্যার সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর (১৮৪০) : সঙ্গীত শাস্ত্রে সৌরীন্দ্রমোহন দিগ্বিজয়ী বীর ; সঙ্গীতের জন্য জগতে তাঁহার অতুল সম্মান। পৃথিবীর এমন দেশ, এমন রাজ্য নাই, যেখান হইতে তিনি উপাধি বা পারিতোষিক না পাইয়াছেন। সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ে ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন : সঙ্গীত সার, জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব, যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা, মৃদঙ্গ মঞ্জরী, একতান, হারমোনিয়া সূত্র, হিন্দু সঙ্গীত যন্ত্রবোধ প্রভৃতি। "ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত," "মুক্তাবলী," "মণিমালা," "ধাতুমালা" প্রভৃতিও তাঁহার পূর্ব্বেকার রচনা।

জগদ্বন্ধু ভদ্র (১৮৪২)—জগদ্বন্ধু বাবু আবাল্য সাহিত্য-সেবক। ইঁহার হানিফ গাজী ইংরেজি জন গিলপিনের অনুকরণে রচিত। ইঁহার ব্যঙ্গকাব্য 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' সে সময়ে সকলেরই নিকট বিশেষ রূপে সমাদৃত হয়। "বান্ধবে" জগদ্বন্ধু বাবুর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে, সীতারাম রায়, পৃথ্বীরায়, আবুল ফজল, বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক, হীরক, মৌক্তিক, বাড়বানল, বায়ুমহাসাগর, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি এবং হিন্দুভূগোল নামক প্রত্নতত্ত্ব ঘটিত প্রবন্ধ বিশেষ প্রসিদ্ধ। "ঐতিহাসিক গল্প" ইঁহার সুন্দর স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ।

শিশির কুমার ঘোষ (১৮৪২-১৯১১)—মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সঙ্গীত শাস্ত্র নামে একখানি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। ইনি গৌরাঙ্গ ভক্ত পরম বৈষ্ণব। ইঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অমিয় নিমাই চরিত—যাহা আজিও বাঙ্গালা ভাষায় একখানি অমূল্য রত্ন। এতদ্ভিন্ন অমিয় ভাণ্ডার, কালাচাঁদ গীতা, নয়সো রূপেয়া, নরোত্তম চরিত প্রভৃতি রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি ইংরেজি ভাষায় লর্ড গৌরাঙ্গ নামক একখানি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। নয়সো রূপেয়াখানি সামাজিক নাটক।

কালীবর বেদান্ত বাগীশ (১৮৪২-১৯১১)—কালীবর বেদান্ত বাগীশ একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত; ইনি পাতঞ্জল দর্শন, গুরুশাস্ত্র, চরিত্রানুমান বিদ্যা, পূর্ব্বমীমাংসার্থ সংগ্রহ, বেদান্ত সংজ্ঞাবাণী, কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি, বেদান্ত সার, সাংখ্য দর্শন প্রভৃতি দুরূহ সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থের সরল অনুবাদ প্রচার করেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহার পরলোক রহস্যে ইনি বহুবিধ বৈদিক প্রমাণ ও ঘটনাদ্বারা পরলোকের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

বীরেশ্বর পাঁড়ে (১৮৪২-১৯১১)—বীরেশ্বর পাঁড়ে বঙ্গভাষার একজন চিন্তাশীল লেখক, ইঁহার ভাষাও বেশ ওজস্বিনী। ইঁহার রচনার মধ্যে মানবতত্ত্ব, ধর্ম্মবিজ্ঞান, আর্য্যপাঠ, আর্য্যচরিত, আর্য্যশিক্ষা, অদ্ভুত স্বপ্ন, স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব, ধর্ম্মশাস্ত্র তত্ত্ব ও কর্ত্তব্য বিচার, ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য; তন্মধ্যে কতকগুলি শিশুপাঠ্য ও অপরগুলি উচ্চপাঠ্য। উচ্চপাঠ্যগুলিতে দর্শন, বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক এত সারগর্ভ ও জটিল বিষয় এরূপ সুচারুরূপে বিবৃত হইয়াছে যাহা পাঠ করিলে প্রবীণেরাও যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। এরূপ উচ্চঅঙ্গের বাঙ্গালা পুস্তক তাঁহার সময়ে ছিল না বলিলেই হয়।

ইহার রচনায় যেমন সুমার্জ্জিত ভাষা তেমনি অতি উচ্চ ভাবসমষ্টি পরিলক্ষিত হয়। মানবতত্ত্ব একখানি রীতিমত উচ্চঅঙ্গের দর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ; ইহার বর্ণিতব্য বিষয় অতি জটিল, অতি দুরূহ হইলেও লেখক নিজ অসামান্য শক্তি ও যোগ্যতার বলে নিজ প্রস্তাব্য বিষয় কেমন প্রাঞ্জল ও বোধগম্য ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন তাহা পুস্তকখানি পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মানবতত্ত্ব হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:

"যাহার যে শক্তি আছে তাহা অবাধে প্রকাশ করিতে পারাকে স্বাধীনতা বলে; স্বাধীনতা চরিতার্থের অপর নাম সুখ। শক্তি প্রকাশের পূর্ব্বভাবের নাম ইচ্ছা। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইচ্ছাপূরণ বা সুখই মানবের উদ্দেশ্য। সুখসাধন হইলেই মানবের তৃপ্তি হয়। কিন্তু যখন বহু যন্ত্রসংযোগে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে, তখন মানবে নানা প্রকার শক্তি নিহিত আছে বলিতে হইবে। যতপ্রকার শক্তি মানবে আছে, তৎসমুদায়েরই শক্তি প্রকাশ করিতে পারিলে মানব সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইতে পারে, এবং তাহা হইলেই তাহার সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য করা হইল। কিন্তু তদন্তর্গত শক্তি সকলের কতকগুলি এরূপ পরস্পরবিরোধী যে একের তৃপ্তি সাধন করিতে হইলে অপরের বিরোধাচরণ করা হয়; সুতরাং এক বিষয়ে সুখী ও কর্ত্তব্যপর হইতে হইলে অপর বিষয়ে অসুখী ও কর্ত্তব্যবিরত হইতে হয়, এবং মনুষ্য সকল পরস্পর সমধর্ম্মী প্রযুক্ত একের শক্তি প্রকাশ করিতে হইলে অপরের শক্তি প্রকাশের বাধা হয়। সুতরাং একের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গেলে অপরের স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মে।"

ইনিও ভূদেববাবুর মত বাল্যবিবাহ প্রথার পক্ষাবলম্বী ছিলেন। এই

মানবতত্ত্বেই ইনি লিখিয়াছেন: "যখন বিবাহ বন্ধন যাবজ্জীবনের জন্য দৃঢ় করা একান্ত আবশ্যক তখন বাল্যকালে বিবাহ হওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত। তাহা হইলে দাম্পত্যপ্রণয় আজীবন দৃঢ় থাকিবার অধিক সম্ভব। অধিক বয়সে বিবাহে যে, সেরূপ হইতে পারে না, ইংলণ্ড ও আমেরিকা তাহার প্রমাণ; অধিক বয়সে বিবাহ হয় বলিয়াই তথায় নিত্য সহস্র সহস্র বিবাহ ভঙ্গের কারণ হইতেছে। কিন্তু ভারতে বিবাহ ভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, তথায় পতির মৃত্যুতে সতী আত্মদেহ বিসর্জ্জন করে। * * * বাল্য বিবাহে অধিক প্রণয় জন্মিবার আর এক কারণ এই যে, তখন স্ত্রী পুরুষ কোন বিশেষ সংস্কারাধীন হয় না, সুতরাং বিবাহান্তে উভয়ই একরূপ সংস্কার বিশিষ্ট হওয়াতে অধিক প্রণয়বান হয়। অধিক বয়সে বিবাহ হইলে স্ত্রী ও পুরুষের ভিন্নরূপ বিশ্বাস ও সংস্কার জন্মিতে পারে। * * বাল্যবিবাহের আর একটী উৎকৃষ্ট গুণ এই যে, ঐ সময়ে মিলন কালে দম্পতীর মনে কোনও অপবিত্র ভাবের উদয় হয় না। সে সময়ে তাহারা যেন কোন স্বর্গীয় ভাবে মিলিত হইতেছে বোধ করে।"

রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি, আই, ই, (১৮৪৩-১৯১১)—ইনি বঙ্কিমের যুগের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত, সদ্বক্তা ও সুলেখক। তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে দীনেশ বাবু তাঁহার 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্যে' লিখিয়াছেন—"ভাষা ওজস্বিনী, বাক্যগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড,—সমাসবদ্ধ, কিন্তু তাহার কোন অংশ হীনবল নহে,—এ যেন অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনু হইতে শরনিক্ষেপ করিতেছেন—সে গাণ্ডীব আর কাহারও ব্যবহার্য্য নহে,—মেঘনাদবধ কাব্যের মত উন্মাদনাময়ী ভাষা। ২০ মিনিটকাল শ্রোতারা যেন এক মহাকাব্য শুনিল * *

স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় আমরা সেই বক্তৃতাটি শুনিলাম, বঙ্গভাষার যে কি ভয়ানক শক্তি—সেদিন বুঝিলাম। * * বহু মনস্বী বাগ্মীর বাঙ্গলা বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু সেরূপ পাহাড় পর্ব্বত নিক্ষেপকারী দেবাসুরের ক্রীড়ার মত, অবাধ-স্রোতা ঐরাবত-বিজয়ী দুর্জ্জয় গঙ্গার মত,—বিপুল দম্ভময় মেঘগর্জ্জনের মত, শিবের প্রণবধ্বনির মত,—বিজয় দুন্দুভির মত—বঙ্গভাষার ধ্বনি আর কোথাও শুনি নাই। বৈষ্ণব কবিতার মাধুরীতে যে বঙ্গভাষাকে এলাইয়া পড়িতে দেখিয়াছি, কালীপ্রসন্নের বক্তৃতায় সেই ভাষাকে জয়শ্রীমণ্ডিতা সাম্রাজ্ঞীর মত দেখিয়াছি। বঙ্গভাষা যে জগজ্জয়ী হইবে—সেই শিশুকালে একটা অস্পষ্ট আভাসের ন্যায় তখন তাহা মনে হইয়াছিল।" ঐ পুস্তকেরই স্থানান্তরে লিখিয়াছেন "বাঙ্গালা দেশে তাঁহার (কালীপ্রসন্নের) মত কথাবার্ত্তার প্রতিভা আমি আর কাহারও দেখি নাই, তিনি বৃহস্পতির ন্যায় বাগ্মী ছিলেন, কথা বলিবার সময় মনস্বিতায় তাঁহার চোখদুটি যেন জ্বলিয়া উঠিত; দুইটি সুন্দর ঠোঁট উৎসাহিতভাবে কথা বলিবার সময় যেন একটু একটু কাঁপিত, কোন তেজস্বিনী নদীস্রোত পুষ্পিত লতার উপর বহিয়া গেলে যেরূপ কাঁপে। যাহা বলিতেন তাহা বড় বড় সমাসবদ্ধ পদে ঠিক পণ্ডিতের লিখিত ভাষার মত শুনাইত, প্রভেদ এই যে তাহা প্রাণের আবেগ বহন করিত। আভিধানিক শব্দগুলি তাঁহার ক্রীড়াকন্দুকের মত ছিল। তাঁহার ধনুতে জ্যা দিবার শক্তি অন্য কাহারও ছিল না; গাণ্ডীব যেরূপ পার্থের, বীণা যেরূপ নারদের তাঁহার ভাষা সেইরূপ তাঁহারই ছিল। তাহা অনুকরণকারীর নৈরাশ্য ও শ্রোতার চির-বিস্ময়।"

"বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তাঁহার সাহিত্যসুনাম প্রভূতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল।"

ইঁহার মত প্রগাঢ় চিন্তাশীল লেখক বাঙ্গালা ভাষায় বিরল। ইঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা, নিশীথচিন্তা গভীর গবেষণার জলন্ত দৃষ্টান্ত; অপর গ্রন্থের মধ্যে পার্কারের জীবনচরিত, আমেরিকার সভ্যতা (পাণ্ডুলিপিতেই অপহৃত), সঙ্গীত মঞ্জুরী, সমাজ-শোধিনী, বিবাহ-রহস্য, ভক্তির জয়, ছায়া দর্শন, মা না মহাশক্তি, ভ্রান্তি বিনোদপ্রমোদ-লহরী, জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালী-প্রসন্নের মত একাধারে পণ্ডিত, বাগ্মী, চিন্তাশীল ও সুলেখক ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গে আর দেখা যায় না। ভক্তির জয়ে ভক্ত-প্রবর যবন হরিদাসের জীবন-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গবাণী প্রণেতা শশাঙ্ক মোহন সেন কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যিনি বঙ্গবাণীর আপন চিত্তসঞ্জাত উজ্জ্বল শুভ্র সন্দর্ভ-মুক্তাহার পরাইয়াছিলেন, তাঁহাকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যে বহুমানিনী করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই মুক্তা হাঁরকের ন্যায় দীর্ঘজীবী বা বহুমূল্য হইবে কি না, তদ্বিষয়ে বিচার করা আমাদের প্রয়োজন নাই। দেখিতেছি, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া সেই মুক্তা অকুণ্ঠিত উজ্জ্বলতায় মাতৃকণ্ঠে শোভা পাইতেছে; রসজ্ঞ পাঠক বা বঙ্গীয় লেখক মাত্রেই দীপ্তি এবং ওজস্বিতা লাভার্থে তাহার সম্মুখীন হইতেছেন এবং উহা হইতে নানা মতে উপকৃত হইতেছেন। * * *

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন, ইঁহারা বঙ্গসাহিত্যে বিশ্বসাহিত্যের মহাপ্রবাহ আনিয়াছেন; প্রত্যেকে স্বকীয় হৃদয়ের বিশিষ্ট রসেও এ সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। * *

সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গসাহিত্য গদ্যবিভাগে নবজীবনের শৈশবেই দুইজন কৃতী পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারা বাঙ্গালীকে অসীমের

অন্থে দীক্ষিত করিবার জন্য চিরজীবন অস্খলিত সাহিত্যসাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। সে দুইজন যে কালীপ্রসন্ন ও বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বঙ্গবাসী বিনা বিচারেই স্বীকার করিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র কবিগুণসম্পন্ন শিল্পী; তিনি আকৃতিপ্রকৃতির ভিতর দিয়া মহানকে এবং অব্যক্তকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি কপালকুণ্ডলা, ভ্রমর বা প্রতাপের মধ্যে মনুষ্যত্বপথে সেই অসীমের অনুভবভূমিতে উঠিতেই চেষ্টা করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন কবিগুণসম্পন্ন দার্শনিক; তিনি তারা ও ফুলে, সাহিত্যে ও জাতীয় বিকাশে, প্রজা ও রাজশক্তিতে ভক্তিতে এবং রসপরিহাসে, প্রভাতে সন্ধ্যায় নিশীথে, সজনে ও বিজনে, ইহকালে ও পরকালে, চিন্তা এবং ভাবুকতার পথে সেই অসীম অব্যক্ত এবং অমৃতকেই উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন! বঙ্গসাহিত্যে, বাঙ্গলা গদ্যে সমুন্নত অথচ বীর্য্য পৌরুষ যুক্ত ভাবুকতার উচ্ছ্বাসধারণায় কালীপ্রসন্নই অগ্রণী!

সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তম এবং পূজ্যতম পদার্থ লেখকের হৃদয়। যে লেখক উদার হৃদয় পাইয়াছেন ও তাহাকে অনাবিল ভাবে প্রকাশ করিবার ভাষা পাইয়াছেন, সাহিত্যে তাঁহারই জয়। * * কালীপ্রসন্নের বুদ্ধিও সর্ব্বথা হৃদয়ানুসারিণী ছিল! প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা বা ভক্তির জয় প্রভৃতি গ্রন্থে সর্ব্বত্র সেই বিপুল, ওজস্বা এবং তড়িৎ-বিভাসী হৃদয়েরই পরিচয় পাই! ওই হৃদয় একদিকে যেমন শিশুর মত সরল, অন্যদিকে তেমনই গহন প্রবৃত্তি এবং রাজশ্রীতেই সমুন্নত ছিল। তাঁহার ভাষা একদিকে যেমন সরল ও ঋজুগতি, অন্যদিকে তেমনই জ্যোতির্বিলসিত বিপুল আবর্ত্তে কল্লোলিনীর মত ছুটিয়া চলিত! তাঁহার হৃদয় কিংবা তাঁহার আধ্যাত্মিকতা, সংন্যাসীর

হৃদয় অথবা শুষ্ক বৈরাগীর আধ্যাত্মিকতা নহে—অপরূপ জ্ঞান-কর্ম্মে, শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যে উল্লাসী, অপ্রমত্ত অথচ সুখী, ক্ষত্রিয়ের আধ্যাত্মিকতা! তিনি জ্ঞানী হইয়াও বৈরাগ্য বিলাসী কিম্বা দুঃখবাদী নহেন। আবার রামই তাঁহার প্রিয় আদর্শ; যুধিষ্ঠির নহেন; সুতরাং তিনি রামায়ণে প্রেমের পরাকাষ্ঠা এবং মহাভারতেও প্রেমের অভাব দেখিয়াছেন! এই কারণেই তাঁহার হৃদয় বিশ্বময় অমৃত-তত্ত্বের অন্বেষণে এবং প্রত্যক্ষীকরণে ধাবিত হইয়াছিল; ঐহিক অমরতার স্বপ্নেও বিস্ফারিত হইয়াছিল! বঙ্গসাহিত্যে এবং এতদ্দেশের মৃত্তিকায় এই প্রকৃতির হৃদয় ও আধ্যাত্মিকতা নূতন! * উহা হয়ত সর্ব্বদিকে সর্ব্বরূপে প্রস্ফুটিত ও পূর্ণাবয়ব হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে নাই; ভবিষ্যতের সৌভাগ্যবান সাধকের অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু, বঙ্গসাহিত্যে ইহা নূতন। ইংরাজী সাহিত্যে এ জাতীয় ভাষাপদ্ধতির পরিচয় পাই মিলটনে ও বার্কে; এজাতীয় ভাবনা পদ্ধতির পরিচয়—পাই কার্লাইলে এবং এমার্সনে। উহা পাশ্চাত্য আর্য্যপণ্ডিতের প্রকৃতি। * *

কালীপ্রসন্ন বাগ্মী ছিলেন। বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয় বক্তা বলিয়া তাঁহার আসন সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে নির্ব্বিশেষে শুনিয়াছি, অন্বর্থ এবং উল্লসিত ত্বরিত বাক্যঘটায় হৃদয়কে তদ্গত আনন্দে অধিকার করিতে বঙ্গভাষার যে এত শক্তি আছে, তাহা তাঁহারা কালীপ্রসন্নের বক্তৃতা শ্রবণের পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কবি হেমচন্দ্রের অন্ত্যেষ্টি-স্মৃতি-সভায় কালীপ্রসন্ন সভাপতিরূপে কলিকাতায় আহূত হন। সে সময়ে বঙ্গদেশের রাজধানীর সমস্ত প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র একবাক্যে বঙ্গভাষার এই অপূর্ব্বদৃষ্ট ঐশ্বর্য্যশক্তির

প্রশংসা করিয়াছিলেন ; ইহা কালীপ্রসন্নের সামান্য গৌরব বা প্রতিপত্তির কথা নহে।

কালীপ্রসন্নের হৃদয় নিয়ত ভাবের উচ্চগ্রামে বিচরণ করিতেই স্ফূর্ত্তিলাভ করিত—তাঁহার কণ্ঠও তারস্বরে বিলসিত হইত। * * সাহিত্য-ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে তাঁহার নিরাবিল সহৃদয়তা, সাহিত্যসেবীর প্রতি তাঁহার সদয় সহানুভূতি আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। * *

বঙ্গভাষা এখন নানা সাহিত্য ও প্রতিভার সংসর্গে বহুমুখী হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন ; কাব্যে সঙ্গীতে, ইতিহাসে উপন্যাসে, দর্শনে এবং সন্দর্ভে বঙ্গভাষা এখন নানা মূর্ত্তি ও প্রবৃত্তি আশ্রয় করিয়া আপনার সাফল্যকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। * * [কালীপ্রসন্ন] স্বয়ং এ সাহিত্যের শক্তি-সাধন করিয়া উহার পরিপুষ্টি এবং পরিণতি বিষয়ে অতন্দ্রিতভাবে সেবা-তৎপর থাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন। * *

কালীপ্রসন্ন প্রাকৃত বাক্য-প্রণালীর সবিশেষ বিরোধী ছিলেন ; * * অনেক ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে 'কালীপ্রসন্নের লেখা যে অতি কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য, এইরূপ বিচার-বাক্য নির্লজ্জ গর্ব্বে প্রচারিত হইতেও শুনিতে হয় ! * *

কালীপ্রসন্ন অপেক্ষা জটিল বা গভীর ভাবগ্রাহী লেখক হয়ত বঙ্গ-সাহিত্যে জন্মিয়াছেন ; কিন্তু ভাবানুগত ভাষার স্থির শক্তি, উল্লসিত গতি এবং ঐশ্বর্য্যের বিষয়ে কালীপ্রসন্ন অদ্বিতীয়। নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব ও প্রভাত চিন্তার আনন্দ-স্তব্ধ 'নীরব কবি' হইতে 'ছায়াদর্শনের' অনন্ত ব্যাপিনী অনবরত তৃষা-পর্য্যন্ত, যে বৃহৎ, মহৎ ও উদার হৃদয়ের আত্মজীবনী প্রকটিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বত্র ভাষা এবং ভাবনার রীতির একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, গভীর ঐক্যসূত্র এবং

সামঞ্জস্য আছে। উহার ভিতর বিপুল সমুদ্রের অনন্তমুখিন্ প্রাণাবেগ এবং দীর্ঘনিশ্বাস ও প্রত্যক্ষরসিতকতার পরিচয় আছে; মনুষ্যের নিকটে নিজের বরিষ্ঠ এবং অনন্ত মুহূর্ত্তগুলির সুসম্বাদ বহন করিবার একনিষ্ঠ প্রয়াস আছে। ইহাই তাঁহার সাহিত্য-সাধনা; তিনি এই সাধনায় কর্ম্মোপযুক্ত সিদ্ধিলাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ধন্য হইয়া গিয়াছেন। আমাদে হৃদয় অদ্য তাঁহার এই মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ!"

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (১৮৪৩—?)—

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার রচনার মধ্যে শরৎশশী, বিজ্ঞান দর্শক, হরিদাস সাধু ও চিত্ত চৈতন্যউদয় উল্লেখযোগ্য।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)—

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রসিদ্ধ নাটককার ও অভিনেতা; ইনি বঙ্গীয় নাট্যজগতে যুগান্তর আনয়ন করেন; এইজন্য অনেকে ইঁহাকে "বাঙ্গালার গ্যারিক" আখ্যা দিয়া থাকেন। উপন্যাসে যেমন বঙ্কিম, নাটকে সেইরূপ গিরিশচন্দ্র। ইনি পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, ধর্ম্মমূলক প্রভৃতি অন্যূন ৭০ খানি বাঙ্গালা নাটক গীতিনাট্য ও প্রহসন রচনা করেন। ইনিও এই বঙ্কিমের যুগের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। ইহার ভাষা যেমন মধুর তেমনি ওজস্বিনী, যেমন প্রাঞ্জল তেমনি প্রাণস্পর্শী—নাটকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। এই জন্যই ইহাকে বাঙ্গালার নাট্যসম্রাট বলে। নাট্যজগতে ইঁহার প্রতিভা ও প্রভাব চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

প্রসিদ্ধ সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার বাণী-মন্দির নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন: "গিরিশচন্দ্র ঘোষের পাখা ছিল না, তাই তিনি

ভাবের আকাশে উড়িতে চেষ্টাই করেন নাই; আস্ত সমতল মাটীর উপর দিয়া পায়চারি করিয়াই গিয়াছেন। * * কবিত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, তাঁহার বিপুল নাট্যরাজী হইতে কতিপয় সঙ্গীত ব্যতীত তদনুরূপ দশটী পংক্তি পরিচিহ্নিত করাই দুষ্কর! অথচ গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ মনীষা; সহানুভূতির শক্তিও বিপুল; পাণ্ডিত্য—অন্ততঃ এলিজাবেথ-যুগের ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যের পুঁথিবিদ্যাও সামান্য নহে। সে যুগের বিলাতী নাট্যকারগণকে ইনি যেন ছেঁচিয়া—পুড়িয়া খাইয়া হজম করিয়া বসিয়াছেন; পদে পদে তাঁহাদের শিল্পকৌশল, ঘটনা ও অবস্থার সংস্থান এবং সংযোজনা তাঁহার লেখনীতে আসিয়া পড়িয়াছে। তথাপি, আমাদের হৃদয় ডাকিয়া উঠে, কোনরূপ সাহিত্য রচনায় তিনি যেন লক্ষ্যই করেন নাই। তাঁহার একটী নাটকও যেন 'কাব্য' নহে, গদ্যও নহে, সুন্দর পদ্যও নহে—তাঁহার নিজের কথায় 'গৈরিশী' ছন্দে রচিত হইলেও পদ্য নহে। মধুসূদন বা হেম নবীনের সমকক্ষ ভাবুকতা ত দূরের কথা, তুলনযোগ্য বাক্যশক্তি, বিবরণী কিংবা বর্ণণী শক্তির পরিচয়ও গিরিশচন্দ্রে পাওয়া যায় না। প্রকৃত বাণীপুত্রের কথার মধ্যেই যে একটা 'সাধনা'র গন্ধ থাকে, একটা 'সাধা গলা'র আমেজ এবং বৈশিষ্ট্য থাকে এই বিপুলকর্ম্মা লেখকের মধ্যে তাহারই অভাব! ভাষা এত সাধারণ এবং ভাবুকতা এত দুর্ব্বল যে, কথার বাঁধুনি এত শিথিল ও শব্দশক্তি এত বৈশিষ্ট্যহীন এবং কাহিল যে কোথাও উচ্চ সাহিত্যের উপযোগী মনস্বিতা কিংবা তেজস্বিতা লাভ করিতে পারিতেছে না। সাহিত্যের প্রথম বস্তু যে ভাব, তাহার দিকে দৃষ্টি একেবারেই নাই। মনুষ্যজীবনের কোন গভীর সমস্যার ধারণা, জীবনের আলেখ্য রচনাতে উচ্চ সাহিত্যের উপযোগী কোনরূপ সূক্ষ্মতা কি গভীরতার পরিচয় কিংবা

কোন প্রকার মনোমত্তা ও উচ্চ শ্রেণীর মনোজীবনের প্রমাণ গিরিশ-চন্দ্রের মধ্যে উদগ্র হইতে পারিতেছে না! সাধারণ তাঁহার শ্রোতা; সাধারণ বিষয়; বক্তাও কোনদিকে অসাধারণ নহেন। বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের পূজনীয় পদবী—বঙ্গদেশের সাধারণ সামাজিকের শিক্ষাব্যাপারেও সুতরাং তাঁহার গৌরবময় স্থান। কিন্তু বিপুল বিস্তারিত সারস্বতশক্তির লীলাব্যাপারসত্ত্বেও উহাতে যে সমুচ্চ 'সাহিত্য'-আদর্শের সৌন্দর্য্যপ্রকাশ কিঞ্চিন্মাত্র না ঘটিতে পারে, উহা যে 'কাব্য' আদর্শের একেবারে পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতে পারে; তাহার দৃষ্টান্তস্থান গিরিশচন্দ্র। অথচ গিরিশচন্দ্র পল্লবগ্রাহী নহেন; পাতলা মতি বা অস্থিরচরিত্রের ব্যক্তি নিশ্চয়ই নহেন; সাহিত্যক্ষেত্রে কোনরূপ দুর্বৃত্ততা কিংবা দৌরাত্ম্যও তাঁহার নাই। তথাপি শতসংখ্যক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াও, বাণীমন্দিরের অন্তরঙ্গ সাধকরূপে তিনি আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছেন না! এ-ব্যাপারের হেতুযোগ কোথায়, এ অনর্থের মূল কোথায় সাহিত্যসেবক তদনুসন্ধানে কোন সময় ব্যয় করিলে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অপব্যয় হইবে না।

গিরিশচন্দ্র যাহাই লেখেন তাঁহার হৃদয়ের সঙ্গে যেন উহার প্রকৃত যোগ নাই। নিজের বহির্ব্বাটীর 'বৈঠকখানা'য় বসিয়া গিরিশচন্দ্র যেন কেবল বুদ্ধিসংযোগে অভিনয় করিয়া যাইতেছেন; অপর কোন একব্যক্তি উহা লিখিয়া চলিয়াছে! এই সাময়িকতা, সময়—সেবা ও তন্মুহূর্ত্তে লিপিবদ্ধ করার অপিচ dictate করার গন্ধ গিরিশচন্দ্রের প্রত্যেক রচনাতেই সহৃদয়বেদ্য হইয়া আছে!"

বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা শশাঙ্কবাবুর সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না। তবে, গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে এক শ্রেণীর,

অন্ততঃ একজন বিশিষ্ট সমালোচকের, স্বাধীন মত হিসাবে উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশ প্রদর্শিত হইল। আমাদের মতে গিরিশচন্দ্রে দোষ থাকিলেও তাহা গুণের আধিক্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৪) কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সর্ব্বদাই যত্নবান থাকিতেন। ইনি বাঙ্গালায় 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' নামক একখানি দর্শনমূলক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াগিয়াছেন।

চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১৪)—শকুন্তলাতত্ত্ব, ত্রিধারা, ফুল ও ফল, ভারতরত্নমালা, কঃ পন্থা, নারসিংহপুরাণ, পৃথিবীর সুখদুঃখ, হরিবংশ, যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, হিন্দুত্ব, সংযমশিক্ষা, সাবিত্রীতত্ত্ব, বর্ত্তমান বাঙ্লা সাহিত্যের প্রকৃতি, পশুপতিসংবাদ, বেতালে বহুরহস্য প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এতদ্ব্যতীত নূতনপাঠ প্রভৃতি বালকগণের পাঠোপযোগী স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও কয়েকখানি রচনা করিয়াছিলেন। ইংরেজিতে পণ্ডিত হইলেও ইঁহার রচনায় ইংরেজির প্রাধান্য নাই ; প্রত্যুত ইঁহার রচনায় যথেষ্ট মৌলিক গবেষণা পরিলক্ষিত হয়।

বাঙ্গালায় ইনি একজন সুদক্ষ সমালোচক। শকুন্তলাতত্ত্ব ইঁহার সমালোচনাশক্তির নিদর্শন ; এই পুস্তকে তিনি মহাকবি কালিদাস প্রণীত সংস্কৃত নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলের সমালোচনা প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার মতের সহিত অপরের মতের অনৈক্য থাকিতে পারে। তিনি এই পুস্তকে কালিদাসকে শেক্ষপীর অপেক্ষাও বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অন্যে তাঁহার এই মত সমর্থন না করিলেও, এই পুস্তকখানি তাঁহার স্বাধীন নিরপেক্ষ অনুশীলনের ফল—বলা যাইতে পারে। পুস্তক

খানির ভাষাও সুললিত, প্রাঞ্জল এবং হৃদয়স্পর্শী; দৃষ্টান্তস্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম : "শাঙ্গ‍র্রব ঋষিকুমার। তাঁহার ধনবল, বাহুবল, লোকবল, কোন বলই নাই। কিন্তু তাঁহার কথা শুনিলে বোধ হয় যে তিনি কোন বলই গ্রাহ্য করেন না, পার্থিববল, পার্থিব শক্তি, পার্থিবসম্পদ, তাঁহার কাছে কিছুই নয়। তাঁহার সাহস এবং তেজ দেখিলে বোধ হয় যে তিনি রাজার প্রজা নন, রাজার রাজা। তিনি রক্ত মাংস নন, তিনি ব্রহ্মতেজ। তিনি শান্তি নন, তিনি প্রজ্জ্বলিত হুতাশন। রাজরাজেশ্বর দুষ্মন্ত যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে শকুন্তলাকে বঞ্চনা করিয়া আমার কি লাভ হইবে তখন তিনি সক্রোধে বলিলেন :— বিনিপাত :।

হস্তিনাপুরের রাজবাটীতে অসীম মহিমামণ্ডিত পুরুসভায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—'বিনিপাতঃ।' মহর্ষি কণ্ব হিমাচলের ন্যায় দরদর ধারায় গলিতেও পারেন এবং বিসুবিয়সের ন্যায় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেও পারেন! কল্পনা তাঁহাকে কেমন করিয়া আঁটিবে! চিন্তা তাঁহাকে কেমন করিয়া আয়ত্ত করিবে!

যদিও মহর্ষি কণ্বের সম্পর্কে শাঙ্গ‍র্রব এবং শারদ্বত একই ব্যক্তি, কিন্তু কণ্ব হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে তাঁহাদের মধ্যে অতি চমৎকার প্রভেদ লক্ষিত হয়—দুইজনকে প্রকৃষ্টরূপে দুই ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। * * শাঙ্গ‍র্রব কিছু বাহ্যদর্শী; শারদ্বত অন্তর্দর্শী। * * শাঙ্গ‍র্রব ব্যহ্যজগতের কবি; শারদ্বত অন্তর্জগতের কবি। শাঙ্গ‍র্রব বাহ্যস্ফুর্ত্তি; শারদ্বত অন্তর্দৃষ্টি অথবা আধ্যাত্মিকতা। শাঙ্গ‍র্রব এবং শারদ্বতের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। আমরা যতক্ষণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই, ততক্ষণই সেই প্রভেদ লক্ষিত হয়। * * *

প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার প্রিয় সখী। এমন সখী কিন্তু কেহ কোথাও দেখে নাই। অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িতে পড়িতে বোধ হয় যে শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া এই তিনটীতে একটি। তিনটি একত্রে প্রতিপালিত ; তিনটির একত্রে শয়ন, ভোজন, উপবেশন ; তিনটির একই কাজ ; তিনটিরর এক চিন্তা, এক হৃদয়। তিনটি পরস্পর যে কত ভালবাসে তা বলিতে পারা যায় না। * * শকুন্তলার এবং প্রিয়ম্বদার একই বয়স, কিন্তু বোধ হয় যেন অনসূয়ার বয়স তাঁহাদের অপেক্ষা কিছু কম। * * প্রিয়ম্বদা রঙ্গ করিতে ভাল বাসেন ; শকুন্তলা রঙ্গ বুঝেন, কিন্তু রঙ্গ করিতে পারেন না ; অনসূয়া রঙ্গ করিতে শেখেন নাই। অনসূয়া কিছু বালিকা বালিকা রকম। * * অনসূয়া সরলা বালিকা, প্রিয়ম্বদা পাকা ঘটকী। তারপর যখন দুষ্মন্ত উপস্থিত হইলেন তখন অনসূয়া তাঁহাকে বসিতে আহ্বান করিলেন, কিন্তু কাজের কথা প্রিয়ম্বদা কহিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে নির্জ্জনে রাখিয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ হইল তখন প্রিয়ম্বদাই একটা ছল করিয়া অনসূয়াকে লইয়া চলিয়া গেলেন। অনসূয়াটি ফুলের কুঁড়ি—এখনও ফুটে নাই, কিন্তু ফোট ফোট। শকুন্তলা-ফুলটি ফুটিয়াছে—কিন্তু নববিকসিত পদ্মের ন্যায় সে ফুলের সমস্ত গৌরব পাপড়ি ঢাকা। প্রিয়ম্বদা গোলাবফুল—কুঁড়ি ফুটিয়াছে মাত্র ; কিন্তু তাহাতেই চারিদিকে সুগন্ধ ছড়াইতেছেন। অনসূয়ার কিছু ভারি রকম প্রকৃতি—কিন্তু তাঁহার তুলনা আছে। প্রিয়ম্বদা হাস্যময়ী চপলা—তাঁহারও তুলনা আছে। কিন্তু শকুন্তলার তুলনা নাই—তিনি নারী-প্রকৃতির প্রতিমা অথচ একটি ভুবনমোহিনী রমণী। * * *

* * * এত গভীর এবং ব্যাপক নাটকত্ব অতি অল্প নাটকেই আছে। যে কয়খানা নাটকে আছে বোধ হয় তাহাদের সংখ্যা তিন কি চারিখানার বেশী হইবে না। অভিজ্ঞানশকুন্তল সেই তিন চারি খানার মধ্যে একখানা। গেটের 'ফাউষ্ট' আর একখানা। সেক্সপীয়রের 'রোমিও এবং জুলিয়েট'ও আর একখানা বটে, কিন্তু অভিজ্ঞান শকুন্তল এবং 'ফাউষ্ট' অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট। * * *

কালিদাস! তোমার কাব্যের আধ্যাত্মিক গভীরতার পরিমাণ কে করিবে। দেব! তুমি শুধু ভারতের কালিদাস নও; তুমি জগতের কালিদাস। লোকে না বুঝিয়া সেক্সপীয়রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকে, 'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।' "

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (১৮৪৪-১৯১৯)—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' নাম দিয়া কয়েকখানি পদ্য ও গদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ভক্তি চৈতন্যচন্দ্রিকা, ইহকাল পরকাল, কেশবচরিত, বিধান ভারত, পথের সম্বল, গীতরত্নাবলী, বিংশশতাব্দী, গরলে অমৃত, কলি সংহার, যৌবন সংহার, ব্রহ্মগীতা, নববৃন্দাবন, যুগলমিলন, ঈশা-চরিত, সাধু অঘোরনাথ, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত—ইঁহার উল্লেখযোগ্য পুস্তক। ইঁহার বাল্যসখা কয় ভাগ এককালে শিশুদিগের জ্ঞানগর্ভ পাঠ্যপুস্তক ছিল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪৪-১৯০৯)—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন খুব বৈচিত্র্যময় বটে; হিন্দুর সন্তান কেশবসেনের দলে মিশিয়া হঠাৎ উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পরে আবার কেশবসেনের কন্যার সহিত কুচবিহারের মহারাজার বিবাহ লইয়া কেশব সেনের সহিত মত ভেদ হওয়ায় ইঁহারই উদ্যোগে সাধারণ ব্রাহ্ম-

সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষ জীবনে ইনি পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও পুনরায় উপবীত ধারণ করেন। পুরীতে ইনি অনেক দিন যাপন করেন ও পুরীর উন্নতি বিধান কল্পে অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রথম বয়সে বিশেষ যত্নের সহিত সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সারাজীবন ধর্ম্ম লইয়া কাটাইয়াছিলেন; অনেক দিন পরিব্রাজক ভাবেও ছিলেন। ইঁহার রচিত ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর একখানি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ; তাঁহার জীবনব্যাপী ধর্ম্মচর্চ্চার সারাংশ ইহাতে সন্নিবেশিত আছে।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৫—১৮৯১)—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বর্ণলতা, তিনটী গল্প, অদৃষ্ট, হরিষে বিষাদ, ললিত সৌদামিনী প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। কোন ইংরেজি সমালোচক বলিয়াছেন কবি গ্রে যদি অন্য কিছু না লিখিয়া শুধু Elegy written in a Country Churchyard লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি ইংরেজি লেখকদিগের মধ্যে চিরস্মরণীয় হইতে পারিতেন। তারকনাথবাবুও শুধু স্বর্ণলতা লিখিয়া গেলে বাঙ্গালার একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারিতেন। তাঁহার স্বর্ণলতা ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হইয়া অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বালকগণের পাঠ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ স্বর্ণলতার মত নিখুঁত গার্হস্থ্য চিত্রপূর্ণ উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল।

ডাক্তার রামদাস সেন (১৮৪৫—১৮৮৭)—

ডাক্তার রামদাস সেন আর একজন ধনী সাহিত্যিক। ধনীর সন্তান হইয়াও, ইনি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বা মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মত অত্যন্ত সাহিত্যামোদী লোক ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই

ইনি সংবাদ পত্রে পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ সমস্ত প্রবন্ধ পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত, শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইঁহার ঐতিহাসিক রহস্য, ভারত রহস্য ও রত্নরহস্য,—সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে প্রচুর মৌলিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ। "ইঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থ ভারতবর্ষ, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে আদরপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইনি ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন বৃত্তান্ত অনেক দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থ এবং তাম্রশাসনাদি হইতে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছেন।" *

প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিয়া ইঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। ইটালীর ফ্লোরেন্স নগরের Oriental Academy হইতে ইনি Doctor উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি "কলিকাতা লণ্ডন প্রভৃতি স্থানের অনেক সভার সভ্যপদে নিযুক্ত [ছিলেন]। ইনি ভট্ট মোক্ষমুলর, বুলার প্রভৃতি ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের নিকট পত্র লিখিয়া প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে মতামত [আনয়ন করিতেন]।" *

নানা স্থান নানা দেশ হইতে বহু ব্যয়ে বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ইনি বহরমপুরের প্রসিদ্ধ পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। বড় দুঃখের বিষয় ইনি অল্প বয়সে কালগ্রাসে নিপতিত হন। অধিক দিন বাঁচিলে ইঁহার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের আরও অনেক উপকার হইতে পারিত।

রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, (১৮৪৫-?)— রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালাভাষায় স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রাকৃত ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া বিপুল অর্থ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

* দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫—১৯০৬)—মহারাজা নন্দকুমার, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ, লর্ড মেটকাফের জীবনী, অযোধ্যার বেগম, ঝান্সীর রাণী, টমকাকার কুটীর, এই কি রামের অযোধ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি ইঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিতে যতদূর সম্ভব ঐতিহাসিক সত্য বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক সঙ্কলন করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; এই নিমিত্ত ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে ইঁহার গ্রন্থগুলি সমধিক মূল্যবান। ইঁহার রচনা যেমন হৃদয়গ্রাহিণী ভাষাও তেমনি ওজস্বিনী।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬—১৯১৭)—

অক্ষয়চন্দ্র সরকার বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও সমালোচক। ইঁহার পিতা গঙ্গাচরণ সরকার ১২৮৬ সালে ঢাকা কলেজগৃহে বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক রচনার প্রথম প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে। অক্ষয়চন্দ্রের পুত্র অজরচন্দ্রও একজন বর্ত্তমান খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী। কমলাকান্তের দপ্তরে 'চন্দ্রালোকে' প্রবন্ধটী অক্ষয়চন্দ্রেরই লেখনী-প্রসূত। এতদ্ভিন্ন বঙ্গদর্শন, সাধারণ ও নবজীবন প্রভৃতি পত্রাদিতে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ ইঁহার বহুপ্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। দীনেশবাবু বলিয়াছেন—"যখন বাঙ্গালী ইংরাজী সাহিত্যের অনুরাগে অন্ধ হইয়া দেশীয় পুঁথিগুলিকে তামাকপাতার মত অশ্রদ্ধেয় মনে করিত, তখন ইনি ইংরাজী সাহিত্যানুরাগী হইয়াও তারতম্যে বাঙ্গালা গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন।"

ওকালতি ছাড়িয়া দিয়া অক্ষয়কুমার চিরজীবন সাহিত্য সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। ইঁহার প্রণীত সনাতনী, কবি হেমচন্দ্র, গোচারণের মাঠ, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, আলোচনা, হাতে হাতে ফল, পিতাপুত্র,

মোতি কুমারী, সাহিত্য পাঠ, সাহিত্য-সাধনা, মহাপূজা, রূপক ও রহস্য প্রভৃতি পুস্তক বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত। এতদ্ব্যতীত অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গালার তৎকালীন সমাজ-জীবনের একটী ইতিহাস রচনা আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি এই প্রবন্ধটী বঙ্গশ্রীতে বাহির হইতেছে। সমালোচক হিসাবেও বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার স্থান অনেক উচ্চে। কবি মধুসূদনের সহিত কবি হেমচন্দ্রের তুলনা কল্পে ইনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম: "কিন্তু হেমচন্দ্র মধুসূদনের এরূপ ভক্ত, এরূপ গোঁড়া, এরূপ শিষ্যানুকল্প হইয়াও 'মিতাক্ষর' গ্রহণ করেন নাই। কেন করেন নাই, তিনি জানেন। ভাল করিয়াছেন. কি মন্দ করিয়াছেন এখন আমি বলিতে পারিব না। তবে একটা কথা প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, যদি 'মিতাক্ষর' কেবল নিগড়-বন্ধনমোচনের জন্য প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে সেটা কিছু মহদুদ্দেশ্য সাধন নহে। চূড়, বলয়, অনন্ত—এগুলি ত নিগড় বটে। বাহুলতা বহিয়া রূপ খসিয়া খসিয়া পড়ে, তাই বলয়-চূড়-অনন্ত-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে শোভা বাড়ে, না কমে? তালও ত সুরের নিগড়। ঐ নিগড় ভাঙ্গিলেই কি ভাল? তা নয়। দশরূপ নিগড়েই মনুষ্যত্ব। দশরূপ নিগড়েই কবিত্ব। নিগড়েই সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও বৃদ্ধি। ছন্দে উঠে রবি-শশী। ছন্দত নিগড়। নিগড় সৌর জগতে; নিগড় কাব্য-জগতে। নিগড়-ছেদনই আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

যে কারণেই হউক হেমচন্দ্র মধুসূদনের মিতাক্ষর গ্রহণ করেন. নাই। তবে মধুসূদনের কবিত্ব তিনি বিশেষ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কবি যেমন আর একজন কবিকে আয়ত্ত করেন, আমরা তেমন কখন পারি না। * * বীরকাব্যে হেমচন্দ্র সকল অনুকারীর ন্যায় ওস্তাদের

নিম্নস্তরে। প্রসাদগুণে হেমচন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের নিম্নে; সমকালবর্ত্তী 'শিক্ষিত' মধুসূদনেরও নিম্নে। * * বৃত্রসংহারে ছন্দ-বৈচিত্র্য থাকাতে লাভ হয় নাই। ওজোগুণে ব্যাঘাত হইয়াছে; মাইকেলের কবিতা মিতাক্ষর পয়ারের পটতালে গরীয়সী হইয়াছে। তবে যুদ্ধ-বর্ণনা,—ওটি আমি ভাল বুঝি না।"

এইস্থলে আমরা অক্ষয়চন্দ্রের স্বরচিত জীবন চরিতের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। ইহা হইতে যে কেবল তাঁহার রচনা পারিপাট্যের বা তাঁহার সুনিপুণ সমালোচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহা নহে; অধিকন্তু ইহা হইতে সে সময়ের ও তৎপূর্ব্ব সময়ের অনেক মূল্যবান তথ্যও অবগত হইতে পারা যাইবে এবং তৎসঙ্গে অতি সংক্ষেপে অথচ অতি নিপুণ ভাবে বিবৃত সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের এক ইতিবৃত্ত পাওয়া যাইবে। এই নিমিত্তই এ উদ্ধৃতাংশ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়া গেল;—

"প্রথম গদ্য লেখক, রাজীব লোচন রায়। তিনি আন্দাজি ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের রাজ বংশের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয় গদ্য-গ্রন্থকার রাম রাম বসু। তিনি প্রতাপ আদিত্যের জীবন চরিত লেখেন। এইদুই গ্রন্থই বিলাতে লণ্ডনে ছাপা হয়। * * * তৃতীয় গদ্য গ্রন্থকার মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার। * * * মৃত্যুঞ্জয় নবাঙ্কুরিত বঙ্গগদ্য সাহিত্যের একজন প্রথম পথ প্রদর্শক। তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে তিনি স্বয়ং ভাষার সকলরূপ গতি, সকলরূপ পন্থা স্বয়ং দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়াছেন এবং সকলকে দেখাইয়া দিয়াছেন। * * *

তখনকার [গঙ্গাচরণ সরকারের সময়ের] সাহিত্য সেবা যেন দেবতার পূজা। এখনকার আমাদের সাহিত্য-সেবা যেন এনা-

টমিক্যাল ডিসেক্‌সন্‌। অস্থিমাংস চর্ম্মের ব্যবচ্ছেদ। একখানি সাহিত্য গ্রন্থ পাইলে, আমরা করি কি, দুইছত্র পড়িতে না পড়িতেই সমালোচনার ছুরী বাহির করিয়া, তাহার ভাষা চিরি, তাহার ভাব চিরি, তাহার অলঙ্কার চিরি, ইতিহাস চিরি, খণ্ড ২ করি, তাহার পর আবার বোতলে পূরিয়া মেডিক্যাল কলেজে পাঠাইয়া দিই। বলি, আমিত সামান্য ডাক্তার, এই করিয়াছি; তুমি সাহিত্য-জগৎ,—কেমিক্যাল একজামিনার, রসায়নিক পরীক্ষক,—তুমি একবার এসিড দিয়া, ঘৃণা দিয়া, অবজ্ঞা দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখনা কেন, ইহার মধ্যে কি আছে? আমাদের এখনকার কালের সাহিত্য সেবা এইরূপ, আর তখনকার সেই কাদম্বরী পাঠ যেন বিশ্বেশ্বরের আরতি সাহিত্য তখন উপভোগের সামগ্রী, আরাধনার বস্তু। কত আয়োজনে, কত যত্নে, কত পরিশ্রমে, তখন সাহিত্য-সেবা হইত। সাহিত্য সেবায় লোক ভক্তিতে গদ্‌ গদ্‌ হইত, আনন্দে অশ্রু-পরিপ্লাবিত হইত। ভক্তি, আনন্দ, উচ্ছ্বাস এই সকল লইয়া তখন সাহিত্য-সেবা, সাহিত্যচর্চ্চা, সাহিত্য পূজা। এখনকার মত ছুরি কাঁচি বরষী লইয়া সাহিত্য-ভেদ সাহিত্য-বেধ সাহিত্য-ব্যবচ্ছেদ, তখন ছিল না। হায় আমরা কি সাহিত্য-সেবাই শিখিয়াছি!

* * * *

সপ্তমবর্ষে আমি প্রভাকর [ঈশ্বর গুপ্তের] পড়িয়াছি, বুঝিয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি। ঐ তিন বৎসরের মধ্যে [অর্থাৎ ১০ বৎসর বয়সের মধ্যে] অন্নদা মঙ্গল, তিনখণ্ড চারুপাঠ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতি সম্বন্ধ বিচার, কাদম্বরী, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের আরবী-য়োপাখ্যান ও সেক্সপীয়র হইতে অপূর্ব্বোপাখ্যান পাল-বর্জ্জিনিয়া

প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলাম। * * বি, এল, গুপ্তের মাতা সুন্দর সাধুভাষায় বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন; * * * লেখা অতি প্রাঞ্জল, সুন্দর ও তরল। * * * [১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে] ফোকাল ডিস্‌টানস্‌ পদার্থটা কি, কাহাকে বলে, তাহা অবশ্য তখন কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু বাঙ্গালা শিখিয়াছিলাম'। 'আধিশ্রয়ণিক ব্যবধি, পঞ্চপাদিক মানে বুঝিয়া ছিলাম, যাহার পরিমাণ পাচ ফুট। ইত্যাদি ইত্যাদি। * * *

[দত্ত] অক্ষয় কুমারের কথা সকল—অতি গভীর, লেখা প্রগাঢ়, ভাব গম্ভীর, তবু সে ভাল লাগিত, অথচ কৃষ্ণ বন্দ্যোর রাজোপাখ্যান কেবল গল্প বইত নয়, তাহা ভাল লাগিত না। * * *

একদিকে অক্ষয় কুমারের ভাষা হইতে যেমন গম্ভীর রচনার ভঙ্গি শিক্ষা করিলাম, অন্যদিকে গুপ্তের সেই সরল চটুল চক্‌চকে পদ্যের ভাষাও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম তখন প্রভাকরের প্রভূত পসার। লোকে কথায় কথায় প্রভাকরের পদ্য আওড়াইয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করে, তামাসা করিতে হইলে প্রভাকরের ভাষায় বলে,—এই গৌরব এই আদর দেখিয়া বালকহৃদয়ে একরূপ বুঝিয়াছিলাম, যে সহজ সরল বাঙ্গালা একটা ফেল্‌না জিনিষ নয়। * * * সহজ বাঙ্গালা আমি এখনও ফেল্‌না জিনিষ মনে করিনা। * * *

আমরা দশজনে এখন কত রকম বাঙ্গালা লিখিতেছি। কেহ ঝাড় ঝঙ্কার দিতেছি; কেহ ফুলে ফলে শোভিত করিতেছি; কেহ পেঁচের পর পেচ লাগাইয়া ভাষার কায়দা বিন্যাসে গোলকধাঁধা করিতেছি। কিন্তু মদনমোহনের সেই সুন্দর, সতেজ, সরল, সহজ, মিঠা-কড়া, মোলায়েম, জলের মত পরিষ্কার, স্বচ্ছ ভাষা লিখিতে পারি কি?

দক্ষিণে লক্ষ্মীস্বরূপা তত্ত্ববোধিনী তৎপার্শ্বে উপবীতবক্ষে গণেশমূর্ত্তি বিদ্যাসাগর, বামে সাক্ষাৎ সরস্বতী স্বরূপ ভারতচন্দ্র, তৎপার্শ্বে ময়ূরচূড়া, টেরি কাটা কার্ত্তিকস্বরূপ ঈশ্বরগুপ্ত. মধ্যে সাক্ষাৎ মহাদেবতা পিতৃদেব চাল চিত্রে শিবরূপী মদনমোহন,—সাহিত্যে আমি এই মহাপ্রতিমার উপাসক । * * তারাশঙ্করের ঝঙ্কার খুব। ঝঙ্কারে সুরতাল ডুবিয়া থাকে। শুনিতে মধুর, কাজে লাগে বড় কম। কাদম্বরী পাঠে মুগ্ধ হইতাম, স্তম্ভিত হইতাম, বিস্মিত হইতাম। কিন্তু কখন নিজের জিনিষ বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। কাদম্বরী চমক দিত, কিন্তু প্রাণে লাগিত না। কিন্তু অন্নদামঙ্গলের ছন্দ, ঈশ্বর গুপ্তের লহর, অক্ষয় কুমারের গাম্ভীর্য্য, বিদ্যাসাগরেরপ্রসাদ গুণ, তখন হইতেই প্রাণে বাজিত, প্রাণে লাগিত, প্রাণে বসিয়া যাইত। তখন অবশ্য জানিতাম না, কাহাকে বলে প্রসাদ গুণ, কাহাকে বলে ওজোগুণ। এখনও যে বেশ জানি সে কথা বলিয়া বুড়ো বয়সে অধর্ম্ম সঞ্চয় নাই করিলাম। * * *

কৃষ্ণবন্দ্যোর বাঙ্গালায় প্রাণ নাই বলিয়া প্রাণে লাগে নাই। তাঁহার লেখা পণ্ডিতি বাঙ্গালা, কিন্তু তাহাতে না আছে ভঙ্গি (ষ্টাইল) না আছে রস. না আছে আবেগ। * * *

অক্ষয় কুমার,—বিদ্যাসাগর,—বাঙ্গালার দুটা বাঘা ভালুকো লেখক, তত্ত্ববোধিনীতে নিয়মিতরূপে লিখিতেন। তত্ত্ববোধিনীতে প্রত্নতত্ত্ব, শাস্ত্রতত্ত্ব, বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা এই সকলের নিয়মিত আলোচনা হইত। স্বদেশ-হিতৈষী সাহিত্যানুরাগী সকলেই তত্ত্ববোধিনীর একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। * * তত্ত্ববোধিনীতে পৌত্তলিকতার বিরোধ প্রকাশিত হইত না। * *

বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অক্ষয় কুমার দত্ত উভয়েই সাধু বাঙ্গালার লেখক; উঁহাদের দুইজন হইতেই বাঙ্গালা গদ্যের গৌরব, সে বাঙ্গালা

সাধু বাঙ্গালা। কিন্তু প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রথমে লেখনী চালনা করেন, পন্থা প্রদর্শন করেন,—প্যারী চাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমি ঈশ্বর গুপ্তের পদ্য পড়িতাম, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম যে, প্রচলিত বাঙ্গালা অবহেলার সামগ্রী নহে। তাহার পর সেই সময়েই যখন প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মাসিক পত্র' পড়িতে পাইলাম, তখনই বুঝিলাম, যে সহজ সরল, চলিত বাঙ্গালায়, বাঙ্গালা দেশের কথা, বাঙ্গালীর ঘরের কথা, বাঙ্গালীর সদাচার অনাচারের কথা, হাসি তামাসার কথা, লিখিলেও সুপাঠ্য গ্রন্থ হয়। অক্ষয়কুমারের বাহ্যবস্তুতে জ্ঞানের কথা পড়িতাম ; সকল কথা বুঝিতে পারিতাম না। বিদ্যাসাগরের বেতাল পঁচিশে পূর্ব্বকালের কথা পড়িতাম। * * কিন্তু টেকচাঁদ ঠাকুরে এই কালের, এই বাঙ্গালির, প্রাত্যহিক জীবনের কথা, ঘরকন্নার কথা, সমাজের কথা, সহজ কথায় দেখিতে পাইলাম। সেই শিশুজীবনে অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের গাম্ভীর্য্যে, রচনাচ্ছটায়, ভাবের ঘটায় ভুলিয়াছিলাম। টেকচাঁদের বিনা আড়ম্বর সরলতায়ও সেইরূপ বিমুগ্ধ হইলাম। গদ্যের গঙ্গাযমুনা স্রোত, আর ঈশ্বরগুপ্তের পদ্যের সরস্বতী আমার বাল্যজীবনের প্রয়াগস্থলে সমানে বহিতে লাগিল। আমি সেই মহা সঙ্গমতীর্থে মহানন্দের সহিত হাসিতে হাসিতে কৃতার্থতা লাভ করিলাম। * * *

আলালের ঘরের দুলালে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন চিত্র আছে। ভাল মন্দ দুই আছে। মদ খাওয়া প্রবন্ধে মদের-দোষ নানাভাবে, গল্পের ডাল পালা দিয়া বুঝান হইয়াছে। রামারঞ্জিকায় হরিহর পদ্মাবতী দম্পতি মধ্যে আপনাদের কন্যার শিক্ষার বিষয়ে কথোপকথনচ্ছলে স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে। এতৎপূর্ব্বে কাদম্বরীকার তারাশঙ্কর

স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে দুই শত টাকা পুরস্কার পান। * * রামারঞ্জিকাতে মিত্র মহাশয় সেই কথারই বিশদরূপে এবং বিস্তারিত ভাবে সমর্থন করেন। আমি উভয় গ্রন্থই সমাদরের সহিত পড়িয়া ছিলাম। * * বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালায় সুন্দর গদ্য হয়, প্যারীচাঁদ মিত্র হইতে এইটী যে কেবল শিখিয়াছিলাম এমন নহে, শব্দের ছটা, ঘটা না করিয়া, সোজা কথাতেও যে অনুপ্রাস আসে, আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। * * *

রামকমল ভট্টাচার্য্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'

[এক ফেরি ওয়ালার নিকট] একদিন নাড়িতে নাড়িতে একখানি এড়াতে চটি বই পাইলাম, * নাম 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'; এখানি রামকমল ভট্টাচার্য্যের লেখা। একস্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, 'আমাদিগের জাহাজে সপ্তদশ বর্ষ বয়স্কা এক ফরাশি যুবতী ছিলেন। তাঁহার নাম জুলিয়া। তাঁহার স্বামীও এই জাহাজে ছিলেন। স্বামীর বয়ক্রম চল্লিশ বর্ষের ন্যূন ছিল না। বুঝিতেই পার, এমন স্ত্রীর এমন স্বামীর প্রতি কেমন অনুরাগ হয়। জুলিয়া দেখিতে অতি সুরূপা। তাহার অলকগুলি কুঞ্চিত হইয়া এরূপ মধুরভাবে কপোলদেশে পতিত হইত যে, দেখিলে মোহিত হইতে হয়। নয়ন যুগল উজ্জ্বল বিশাল ও ভ্রমরের ন্যায় নীল। কপোল-তল এরূপ স্বচ্ছ, যে মুখ দেখা যায়। আমি দেখিয়া অবধি যুবা-জন-সুলভ ভাবের অনধীন থাকি নাই। জুলিয়ার স্বামী আমার নবীন বয়স ও নির্ভয় ব্যবহার দেখিয়া অবশ্যই উদ্বিগ্ন এবং কোন বিষম ঘটনার শঙ্কায় জড়ীভূত থাকিতেন। তিনি আমার প্রতি অতি অপরিচিত ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার পত্নীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার বা কথোপকথন স্পষ্টরূপে নিষেধ করিতে

পারেন নাই। ইউরোপের প্রথা, এদেশের মত, যুবতী স্ত্রীর পরপুরুষের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করে না, অতএব আমি জুলিয়ার প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে বিমুখ হই নাই। এইরূপে আমাদিগের পথ অতীত হইতে লাগিল। কোন দিন একটি হাঙ্গর, কোন দিন জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া, কোন দিন মছলী বন্দরে মাস্তুলের বন, কোন দিন সাফা উর্ম্মিমালায় আহত উপকূলে অধিষ্ঠিত মন্দ্রাজ নগরের প্রাসাদাগ্র—এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা বঙ্গোপসাগরের নীল জল ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলাম।'

অনেকখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম বটে, কিন্তু 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণের' ভাষার বিশেষত্ব বোধ করি দেখাইতে পারিলাম না। * * বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের নানারূপ আলোচনা আলোড়ন হইতেছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানির কথা কাহাকেও বলিতে শুনিনা, বা লিখিতে দেখিনা। অথচ আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী। * * আমি বালক কালে এই গ্রন্থের ভাষায় যে কেবল মুগ্ধ হইলাম এমন নহে, ইহার ভাবেও আকৃষ্ট হইলাম। * *

পঠদ্দশায় আর একখানি পুস্তকে আমাকে আলোড়িত করাইয়াছিল। আনন্দও পাইয়াছিলাম। সেখানি কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম পেঁচার নক্সা। আলালের ঘরের দুলালেও অনেক স্থানে নক্সা বা ফটো তুলিবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পল্লী-সমাজের চিত্র যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, কলিকাতার অলি-গলির নক্সা তেমন স্ফুটস্ত হয় নাই। * * মনে করিলাম আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতে বাজি খেলান যায়, তুবড়ি ফুটান যায়, ফুল কাটান যায়, ফোয়ারা ছোটান যায়। মনে করিলাম, আমাদের মাতৃভাষা সর্ব্বাঙ্গে রঙ্গময়ী * *

যৌবনে আমরা অনেকেই তাঁহার (ভূদেব বাবুর) শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি। বোধ করি, বিবিধার্থ সংগ্রহে, আমি মাইকেলের তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম। * *

ইদানীন্তন বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আমাদের পঠদ্দশার শেষভাগে পরিচয় হয়। তখন আমরা বাঙ্গালার ভঙ্গি বুঝিতে পারি, ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারি, কোন্‌টা পথ, কোন্‌টা অপথ, কোন্‌টা কুপথ, একটু একটু চিনিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা পাইয়া আমার মনে পড়ে, আমি প্রথমদিনে আহ্লাদে আটখানা হইলাম। * * বুঝিয়াছিলাম সংস্কৃতানুসারিণী বাঙ্গালা ভাষা অতি সুন্দর হইলেও রয়স্থা কুলীন কন্যার মত যেন কেমন কেমন বোধ হইত। * * যখন টেকচাঁদ ঘটক সাজিয়া সোজা বাঙ্গালাকে বর সাজাইয়া সভাতে উপস্থিত করিলেন, তখনও পাত্র আপনাদের আত্মীয় হইলেও কেমন যেন ছোট ঘরের অপাত্র বলিয়া বোধ হইল। বঙ্কিমবাবু স্বয়ং বরবেশে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকেই উপযুক্ত সৎপাত্র বলিয়া বোধ হইল। পাত্র মিলিল দেখিয়া, সেই আহ্লাদেই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। পরে দেখা গিয়াছে, আমাদের সেই আহ্লাদ বালকের আহ্লাদ হয় নাই। বঙ্গভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র আত্মসমর্পণ করিয়া প্রতারিত হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার নানারূপ সেবা করিয়াছেন, বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন এবং এক ভাষার গুণে বাঙ্গালীকে জগতের নিকট পরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ ইংরাজী ফরাসীতে অনুবাদিত হইয়াছে।

আমাদের কলিকাতার কলেজ জীবনের শেষাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হইল। এমন অচ্ছিদ্র, উজ্জ্বল, বাচালতা-শূন্য

অথচ 'রসপরিপূর্ণ, হিন্দুভাবে অস্থিমজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখায় ওতপ্রোত—কাব্যগ্রন্থ, বাঙ্গালায় আর নাই। কেবলমাত্র 'কপালকুণ্ডলা' লিখিলেই, কপালকুণ্ডলাকার কবি বলিয়া পরিচিত হইতেন। অন্য গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন ছিলনা। * * বঙ্কিম বাবু আমাদের সমাজে, সাহিত্যে গোলাপ ফুল। * *

পিতা যখন প্রথম ঢাকায় গেলেন, তখন সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ সরকারী চাকরী করিতে ছিলেন। * * তিনি [কালীপ্রসন্ন] বঙ্গের সর্ব্বত্র কীর্ত্তিমান বলিয়া প্রথিত হইলেন। ঢাকায় বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ চর্চ্চা হইতে লাগিল। * * * ১২৮৬ সালের আষাঢ় মাসে ঢাকার কলেজ ভবনে পিতা বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেখানিও বড় বড় অক্ষরে ৭৪ পৃষ্ঠায় সাধারণী যন্ত্রে ছাপিয়াছিল। বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি পর্য্যন্ত অধিকাংশ লেখকের লেখার ভঙ্গির সমালোচনা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় অতি বিশদরূপে আছে। ইহার শেষভাগের দুই দশ পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া নমুনা দিতেছি।

'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি ও জীবন চরিতের পর, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাদম্বরী সাহিত্য সংসারে দর্শন দিল। কাদম্বরী তো কাদম্বরী! ভাষাকে যেন ক্ষণকালের জন্য মাতাইয়া তুলিল। যেমন শব্দের ঘটা, তেমনি সমাসের ছটা, তেমনি উপমার আড়ম্বর। বাঙ্গালার জন্সোনিয়ান ভাষা। বাঙ্গালায় গদ্যছন্দে কাব্যের উচ্ছ্বাস। কিন্তু মদিরার মত্ততা অধিক্ষণ থাকে না। এইজন্য কাদম্বরীর ভাষা যদিও বঙ্গসাহিত্যের কিছু শোভা সম্পাদন করিয়াছে, কিন্তু অনুকৃত হইতে পারে নাই। * * ইহার কিছুদিন পরে সাহিত্য সংসারে আর একজন আশ্চর্য্য লেখক প্রবেশ করিলেন। বাবু

বঙ্কিমচন্দ্র আসরে নামিলেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা অতি চমৎকার। এই লেখা কেবল শ্রুতি মোহকর নহে, কেবল মধু পরিপূর্ণ নহে, ইহাতে তাড়িত্তেজ প্রভূত ভাবে বহিতেছে, ইহা ভাব-বৈভবেও অতি ঐশ্বর্য্যশালী। বঙ্কিমবাবু কেবল বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত নহেন, কিন্তু ইংরাজী বিদ্যাতেও অতি সুপণ্ডিত এবং তাঁহার নিজের কল্পনা শক্তিও অতি বলবতী। অতএব তিনি যেমন একদিক হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য লইতে যত্ন করিয়াছেন, তেমনি অন্যদিক হইতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রচনা যেমন মাধুরি-ময়ী, তেমনি শক্তি সম্পন্না ও ভাব পরিপূর্ণা। তিনি বঙ্গভাষায় একরূপ নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। যেদিন বঙ্কিম বাবু কতিপয় বন্ধু লইয়া 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করিলেন, সেইদিন বঙ্গভাষা-নদীতে উন্নতির কোটালে মহাবিক্রমের সহিত বান ডাকিয়া উঠিল; উন্নতির স্রোত তর তর বেগে ছুটিতে লাগিল; নদীর জল ক্রমশই স্ফীত হইতে লাগিল; দেখিয়া শুনিয়া ভাবুকের মন আনন্দরসে গলিয়া গেল। বঙ্কিম বাবু হইতেই বঙ্গবাসীগণ 'সক' করিয়া বাঙ্গালা বই পড়িতে শিখিয়াছে।' এই সময়ে ঢাকায় পিতার চারি পোয়া প্রতিষ্ঠা হইল। * *

কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবির রস আমরা পিতাপুত্রে লোফালুফি করিয়া উপভোগ করিতাম। সেক্‌সপিয়ারের নাটকের রস তাঁহার পাদমূলে বসিয়াই উপভোগ করিয়াছি।"

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬—১৯০৯)—কবিবর নবীনচন্দ্র সেন একখানি গদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন—নাম 'আমার জীবন'—৫ খণ্ডে সমাপ্ত। ইহাতে কবি আত্মজীবনী বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তৎসঙ্গে তৎকালীন অন্যান্য অনেক সাহিত্যিকের অল্প বিস্তর অনুশীলনও ইহাতে

পাওয়া যায়। সে হিসাবে 'আমার জীবন' পুস্তকের কয়খণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যিকের বড় মূল্যবান পুস্তক। আমার জীবন ইতিহাসের সার্চলাইট, রাজনৈতিক দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ ও স্বদেশ প্রেমের পূততরঙ্গ। পুস্তকখানির ভাষা বড় প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। বিলাতী সাহিত্যে Confessions of Rousseau, Pepys's Diary, Franklin's Autobiography প্রভৃতি অনেকগুলি আত্ম-জীবনচরিত থাকিলেও বাঙ্গালায় এই ধরণের পুস্তক অতি বিরল। পূর্ব্বোক্ত কুমুদ নাথ দাস বলিয়াছেন "Amar Jiban (My life) and Prabaser Patra (Letters from Abroad) are two principal prose works of the poet of which both are interesting, though one should very much wish that the auto-biography were free from all touches of egotism which occasionally disfigure it" কবির কাব্যগ্রন্থ সমূহ আমাদের এ প্রবন্ধে আলোচ্য নহে বলিয়া উল্লেখ করা হইল না।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৬—১৮৮৬)—

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাস, নানা প্রবন্ধ প্রভৃতির রচয়িতা। ইঁহার পদ্য রচনাও অনেক ছিল। ইনিও বঙ্কিম চন্দ্রের সমসাময়িক লোক। ইনি অকালে কালগ্রাসে পতিত না হইলে বাঙ্গালার সাহিত্য সম্পদ আরও বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। ইঁহার রচনার শক্তিও যথেষ্ট ছিল।

কালীবর বেদান্তবাগীশ (১৮৪৬—১৯১৫)—

কালীবর বেদান্তবাগীশ দর্শন সম্বন্ধীয় জটিল সংস্কৃত পুস্তকগুলিকে যথাসম্ভব বোধগম্য বাঙ্গালা ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া মাত্রবাঙ্গালা

ভাষাবিদ্‌গণের যথেষ্ট সুবিধা করিয়াছেন। পাতঞ্জল দর্শন, শুক্রশাস্ত্র, চরিত্রানুষ্ঠানবিদ্যা সাংখ্যদর্শন, ন্যায়দর্শন, বেদান্তসার, পূর্ব্বমীমাংসার্থ-সংগ্রহ, বেদান্তসংজ্ঞাবলী, পরলোকরহস্য, কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯)—

শিবনাথ শাস্ত্রী মেজ বৌ, যুগান্তর, বিধবার ছেলে, নয়নতারা, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ প্রভৃতির রচয়িতা। এতদ্ব্যতীত ইহার কবিতা রচনাও আছে; তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। ইঁহার আত্মচরিতও বাঙ্গালাভাষার একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইনি একজন সুবক্তা ছিলেন; ইহার বক্তৃতা যেমন সারগর্ভ তেমনই হৃদয়গ্রাহী। ইনি ব্রাহ্ম হইলেও ইহার রচনা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বর্জ্জিত।

শশাঙ্কমোহন সেন বলিয়াছেন: "শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাসে লেখকের সুতীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ এবং বর্ণনাশক্তির প্রশংসনীয় পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, উক্ত গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধের সহিত দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রকৃত কোন সংযোগ বা সামঞ্জস্য মোটেই পরিস্ফুট না হওয়ায় উহা শিল্পের আকার-প্রকার গত 'ব্যক্তিত্ব' হিসাবে নিদারুণ ভাবেই খণ্ডিত এবং পঙ্গু হইয়া গিয়াছে।" *

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭—১৯১৯)—

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় জন্মভূমি মাসিকপত্রিকায় অনেকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইঁহার অগ্রজ ভ্রাতা রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে ইনিই প্রথম বিশ্বকোষ নামক সুবৃহৎ অভিধান সম্পাদন আরম্ভ করেন। ইংরেজী, হিন্দী, উড়িয়া পার্শী, উর্দ্দু সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায়

* বাণীমন্দির—পৃষ্ঠা ২০৩-৪

ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, নরতত্ত্ব, উদ্ভিত্তত্ত্ব, প্রভৃতি নানাবিধ আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, ফোক্‌লা দিগম্বর, মুক্তামালা প্রভৃতি ইঁহারই রচিত। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞানবোধ প্রভৃতি কয়েকখানি স্কুল পাঠ্য গ্রন্থও ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহার প্রসিদ্ধ ইংরেজি গ্রন্থ—Art Manufactures of India.

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮—১৯০৯)—

ইংরেজিতে সুপণ্ডিত হইলেও বঙ্গসাহিত্যে রমেশচন্দ্র দত্তের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। মাধবীকঙ্কণ, বঙ্গবিজেতা, জীবনপ্রভাত, জীবনসন্ধ্যা, সংসার, সমাজ প্রভৃতি কয়েকখানি বাঙ্গালা উপন্যাস রচনা করেন। ইঁহার জীবনের অধিকাংশ ভাগ প্রবাসে ব্যয়িত হইলেও সংসার এবং সমাজে ইনি বাঙ্গালীর দৈনন্দিন ঘটনাবলীর যেরূপ নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে ইঁহার তীক্ষ্নদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময়ে বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহ লইয়া যে তুমুল সামাজিক আন্দোলন চলিতেছিল তাঁহার শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে তাহার ছায়া বেশ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তাঁহার বিষবৃক্ষ প্রভৃতি পুস্তকে বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন; শিবনাথ শাস্ত্রীর পুস্তকেও এ আন্দোলনের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ লইয়া হিন্দুসমাজে সে সময়ে একটা তুমুল আন্দোলন তুলিয়া গিয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্রের নাম ঐতিহাসিক বলিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধ। বঙ্কিমের অনুকরণে লিখিত ইঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও নিন্দনীয় নহে। এতদ্ব্যতীত ইনি বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছেন—তাহা 'ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ'; ইহা তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্বের

ও প্রভূত পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। ইঁহার অপর গ্রন্থের মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও হিন্দুশাস্ত্র ২ ভাগও উল্লেখযোগ্য।

সারদাচরণ মিত্র (১৮৪৮–১৯১৭)—সারদাচরণ মিত্র উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ ও কায়স্থকারিকা নামক একখানি সামাজিক পুস্তক লিখিয়াছেন। ভারতে একলিপি বিস্তারার্থ ইনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের জজিয়তি ত্যাগের পর ইনি বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইনি বিদ্যাপতির পদাবলীর একটী সটীক সংস্করণও প্রকাশিত করিয়াছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫)—অনেকগুলি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালাভাষার যথেষ্ট গৌরব-বৃদ্ধি করেন। ইঁহার পুস্তকাবলীর মধ্যে অভিজ্ঞানশকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, কর্পূরমঞ্জরী, চণ্ডকৌশিক, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, মহাবীর চরিত, নাগানন্দ, ধনঞ্জয় বিজয়, প্রিয়দর্শিকা, সবুজ সয়তান, অলীকবাবু, বেড়ালের স্বর্গ, মা, খুকুমণি, ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ, অভিশপ্ত বাড়ী, প্রবোধচন্দ্রোদয়, অশ্রুমতী, মিলিতোনা, সত্যসুন্দর মঙ্গল—বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধগুলি সে সময়ে লোকে আদর করিয়া পড়িত। ইনি একজন উৎকৃষ্ট সমালোচক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনুবাদে ইনি সিদ্ধহস্ত।

প্রফুল্ল নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯—১৯০০)—প্রফুল্ল নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রীক ও হিন্দু, বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত, মণিহারী, অনুভূতি প্রভৃতি সারগর্ভ পুস্তক প্রণয়ন করেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১): বাঙ্গালা সাহিত্যে

ব্যঙ্গরসাত্মক হাস্যোদ্দীপক রচনায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে যেমন সার্ভেন্টিস বঙ্গসাহিত্যে তেমনি ইন্দ্রনাথ। ইঁহার চিরপ্রসিদ্ধ পঞ্চানন্দ অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার হইলেও ইহাতে যথেষ্ট গবেষণাপূর্ণ জিনিষও আছে। ইঁহার কল্পতরু, ক্ষুদিরাম, পাঁচুঠাকুর, পঞ্চানন্দ (মাসিক পত্র) প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের চির আদরের জিনিষ। ইনি একজন বিশিষ্ট সমাজতত্ত্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিষয়ে প্রখরদৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যঙ্গরসাত্মক লেখক সংখ্যায় অল্প হইলেও, তাঁহাদিগের রচনা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। ঈশ্বরগুপ্ত ও দীনবন্ধুর ব্যঙ্গ রচনা নিতান্ত সেকেলে ধরণের; তারপর ইন্দ্রনাথ ও বঙ্গবাসী সম্পাদক যোগেন্দ্র বসু; আর আমাদের বর্ত্তমানের রসের গুঁড়া রসিক চূড়ামণি ললিত বিদ্যারত্ন। অবশ্য ইঁহাদের প্রত্যেকের রচনায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যঙ্গরস, হাস্যরস প্রত্যেকের রচনাতে থাকিলেও প্রত্যেকেরই প্রভূত মৌলিকতা আছে। শেষজীবনে ইনি বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণমালা ও ব্যাকরণ সংস্কার লইয়া বড় ব্যস্ত হইয়া ছিলেন।

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৪৯—১৯০২)—কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন (শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী) বঙ্গভাষাকে অনেকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ উপহার দিয়াছেন; তন্মধ্যে গীতার্থ সন্দীপনী, টীকা সহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভক্তি ও ভক্ত, পরিব্রাজকের বক্তৃতা, শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি, রাম গীতা, পরিব্রাজকের সঙ্গীত, নীতিরত্ন মালা, পঞ্চামৃত, প্রবোধ কৌমুদী, শ্রীকৃষ্ণ রত্নাবলী, যোগ- ও যোগী, স্বপ্নতত্ত্ব, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার সারগর্ভ বক্তৃতা-বলীতে যেমন উচ্চভাব তেমনি প্রাঞ্জল বেগময়ী ভাষা পরিলক্ষিত হয়।

রজনী কান্ত গুপ্ত (১৮৪৯—১৯০০)—দরিদ্রের সন্তান হইয়াও রজনীকান্ত গুপ্ত আজীবন সাহিত্য পরিচর্য্যা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার পাঠ্যাবস্থায় রচিত প্রথম পুস্তক জয়দেব চরিত সন ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক লিখিয়া তিনি রাজা স্যর শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের প্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত সাহিত্যামোদী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও, কোন চাকুরী লইলে পাছে সাহিত্যচর্চ্চার বিঘ্ন বা অসুবিধা ঘটে এইজন্য সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' ৫ভাগ ইঁহার সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ ; ইহার ভাষা, রচনাপ্রণালী ও ঐতিহাসিক সত্যাসত্য বিচার বিশেষ প্রশংসনীয়। এইজন্য এখানি বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। ইহার ভাষা যেমন ওজস্বিনী তেমনি প্রাঞ্জল।

বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া 'আর্য্যকীর্ত্তি' নামে বালকগণের পাঠোপযোগী প্রথম পুস্তক প্রণয়ন করেন। তৎপরে বালকগণের পাঠের জন্য ভারত প্রসঙ্গ, ভীষ্মচরিত, প্রতিভা, বীরমহিমা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সন ১৩০৭ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছিলেন "স্বাধীন ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক, তৎপূর্ব্বে ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ করিধাছিলেন ; রজনীকান্তের প্রথমগ্রন্থ জয়দেব চরিত ও পাণিনি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারও বোধ করি সেই পুরাতত্ত্ব আলোচনার দিকেই প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ছিল, কিন্তু শীঘ্রই তিনি সে পথ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

* * ঐতিহাসিকের হস্তে স্বজাতির চরিত্রে অযথা কলঙ্কলেপন দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। সেই কলঙ্ক প্রক্ষালনের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার জন্য এই কারণে তাঁহার সংকল্প হয়। আধুনিক ইতিহাসের সমগ্র ভাগ হইতে সিপাহীযুদ্ধের অংশ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়ায়, তাঁহার মনে আন্তরিকতার আবেগের কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

* * * ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। * * জাতীয় ভাবের রক্ষণ ও পরিপুষ্টি রজনী কান্তের মূলমন্ত্র ছিল। * * রজনী যেমন একদিকে আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ককালিমা প্রক্ষালিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অন্যদিকে আমাদের প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণের চরিত্রের চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়া স্বজাতীয় গৌরব খ্যাপনের সহিত জাতীয়ভাবের উদ্দীপনা করিয়া, আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে শিখাইয়া ছিলেন। তাঁহার আর্য্যকীর্ত্তি, ভারত কাহিনী, প্রবন্ধ মঞ্জরী প্রভৃতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ঐ উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল।

* * * তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি যে ওজস্বিনী ভাষার অবতারণা করিয়াছিলেন. তেমন ভাষায় কথা কহিতে অপরে সমর্থ হন নাই। তাঁহার ভাষা তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি সাধারণের নিকটে প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ। * * তাঁহার মনের আবেগ, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, সেই ভাষায় স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইত ; তাঁহার মর্ম্ম হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইয়া পাঠকের মর্ম্মে গিয়া প্রতিহত হইত। ভাষার বিশুদ্ধির দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। * * *

বঙ্গসাহিত্যের সেবা রজনীকান্তের জীবনের মুখ্যতম ব্রত ছিল।"

রজনীকান্তের অন্য গ্রন্থের মধ্যে বোধবিকাশ, ভারতের ইতিহাস, হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়, মেরী কার্পেন্টারের জীবনী, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের জাতীয় প্রেম, ঐতিহাসিক পাঠ, নব চরিত, প্রবন্ধকুসুম, প্রবন্ধমঞ্জরী, প্রবন্ধমালা, বিবিধ প্রবন্ধ, ভারতকাহিনী, রচনামালা—উল্লেখযোগ্য।

রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১-?)—রসায়ন বিজ্ঞান, রামকৃষ্ণের জীবনী, দুইভাগ বক্তৃতা, তত্ত্বপ্রকাশিকা প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরববর্দ্ধন করেন। ইনি পরমহংসদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়ভক্ত ছিলেন।

দামোদর মুখোপাধ্যায়—(১৮৫২—১৯০৭)—দামোদর মুখোপাধ্যায় একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ-কার পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্ন ইঁহার মাতুল ছিলেন। দামোদর মাতুলালয়েই শিক্ষালাভ করেন। ইঁহার প্রথম উপন্যাস মৃণ্ময়ী—বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার উপসংহার। অতঃপর মা ও মেয়ে, দুই ভগিনী বিমলা, কর্ম্মক্ষেত্র, শান্তি, সোণার কমল, যোগেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, সপত্নী, নবাবনন্দিনী (দুর্গেশ নন্দিনীর উপসংহার), প্রতাপসিংহ, আদর্শপ্রেম, লক্ষ্মণ বর্জ্জন, সুকন্যা, শম্ভুরাম, ললিতমোহন, অমরাবতী, নবীনা প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস প্রণয়ন করেন। ইঁহার কমলকুমারী (স্কটের Lammermoor এর বঙ্গানুবাদ) এবং শুক্লবসনা সুন্দরী, ১ম, ২য়, ৩য় (Wilkin Collins এর Woman in White এর বঙ্গানুবাদ)—দুই-খানি অনুবাদ হইলেও বাঙ্গালায় সুখ পাঠ্য বটে। এতদ্ব্যতীত ইনি ৯টি টীকাভাষ্য ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৩৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী এক বিরাট সংস্করণ প্রণয়ন করেন।

উমেশ চন্দ্র বটব্যাল (১৮৫২—১৮৯৮)—হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থ

প্রণেতাদিগের মধ্যে উমেশচন্দ্র বটব্যাল অন্যতম। ইঁহার সাংখ্যদর্শন, বেদ প্রকাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থ অগাধ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। বৈদিককালে গোহত্যা বিষয়ক সাংখ্য দর্শনের ব্যাখ্যা—ইঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রচনার একটী প্রধান গুণ এই যে তিনি প্রায়ই নূতন কথার অবতারণা করিতেন। পুরাতন কথার বার বার উল্লেখ করিয়া বিরক্তি উৎপাদন করিতেন না ইনি পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন; এমন কি এক সময়ে নাস্তিক ভাবাপন্নও হইয়াছিলেন।

অমৃত লাল বসু (১৮৫৩–১৯২৯)—

অমৃত লাল বসু একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাটককার। হাস্যরস-প্রধান অভিনয়ে ও ব্যঙ্গরসাত্মক রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত। ইঁহার রসিকতা বড় স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী। ইঁহার বক্তৃতায় বিমল হাস্যরসের সহিত গভীর ভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি যেমন সুবক্তা তেমনি সামাজিক চিত্র অঙ্কনে সুনিপুণ। সামাজিক কুরীতি ও কুনীতি অপনয়নার্থে ইনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট ও তৎপ্রতি তীব্র ব্যঙ্গরূপ কশাঘাত করিতে সতত উদ্‌যুক্ত থাকিতেন। ইনি বাঙ্গালায় ব্যঙ্গরচনার এক নূতন ধারা সৃষ্টি করিয়াছেন। সুনিপুণ অভিনেতারূপেই ইঁহার খ্যাতির সূত্রপাত হইলেও ইনি একজন সাহিত্যরথী ছিলেন; ইনি একবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩–১৯৩১)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রত্ন-তত্ত্বের অনুশীলনে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ইনি অনেক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব, এবং সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে ইনি বহু মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলেন। ইঁহার বাঙ্গালা রচনার মধ্যে বাল্মীকির জয়, বৌদ্ধ ইতিহাস, বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা,

সাহিত্য সমালোচনা, ভারত মহিলা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঐতিহাসিক নিবন্ধমালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, মেঘদূত, কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, সমাজ সংস্কার নিবন্ধরাজি, কালিদাসের ব্যাখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "ইহার বাল্মীকির জয় গদ্য গ্রন্থ হইলেও একখানি ক্ষুদ্র মহাকাব্য।" প্রাচীন জাতিতত্ত্বে ইঁহার যথেষ্ট মৌলিক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে ইনি অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহার মেঘদূত বঙ্গসাহিত্যের কোহিনুর; ইহাতে তিনি মেঘদূতের কবিত্ব সৌন্দর্য্যের সমালোচনা করিয়াছেন; কালিদাসের চিরমধুর কবিতার অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি ভক্তিগদগদচিত্তে অনুশীলন করিয়াছেন।

দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৮৫৩—?)—

বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ইঁহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অসীম। ইঁহার রচনার মধ্যে বাঙ্গালীর গান, স্বাধীনতার ইতিহাস, রাণী ভবানী, বঙ্গের ইতিহাস, বেদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'পৃথিবীর ইতিহাস'কে অনেকে ইঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া থাকেন।

যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু (১৮৫৪—১৯০৫)—

বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের সহিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর নাম অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। দেশীয় ভাব ও ইউরোপীয় আদর্শ লইয়া বঙ্গবাসী পরিচালন করিয়া ইনি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে যুগান্তর আনয়ন করেন। মডেল ভগিনী, শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী, নেড়া হরিদাস, চিনিবাস-চরিতামৃত, বাঙ্গালী চরিত, মহীরাবণের আত্মকথা, কালাচাঁদ প্রভৃতি পুস্তক ইঁহার রচনা। ইনিও প্যারীচাঁদ মিত্রের মত স্বপ্রণীত গ্রন্থে স্বনাম প্রকাশ করেন নাই। ইঁহার রচনার বিশেষত্ব এই যে ইঁহার ভাষা যেমন

সরল তেমনি হৃদয়স্পর্শী, যেমন তীব্র তেমনি মধুর। ইনি নিজের রচনার দ্বারা তৎকালীন সমাজের কুরীতি কুনীতি সমূহ দূরীকরণার্থে সাধ্যমত প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই জন্যই "ইঁহার রচনা এত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ভরা। সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি ইনি তীব্র শ্লেষোক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। যোগেন্দ্রের চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতাও যথেষ্ট। ইঁহার রচনায় ও ভাবে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। প্রতিভাবান লেখক মাত্রেই ভাষা ও ভাবের নূতনত্ব সৃষ্টি করেন। যোগেন্দ্র বাবুর ভাষাও নূতন, চরিত্রাঙ্কন পদ্ধতিও নূতন। অল্প কথায় বলিতে গেলে ইনি একজন প্রতিভাবান তেজস্বী লেখক। ইনি ভণ্ডদিগের উপর তীব্র কশাঘাত করিতেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের অষ্টম বার্ষিক স্মৃতিসভায় অধ্যাপক ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন: "প্রাচীন-গ্রন্থ প্রকাশ ছাড়া তিনি স্বরচিত কতকগুলি পুস্তকের সাহায্যে, সদ্ধর্ম্মসংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। * * * নীচ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যের সৃষ্টি করেন নাই। সমাজের কল্যাণের জন্যই তিনি এই বিপৎসঙ্কুল পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন।"

যোগেন্দ্রচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় লিখিয়াছেন: "তিনি শুধু সাহিত্য-সেবা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; গতানুগতিক সাহিত্যস্রোতের প্রবাহ-পন্থা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্য সেবায় কর্ম্মের আদর্শ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। * * *

সাহিত্যে তাঁহার 'বঙ্গবাসী' সর্ব্ববিধ আবর্জ্জনা দূর করিয়া নবীন আদর্শ দিয়াছিল; সমাজে তাঁহার 'বঙ্গবাসী' সর্ব্ববিধ নীচতা, সঙ্কীর্ণতা,

গ্লানি ও ভণ্ডতার উপর শ্লেষ, ব্যঙ্গ এবং কশাঘাত প্রযুক্ত করিয়া ভ্রষ্টাচার ও ভক্তগণকে সতত সন্ত্রস্ত রাখিয়াছিল ; ধর্ম্ম জগতে হিন্দুর সদাচার নিষ্ঠা ও স্বধর্ম্মপরায়ণতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া—ভারতের অতীত স্মৃতির উদ্বোধন করিয়া লুপ্তপ্রায় ধর্ম্মভাবকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল। * * *

'বঙ্গবাসী'র উপহারচ্ছলে একরূপ বিনামূল্যেই তিনি পুরাতন বঙ্গ-সাহিত্য আমাদের গৃহে গৃহে প্রেরণ করিয়াছেন,—যাহার প্রসাদে দেশে এত সাহিত্যচর্চ্চা, এত সাহিত্যিকের সৃষ্টি, আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারে এত সম্পদ্ এত ঐশ্বর্য্য। যোগেন্দ্রবাবু নিজহস্তে ভাণ্ডার-দ্বার না খুলিলে আমাদের সে ঐশ্বর্য্যের উপভোগ ঘটিয়া উঠিতে [উঠিত ?] না। এক কথায় তিনি আমাদের ধর্ম্মচর্য্যায় ও বাণী-বন্দনায় পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি বঙ্গ-ভাষার অতুল সম্পত্তি—বাণীচরণে অম্লান কুসুমস্তবক। তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টি, ভাষা-বিন্যাস ও বর্ণনা-চাতুর্য্য কিসের কথা বলিব ? সবই প্রশংসার অতীত। 'মডেল ভগিনী'তে তিনি পাশাপাশি পুণ্য ও পাপের চিত্র আঁকিয়াছেন। একদিকে বিলাস-গর্ব্বিত বিদেশীয় কুশিক্ষার কুফল, অন্যদিকে অকপট ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুত্বের অম্লান পুণ্য-জ্যোতিঃ। 'মডেল ভগিনী' সমাজের বিকৃতপুরুষ-হৃদয়ে নির্দ্দয় আঘাত করিয়াছে। তাঁহার 'রাজলক্ষ্মী' সর্ব্বরসের সমন্বয়। কাত্যায়নী অন্নপূর্ণায় করুণরস, প্রভুভক্ত রঘুদয়ালে বীররস, ভক্ত রাধা-শ্যাম ও দীনদয়ালের চরিত্রে শান্তরস আর রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে সতীজন-সুলভ রৌদ্ররস পরিপুষ্ট হইয়াছে। যোগেন্দ্রবাবু 'চিনিবাস-চরিতামৃত' ও 'বাঙ্গালী-চরিতে' নব্য কুশিক্ষায় বিকৃতরুচি যুবকগণের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। ব্যর্থ ও অন্ধ উত্তেজনাকে

যাঁহারা দেশহিতৈষিতা ও অসার বাক্‌পটুতাকে যাঁহারা বীরত্ব বলেন, যোগেন্দ্রবাবু তাঁহাদের প্রতি কশাঘাত ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা কিছু মৌখিক, আড়ম্বরময়, বাগ্বহুল ও কর্ম্মহীন, তাহাই তাঁহার ঘৃণার বস্তু ছিল। তাই তিনি নীরবে কর্ম্মের সেবা করিতেন। তিনি সাহিত্য-মন্দিরে ফুল-লতা-পাতা আঁকিতে আইসেন নাই—তিনি তাহার স্তম্ভ-প্রাচীর তুলিতে আসিয়া ছিলেন। * * *

যোগেন্দ্রবাবুর পুস্তকে সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ ধর্ম্মভাব, সরলতা, স্বদেশপ্রিয়তা, সৎপ্রবৃত্তি ও সাধু উদ্দেশ্যের লক্ষণ বিদ্যমান আছে।"

"তাঁহার মত স্বভাবসিদ্ধ সরস সরল অন্তর্গূঢ় ব্যঙ্গাত্মক রচনা বাঙ্গালা ভাষায় অল্পই দেখা যায়। * * যে সকল ক্ষণজন্মাপুরুষ আপনাদের সর্ব্বস্বদান করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া গিয়াছেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন।"

"তিনি আজ স্বর্গগত; কিন্তু তাঁহার শক্তি আজ বঙ্গের সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কর্ম্মশীল রহিয়া তাহাদিগকে আজিও সঞ্জীবনী সুধা দান করিতেছে। * * তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গবাসী; দ্বিতীয় অনুষ্ঠান সুলভে শাস্ত্রপ্রকাশ।"

কৈলাস চন্দ্র সিংহ (১৮৫৫-১৯১৮)—

কৈলাস চন্দ্র সিংহ রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস, স্বাধীনতার ইতিহাস, সেনরাজগণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক পুস্তক রচনা দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৫৫-১৮৯৩)

কবি রাজকৃষ্ণ রায় বর্ত্তমান যুগের রবীন্দ্র নাথের মত একজন বহুগ্রন্থ লেখক। নাটক, উপন্যাস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা প্রভৃতি ইনি

অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি অতিক্রত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ইঁহার প্রহ্লাদ চরিত্র নাটক এককালে বহুদিন ধরিয়া বিশেষ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। ইঁহার গদ্য রচনার মধ্যে দুই শিকারী, প্রতিফল, জ্যোতির্ম্ময়ী, হিরণ্ময়ী ও কিরণময়ী উল্লেখযোগ্য।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৮৯৭)—

ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'যোগেশ' নামে একখানি উচ্চ অঙ্গের কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। কাব্য বা কবিতা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। তবে 'সুধাময়ী' নামে ইঁহার একখানি উপন্যাসও ছিল।

নীলকণ্ঠ মজুমদার (১৮৫৫-১৯০১)

নীলকণ্ঠ মজুমদার গীতারহস্য, বিবাহ ও নারীধর্ম্ম প্রভৃতির রচয়িতা। ইনি এক অভিনব প্রথায় গীতার নিগূঢ়তত্ত্ব সমূহ সরল ও সহজভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। দুই বন্ধুতে কথোপকথনচ্ছলে ঐ সমস্ত তত্ত্বের আলোচনা ও মীমাংসা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বিষয়টী দুরূহ ও দুর্ব্বোধ হইলেও অপেক্ষাকৃত সহজ ও উপাদেয় হইয়াছে।

বিহারী লাল সরকার (১৮৫৫-১৯২১)—

বিহারী লাল সরকার একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য সেবী। ইঁহার শকুন্তলাতত্ত্বে পদ্মপুরাণান্তর্গত শকুন্তলা উপাখ্যানের সহিত মহাকবি কালিদাস বর্ণিত অভিজ্ঞান শকুন্তলের তুলনা অনুশীলিত হইয়াছে। ইংরাজের জয়ে ক্লাইভ কর্ত্তৃক আর্কট অবরোধ ও বিজয়লাভ এবং পলাশীর যুদ্ধ হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর

নামক গ্রন্থে ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত ও সমসাময়িক ঘটনাবলী সরলভাষায় সবিস্তারে ও নিখুঁতভাবে বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইঁহার গানের ও কবিতারও গ্রন্থ আছে। তাহা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। ইঁহার অনুসন্ধিৎসা, ইঁহার সমালোচনাশক্তি, ইঁহার ইতিহাস ও সাহিত্যের গভীর জ্ঞান—বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রচনা যেমন সরল তেমনি উচ্চভাবপূর্ণ। ইঁহার অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তিতুমীর। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা সকলেরই পরিচিত ।

নিখিল নাথ রায় (১৮৫৬-১৯৩২)

নিখিল নাথ রায়ের নাম ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখক বলিয়াই বিখ্যাত। ইঁহার রচনার মধ্যে মুর্শিদাবাদ কাহিনী, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, প্রতাপাদিত্য, ইতিকথা, মরণ রহস্য, বারই ডিসেম্বর, কবিকথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩)

স্বদেশপ্রাণ অশ্বিনীকুমার দত্ত ইংরেজীতে পণ্ডিত হইয়াও বঙ্গভাষাকে কয়েক খানি মুল্যবাম ধর্ম্মপুস্তক উপহার দিয়াছেন। তন্মধ্যে ভক্তি-যোগ, প্রেম ও দুর্গোৎসব তত্ত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭-১৯২৭)—

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রাজ নারায়ণ বসুর সুযোগ্য পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বসু মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, পতিব্রতা গ্রন্থাবলী, সীতা অহল্যাবাঈ, তুকারাম চরিত প্রভৃতির রচয়িতা। তন্মধ্যে মধুসূদনের জীবন চরিত ইঁহার কীর্ত্তি-বৈজয়ন্তী বলা যাইতে পারে। এরূপ জীবন চরিত তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আর কেহ রচনা করেন

নাই; এমন কি আজ পর্য্যন্ত এরূপ জীবন চরিত আর একখানিও রচিত হয় নাই। মেকলের ভাষায় বলিতে গেলে—বঙ্কিমচন্দ্র যেমন উপন্যাস রচয়িতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গিরিশচন্দ্র যেমন নাটক রচয়িতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যোগীন্দ্রনাথ সেইরূপ বঙ্গীয় জীবন চরিত রচয়িতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। "He has no second" এই পুস্তকে তিনি মেঘনাদ বধে বর্ণিত প্রত্যেক চরিত্র অসামান্য যোগ্যতার সহিত বিশ্লেষণ ও অনুশীলন করিয়াছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭—১৯১১)—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুযোগ্যা বিদুষী কন্যা—দীপ নির্ব্বাণ, বসন্তোৎসব, মালতী, গাথা, হুগলীর ইমাম বাড়ী, মিবাররাজ, বিদ্রোহ, নবকাহিনী, গল্পগুচ্ছ, ছিন্নমুকুল, স্নেহলতা, ফুলের মালা প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িত্রী—স্বর্ণকুমারী দেবী। ইঁহার দীপনির্ব্বাণ দুর্গেশনন্দিনীর পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার জন্য, ইনিই প্রথম মহিলা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ "জগত্তারিণী" পদক লাভ করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার দান যেমন বিপুল তেমনি বিচিত্র।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৭—১৯১৭)—

বিদ্যাসাগরজীবনীপ্রণেতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনোরমার গৃহ, মা ও ছেলে, জীবন সোপান, কমলকুমার, অদৃষ্টলিপি, দুখানি ছবি, বাসুদেব জীবনী, অমরধাম, দেবগণের ভারত ভ্রমণ প্রভৃতি রচনা করেন। ইনি বিদ্যাসাগরের জীবনী লিখিয়া বিপুল খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী (১৮৫৮—১৮৯৪)—বাঙ্গালাভাষায়

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি রচনার এবং বঙ্গদেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রসারের দরুণ প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করার দরুণ জগদীশচন্দ্রের নাম প্রসিদ্ধ। ইঁহার প্রথম পুস্তক 'হোমিওপ্যাথী মতে গৃহ চিকিৎসা'; "এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে এই পুস্তকই সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার ভাষা এত সরল ও প্রাঞ্জল যে, স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত এই পুস্তক পড়িয়া চিকিৎসা করিতে পারেন।" দ্বিতীয় পুস্তক 'হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে আপত্তি খণ্ডন'; তৃতীয় 'ওলাউঠা চিকিৎসা'। "বঙ্গভাষায় হোমিওপ্যাথি মতে ওলাউঠা চিকিৎসা সম্বন্ধে পুস্তক ইহাই সর্ব্বপ্রথম এবং পুস্তকখানিও সুন্দর"। চতুর্থ পুস্তক 'নরশারীর তত্ত্ব'; পঞ্চম 'জ্বর চিকিৎসা,' অতঃপর 'চিকিৎসা তত্ত্ব'; ভৈষজ্য তত্ত্ব এবং 'সদৃশ চিকিৎসা' নামক সুবৃহৎ 'প্র্যাকটিস অব মেডিসিন' লিখিতে থাকেন। ইঁহার ভৈষজ্য তত্ত্ব ডাক্তার হেরিঙ্গ সাহেবের মেটিরিয়া মেডিকার বঙ্গানুবাদ; ইহা একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৮—১৯০৯)—

প্রেমপ্রতিমা, বিমাতা, বড় ভাই, আমাদের ঝি, ঠাকুর ঝি, কলঙ্কিনী, গল্প গুজব, বাংলা মেয়ে, প্রসন্নকান্তের উইল, উপন্যাস লহরী, চা কুলীর আত্মকাহিনী, কনে বৌ, খুড়িমা, পাহাড়ী বাবা প্রতিশোধ, চিত্র প্রভৃতি বহু উপন্যাস লেখক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনার জন্য ইঁহার সমধিক প্রসিদ্ধি।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৫৯—১৯১৩)—

তন্ত্রতত্ত্ব, গীতাঞ্জলি, মা, স্বভাব, ও অভাব, কর্ত্তা ও মন, বিদ্যার্ণবের দুর্গোৎসব, গঙ্গেশা প্রভৃতি প্রণেতা শিবচন্দ্র

এই বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে বঙ্গসাহিত্য সাম্রাজ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একচ্ছত্র

সম্রাট ; তখন তাঁহার যশঃ সৌরভে বাঙ্গালা ভরপুর। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্য ছিল, তিনি নিজের অতুল প্রতিভাশক্তি দ্বারা সে সমুদয়কে স্ববশে আনিয়া, নিজেকে সেই বিস্তীর্ণ সম্মিলিত বাঙ্গালা সাহিত্য সাম্রাজ্যের অবিসংবাদিত নেতা বা অধীশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংরেজি সাহিত্যে জন্‌সনের যুগে যেমন ডাক্তার জন্‌সন্‌, আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। জন্‌সনের যুগে আমরা ইংরেজি সাহিত্যে Burke, Robertson, Wartons, Gray, Mason, Gibbon, Adam Smith, Beattie, Sir William Jones, Goldsmith, Churchill, Reynolds, Geard Hamilton, Beauclerk, Langton, Windham, Boswell, Mrs. Thrale, David Garrick প্রভৃতি বহুসংখ্যক মনীষী লেখক ও সাহিত্যিকের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই, বঙ্কিমের যুগেও তেমনি বাঙ্গালা সাহিত্যে কালীসিংহ, কেশব সেন, শিশির ঘোষ, বীরেশ্বর পাঁড়ে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, গিরিশ ঘোষ, তারক গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, চণ্ডীচরণ সেন, রামদাস সেন, অক্ষয় সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রমেশ দত্ত, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,রজনী গুপ্ত, অমৃত বসু, যোগেন্দ্র বসু, রাজকৃষ্ণ রায়, প্রভৃতি বহু সুপ্রসিদ্ধ মনীষীলেখক ও সাহিত্যিক এককালে বিরাজমান দেখিতে পাই। সৌরজগতে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মধ্যে যেমন সূর্য্য, তেমনি জনসনের যুগের উল্লিখিত লেখকগণের মধ্যে স্বয়ং জন্‌সন্‌ ও বঙ্কিমের যুগে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র।

বর্ত্তমান যুগ

আমাদিগের পূর্ব্বলিখিত যুগবিভাগ অনুসরণ করিলে রবীন্দ্রনাথের যুগই বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগ। বলা বাহুল্য, এই যুগের অধিকাংশ লেখকই এক্ষণে জীবিত; জীবিত ব্যক্তির রচনাবলীর সম্যগ অনুশীলন সমীচীন নহে, সম্ভবপরও নহে; সুতরাং বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যের বা সাহিত্যিকগণের সংক্ষেপে অনুশীলন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই যুগে এত অধিক গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে যে এই যুগের বাঙ্গালা গদ্যের সম্যগ্ অনুশীলন করিতে হইলে ইহাকে তিনটী উপবিভাগে ভাগ করা সমীচীন মনে হয়। এই তিনটী উপবিভাগ যে প্রথমটীর পর দ্বিতীয়টী এবং তৎপরে তৃতীয়টী, তা' ঠিক নহে। বস্তুতঃ, এই তিন উপবিভাগ সময়ের অনুক্রম হিসাবে নহে; এই দীর্ঘযুগের সমগ্র সাহিত্য-সমষ্টিতে তিন জন সাহিত্যিক মহারথীর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় ——

রবীন্দ্র সম্প্রদায়ের ভাষা :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—)—

অনাম ধন্য বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য-সম্রাট কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সম্প্রদায়ের অধিনায়ক। একদিন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করিয়া

বলিয়াছিলেন—তিনি 'ভাষার মুখে খড়ের নুড়ো জ্বেলেছেন'।" অন্য এক সমসাময়িক কবি রঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন—"ঠাকুরগোষ্ঠীর ভাষা ইংরাজীতে ভাজা। ড্যাফোডিল পুষ্পে যেন মনসার পূজা॥" বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত বা বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্ত্তিত বঙ্গভাষায় অনেক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন। তবে, তিনি যে এক অসীম প্রতিভাশালী লেখক তাহা অস্বীকার করিবে কে? তিনি নিজে বঙ্কিমচন্দ্রের মত নানা বিষয়িণী অসংখ্য রচনা দ্বারা তাঁহার অসীম শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন—প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, উপন্যাস, গান, কাব্য, ধর্ম্মতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব—সকল বিষয়ক বহু সংখ্যক সারগর্ভ প্রবন্ধ হইতে তাঁহার অপূর্ব্ব রচনাশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অধিক করিয়া ইঁহার পরিচয় দেওয়া বর্ত্তিকাসাহায্যে সূর্য্যদর্শনের মত।

"The psychological novel in Bengali Literature has Rabindranath as pioneer, for his *Naukadubi* and *Chokcr Bali* (specially the latter) show the innate tendency of the poet in revealing his plot through the analysis of the emotions of the *dramatis personae*. His early attempts in the range of the novel (viz. *Bauthakuranir Hat*) were attempts in the manner of Bankim chandra and could not be said to have achieved great success. His later works—*Gora* and *Ghare Baire*—sustain his reputation as a novelist. * * * Rabindranath is one of 'the world's

greatest short story writers'. His stories delineate figures and faces so true and life-like, so sparkling and animated, so rich in variety and beauty, that they seem to be a world by themselves created by the will of a great enchanter.

'This writer or that has surpassed Rabindranath in some quality or other. But where are we to find a writer of stories so different and so good as Hungry stones, Living or Dead, Subha, Cloud and Sun, The Kingdom of Cards, The Trust Property, The Riddle Solved, and ths Elder 'Sister ? Four of these eight are of the deepest tragedy, a very unusual feature in an Indian writer ; two are of tragedy of a less mixed and absolute kind ; but sufficiently poignant, with irony salting the bitterness and with tender laughter softening the pathos ; one deals with a pathos of sheer phantasy, two are ghastly, several are masterly psychological studies'— Thompson.

As an essayist, Rabindranath is also a remarkable figure. His critical expositions of Valmiki's *Ramayana*, Kalidasa's *Sakuntala*, *Kumara Sambhava* and *Megha-duta*, Bana's *Kadambari*. and apprecia-

tions of Vidyapati, Rammohan, Devendranath, Bankim, Biharilal, Dwijendralal and others, his essays on Beauty, Morality, Folk Literature, National Education, &c. his dissertations on politics, theology and sociology are all products of a master-mind and may fairly bear comparison with the best essays of European writers. * * *

He has for the first time imparted literary grace to letter-writing, and produced prose-poems in our language. His autobiography also 'the world will not let willingly die' "—History of Bengali Literature by Kumudnath Das.

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ভাষাপরিচর্য্যা পাশাপাশি তুলনা করিয়া শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দাস বঙ্গশ্রীর ১৩৪১ সালের আষাঢ় সংখ্যায় লিখিয়াছেন—"ভাবকে ভাষার অধীন না করিয়া, ভাষাকে ভাবের অধীন করিয়া—সাহিত্যের যাহা প্রধান ধর্ম্ম, সেই প্রকাশশক্তিকেই প্রাধান্য দিয়া, বৈয়াকরণ ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের অতিরিক্ত শুচিবায়ু রোগ পরিহার করিয়া—বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাগদ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ভাষাকে জীবধর্ম্মী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তারপর প্রাণের আবেগে নিরন্তর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করিয়া সেই জীবন্ত বাণীদেহ রবীন্দ্রনাথের যুগে সুদৃঢ় সুবলিয়িত ও সুনমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।"

বঙ্গবাণী প্রণেতা শশাঙ্কমোহন সেন বলিয়াছেন: "জন্ম-গায়ক

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে মনুষ্যের আধুনিক ভাষা ও ভাব-পদ্ধতির ক্ষেত্রে নানাদিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। * *

এখনও তাঁহার সম্যক আলোচনার সময় আসে নাই। সে সময় বহুদূরবর্ত্তী থাকুক—বঙ্গসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রভায় কৃতার্থ, সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত হউক! রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে যে সকল মৌলিক উপকরণ ও স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে কোনও কবি কিংবা লেখক পারেন নাই। তাঁহার প্রতিভা নিত্য নব নব পথে খেলিতেছে। তিনি বঙ্গীয় খণ্ড কবিতার সাহিত্যকে এমন শব্দসম্পৎ, সত্য ও সৌন্দর্য্যের উপাদান, রচনার কারুকার্য্য, চরণের মাধুর্য্য, অলঙ্কারের পরিপাট্য ও ছন্দের শত সহস্র প্রকার বৈচিত্র্যে ভূষিত করিয়া যাইতেছেন যে, বঙ্গভাষা এই ক্ষেত্রে স্পর্দ্ধা করিয়া পৃথিবীর অন্য সাহিত্যকে আপন কুটীরে একবার নিমন্ত্রণ করিতে পারে। তাঁহার অনেকগুলি কবিতা আমরা জগতের আধুনিক সাহিত্য-প্রদর্শনীতে নির্ভয়ে পাঠাইতে পারি। * * ইহা বঙ্গভাষার অল্প গৌরবের কথা নহে।

রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্টতার মূলকারণ স্বাধীনতা। তিনি শৈশব হইতেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতায়, এমন কি সময়ে সময়ে স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বকীয় শক্তির অনুসরণ করিতেছেন। * * *

[রবীন্দ্রনাথ] বঙ্গ-জীবনের উদ্যান হইতে ক্ষুদ্র গল্পের 'গন্ধপদ্ম'ময় পুষ্পচয়ন করিয়াছেন; দেশের পূর্ব্বাপর কাহিনী-কথার মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ভাবরসের আস্বাদ লইয়াছেন; দেশের ধর্ম্মনীতি এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক নিজের স্বপ্নাবেশ-বিহ্বল তত্ত্ব-ভাবুকতায় অবগাহন করিয়াছেন; সমাজ এবং পরিবারের ক্ষেত্রেও

প্রবেশ করিয়া অভিনিবিষ্ট হইতে চেষ্টা করিয়াছেন ; আসঙ্গ-লিপ্সা নামক পদার্থটাকে টুকুড়া-টুকুড়া করিয়া কাটিয়াছেন ; অনুবীক্ষণ দিয়া তাহাকে উণ্টাইয়া পাণ্টাইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন ; দাম্পত্য প্রেমকে নৌকাডুবি করিয়া একেবারে ডুবাইয়া দিয়া, ক্রমে ছায়াসঙ্কেত এবং অপরিস্ফুট অনুভবের মধ্য দিয়া তাহাকে আবার নবজীবনে বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন ; বর্ত্তমান ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ মধ্যে 'জাতীয় জীবন' নামক পদার্থকে অসম্ভব বলিয়া প্রমাণ পূর্ব্বক উহাকে সোজাসুজি 'আদি ব্রাহ্মসমাজের' দরজা দেখাইয়া দিয়া, স্বয়ং শান্তি-নিকেতনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ; হিন্দুসমাজের অচলায়তনের প্রাচীন পাকা দেওয়াল ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে বর্ত্তমান সমাজ সভ্যতার সূর্য্যালোক প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। * *

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে বহুরূপী, এবং তিনি আধুনিক খণ্ড কাব্যের অনেক বিভাগের ন্যূনাধিক সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কতরূপে কতভাবে দেখা দিয়াছেন—দিতেছেন, এখনও তাহার বিরাম নাই। অতএব তাঁহার দোষগুণের সম্যক্ আলোচনা বর্ত্তমানে সহজ নহে ; সম্ভবও নহে। * * *

ছোট গল্পের এবং নবেলের ক্ষেত্রেও তিনি সবিশেষ জর্জ্জ এলিয়ট হইতে আরম্ভ করিয়া গ্যেঠে, পো মেরিডিথ, টলষ্টয় বিশেষতঃ ফরাশি কথা-লেখকগণকে (বেলজাক, গীঁদে মোপাসা, থিওফাইল গঁতিয়ে এবং এনাটোল ফ্রাঙ্গ প্রভৃতিকে) উদরসাৎ করিয়াই নিজের স্বাধীন মাহাত্ম্য সিদ্ধ করিয়াছেন। * * * রবি কবির আবির্ভাব বঙ্গসাহিত্যে একটা স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া চিরকাল নির্দ্দিষ্ট হইবে। তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে, বাঙ্গালী হৃদয়ের অন্তঃসুপ্ত ভাবুকতা এবং দার্শনিকতাকে

নানাদিকে উদ্দীপিত করিয়া, নানাপ্রকার ছোট-বড় পরভৃৎ লেখকের আহার দাতা, এবং স্বাধীন কবিনিবহের শিক্ষা-স্থানীয় হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে বঙ্গভাষার আভ্যন্তরীন শক্তি এবং মাহাত্ম্য তাঁহার হস্তে নানা-দিকে বর্দ্ধিত হইয়া উহার রুচি এবং সভ্যতার আদর্শকেও নানা-প্রকারে শাসিত করিতেছে। * * *

তাঁহার গদ্যে পদ্যে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র গল্প এবং উপন্যাসের মধ্যে ফরাসী রীতি সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট। ফরাসি নিয়মের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের উপন্যাস রচনায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়। * * *

বাঙ্গালীর হৃদয় যাহাতে আধুনিক ইউরোপের সর্ব্বপ্রকার ভাবনা-মহিমায় পরিচিত হইতে পারে, চিরজীবন সাময়িক পত্রিকার সম্পর্কে থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ সে উদ্দেশ্যে বাঙ্গালী হৃদয়ের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিতেছেন! * * *

তিনি বঙ্গসাহিত্যে সৌন্দর্য্য তত্ত্বের পুরোহিত—High priest of beauty এই সৌন্দর্য্যও বহুস্থলে কেবল যৌনভাবের সৌন্দর্য্য বই নহে। * * *

তাঁহার ক্ষুদ্র গল্প এবং চৈতালি, কথা ও কাহিনী এইরূপে প্রকৃতির মন্দিরে প্রত্যাগমনের দৃষ্টান্তই বহন করিতেছে। কিন্তু, চিরকাল যেন তাঁহার 'রাজার সাজ'। রাজবেশে প্রকৃতি-মন্দিরে অনেক সময়েই প্রবেশ করা যায় না। * * * তাঁহার ভাষার রাজ-বেশ, অলঙ্কারের ঝিকিমিকি, এবং শব্দসিঞ্জনের পারিপাট্য অথবা অত্যধিক মার্জ্জনার গতিকেও হয়ত দৃষ্টি ঝলসিয়া যায়—মনোযোগ স্থির করার পক্ষে অতিমাত্রায় পিচ্ছল বোধ হইতে থাকে। * * * 'নৌকাডুবি' তাঁহার একটি কবিত্ব সুন্দর পারিবারিক উপন্যাস। * * *

তাঁহার [রবীন্দ্রনাথের] দৃষ্টি ক্ষুদ্রের মহত্ত্ব দর্শনেই সবিশেষ পটু। ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যে, মানব-চরিত্র অধ্যয়নের গভীরতায়, তাঁহার অনেক গল্প সাহিত্যে উচ্চ শ্রেণীস্থ হইবার উপযুক্ত। এই সমস্ত গল্পে বঙ্গীয় গদ্যের বর্ত্তমান উচ্চতাও বুঝিতে পারা যায়। * * *

প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথও নাটক লিখিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার নাটকগুলি আমাদের দুর্গাপ্রতিমার মত; সুন্দর রং, বিচিত্র গঠন, রাঙ্গতার চাকচিক্য—সকলই আছে, নাই কেবল প্রাণ! এত জাঁক জমক, এত বর্ণনার পারিপাট্য সাহিত্যে অল্প নাটকেই আছে। কিন্তু, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অপরিহার্য্য এবং অন্তরতম পদার্থটীর অভাবে যেন সমস্ত বিফল হইয়া গিয়াছে। এই কারণে, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির সহিত আমাদের প্রকৃত সহানুভূতি হয় না; মনে হয়, একটাও যেন প্রকৃতিস্থ নহে! সকলেই অভিনয়ের জন্য ব্যস্ত; এবং সঙ্গীত ভাবাক্রান্ত বাক্য-বিন্যাসের জন্য একান্ত ব্যাকুল! * * *

[রবীন্দ্রনাথ] নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিশক্তি এবং কবিত্ব শক্তির ফল উপাহরণ পূর্ব্বক কবিপদবী অর্জ্জন করিয়াছেন এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজের বিশিষ্ট চরিত্র অঙ্কিত করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। * *

তাঁহার মধ্যে হয়ত মধুসূদনের শক্তি, হেমচন্দ্রের বিশিষ্ট গৌরব কিংবা নবীনচন্দ্রের জ্বালাতরঙ্গময়ী ভাব প্রবণতা নাই; কিন্তু তাঁহার মধ্যে বঙ্গভাষার যৌবনোপযোগী এমন একটা তরলোজ্জ্বল লাস্যলীলা বা আনন্দের এবং কৌতুকের চমক আছে, সর্ব্বোপরি বাঙ্গালিজীবনের ক্ষুদ্র সরল বস্তু বিষয়কগুলিন অবলম্বন পূর্ব্বক অনন্তের দিকে—অপ্রাপ্ত এবং অজ্ঞাত উদ্দেশে, এমন একটা অনির্ব্বচনীয় সঙ্কেত বা অস্পষ্ট

মধুর ঈষারা স্ফূরিত হইয়াছে যে, উহাই আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে, প্রাচ্য সাহিত্যের তরফ হইতে, নব মাহাত্ম্য অধিকার সপ্রমাণ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলীর সাধুবাদ অর্জ্জন করিয়াছে; এবং উহাই ১৯১৩ সনের নোবেল পুরস্কার অর্জ্জন পূর্ব্বক আমাদের বঙ্গ সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে! * *

কবি রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন গদ্যে পদ্যে এইরূপ দার্শনিকতার সাধনা করিয়া আসিয়াছেন! তাঁহার প্রতিভা একদিকে যেমন সঙ্গীতের প্রতিভা, তেমন অন্যদিকে একটা দার্শনিকতার প্রতিভা; * * *"

উক্ত শশাঙ্কমোহন বাণী-মন্দির নামক পুস্তকে আরও লিখিয়াছেন:—
"দেহের কামবৃত্তি এমন পদার্থ যে, কেবল একজোড়া স্ত্রীপুরুষ খাড়া করিয়া এবং তাহাদিগকে পরস্পর কামোন্মত্ত করিয়া তাহাদের গুহ্য গোপনীয় আলাপ ব্যবহার বর্ণনা করিতে গেলে, বিশেষ কোন কবিত্ব নাই, মানুষের দৈহিক স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয়। এইরূপে ফলে, মানুষের কামবৃত্তির স্নায়বিক উত্তেজনা সাধন করাকেই এ সমস্ত আর্টিষ্ট্ ধরিয়াছেন 'সাহিত্যে সৌন্দর্য্য সাধন'। তাহার উপর, লেখকের ক্ষমতা থাকিলে, বিচিত্র প্রয়োগ কৌশলে কখন বা চাপ দিয়া, কখন আস্কারা দিয়া এরূপ স্নায়ু উত্তেজনার মাত্রা বাড়াইয়া তুলিয়া অসতর্ক ব্যক্তিকে একেবারে উন্মত্ত করিয়া দিতেও বাধা নাই! এরূপে, পরস্পর ক্ষুধার্ত্ত স্ত্রীপুরুষের মশারিদৃশ্য অথবা অভিসার দৃশ্যের বর্ণন, তাহাদের কামক্ষুধার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিলাসলীলার উদ্‌ঘাটন—উহার নামই সাহিত্যে Sex psychology; এবং এইরূপে কল্পিত স্ত্রীপুরুষের হাবভাব ভঙ্গী ও আকার ইঙ্গিতের 'অনুবীক্ষণী' বিবরণ, উহাই হইল আধুনিক সাহিত্যের Realism ও Naturalism—অন্য কথায় সাহিত্যে

'বৈজ্ঞানিক রীতি'। * * আস্ত কামোদ্রেককেই 'সাহিত্যিক রসোদ্রেক, বলিয়া চালাইয়া দেওয়ার নামই Art for Art's sake ; * *

এ আদর্শের জনক নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয়—ফরাসী নবেল সাহিত্য। * *

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়', 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাহিরে' গল্পও ব্যভিচারাত্মক কামকেই প্রাধান্যতঃ আশ্রয় করিয়া আর্টের 'সৌন্দর্য্য' চয়ন ও রসসিদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে ফরাসী শিল্পীর 'সত্যবাদ' ও Art for Art আদর্শে উৎসাহী এবং সাহসী হইয়াই এতাদৃশ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া ছিলেন, তাহাতে আমাদের অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি নবেলী শিল্পশক্তির অনেকগুলি বলবান্ লক্ষণ ইংরেজী অপেক্ষা বরং ফরাসী আবহাওয়াতেই সুসিদ্ধ করিয়াছেন। * *

কালিদাসের পর এমন সৌন্দর্য্যতন্ত্রী এবং আদিরসের এমন একাগ্র উপাসক কবি ভারতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রচনায়, সত্য ও সৌন্দর্য্য সাধনায় যে প্রশান্ত ও নিবিড় দৃষ্টির ঘনফল উপচিত এবং প্রৌঢ় হইয়াছে, সাহিত্যজগতে তাহার তুলনা নাই। কিন্তু বিস্তারিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে নামিয়া স্বধর্ম্মবিস্মৃত কবি ফরাসী আদর্শের আওতায় পড়িয়া কি বিড়ম্বনাই না ভোগ করিয়াছেন। * * উপর্য্যুপরি তিন তিনটী গল্পে কেবল ব্যভিচারের অনুচিন্তন করিয়াই চলিতে পারিয়াছেন ! * *

মহেন্দ্র বিনোদিনী অথবা বিমলা-সন্দীপের নানাবিধ শৃঙ্গার চেষ্টার সূক্ষ্মোজ্জ্বল পরিবর্ণনা আমাদের যতই সুখ দিতে থাকে, স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়া যতই 'বাহবা' লাভ করিতে থাকে, ততই সঙ্গে সঙ্গে অন্তরাত্মার নিভৃত প্রকোষ্ঠ হইতে যেন আর একটী কণ্ঠের

সৌম্য সূক্ষ্ম ধ্বনিও শোনা যায়, যাহাকে কবির প্রতি শ্রদ্ধা অথবা সাধুবাদের 'উদ্গিরণ' বলিয়া কোনমতেই মনে করিতে পারি না। * *

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ভাবুক এবং অন্তরাকাশ বিহারী পক্ষীও যেখানে বিষয় বস্তুর কদর্য্য মৃত্তিকাধর্ম্মে পঙ্ক কলঙ্কিত হইয়াছেন, তখন অন্যে পরে কা কথা! * *

ব্যভিচার আলোচনা সমাজে সকল ভদ্রবর্গের পক্ষেই ত অশ্রাব্য হইয়া আছে! * * যদি কোন ভদ্র বন্ধুসভায় বলিতে যাই 'শুনেছ, শুনেছ—আমাদের বন্ধুপত্নী বিধবা অমুক—অমুক বাবুর সঙ্গে'—— তা' হইলে তৎক্ষণাৎ সুশ্রাব্য শুনিয়া এবং অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়াই সে স্থান হইতে ফিরিতে হয়। আর যখন হাতে কলমে লিখিয়া অথবা ছাপা বই করিয়া, উহা হাতে লইয়াই উপস্থিত হই, অমনি পরম আদরের ব্যাসাসন পড়িয়া যায়, আর তাকিদ হইতে থাকে 'তাইত হে—— তারপর!'—এই ত প্রকৃত অবস্থা! কোন ভদ্রমহিলা পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার—আমোদে লিপ্ত আছেন, উৎসাহাতিশয্যে তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা করা দূরে থাকুক সঙ্কেত মাত্র করিতেও আমাদের ভদ্রতাবুদ্ধি বাধা প্রদান করে: ভদ্রসমাজের শ্রোতামাত্রে উহাতে বরং নিজেকেই অপমানিত মনে করিয়া রুষ্ট হইয়া থাকেন। ভদ্রসমাজে যাহা এতই বিগর্হিত, সরস্বতীমাতার পবিত্র মন্দিরে প্রবেশমাত্র তাহা কিরূপে আমাদের চোখে ধূলা দিয়া এতই মনোরম্য এবং প্রকাম্য হইয়া দাঁড়াইতে পারে? মুখে বলিতে গেলে যাহা এতই কুৎসিত এবং হেয় লেখনীর ক্ষেত্রে আসিয়া তাহা কিসে এতই সুধাবিনিন্দী এবং সুগন্ধি স্বরূপে ধাঁধাঁ লাগাইতে পারে? 'There must be something in this state of Denmark!'

ফলতঃ মাদাম বোভারী, Red Lily, জুদারম্যানের Song of Songs এর Lily, মহেন্দ্র বিনোদিনী ও 'নষ্ট নীড়ে'র বউদিদি —ইহাদের প্রত্যেকেই ত ঘোর অভদ্র, বিশ্বাসঘাতক, জুয়াচোর এবং মিথ্যাবাদী! কামের উদ্রেকে যতই স্নায়ুসুখ জন্মিতে থাকে, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে যতই কুতূহল চরিতার্থ হইতে থাকে, ততই পাত্র-পাত্রীর এত সমস্ত অভদ্র ও জুগুপ্সিত আচরণে আমাদের আত্মাপুরুষ লেখকের প্রতি অপরিসীম বিরুদ্ধ বুদ্ধি ও বিতৃষ্ণায় তিক্ত বিরক্ত হইতে থাকে। * * *

এক নৌকাডুবি ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের বিস্তারিত নবেলগুলি—— নষ্টনীড়, চোখের বালি, ঘরে বাহিরে—পড়িতে বসিলে প্রতিপদে মনে হইতে থাকে যে, একজন পরম যৌন সৌন্দর্য্য রসিক কথাশিল্পীর, বিশেষতঃ যিনি কোন নীরস বাক্য উচ্চারণ করিতেই জানেন না এমন শিল্পীর রচনা মধুই পান করিয়া চলিতেছি! কিন্তু পান করিতেছি প্রকৃত প্রস্তাবে কোন্ বস্তু? মানুষের একটা কদর্য্য কুৎসিত অধঃপতনের মনোরম বর্ণনা। * * *

'চোখের বালি' 'নষ্টনীড়' অথবা 'ঘরে বাহিরে'র ঘটনা সংবিধান হইতে একটা ফলিতার্থ এ'রূপ দাঁড়ায় যে, কোন শ্রেয়ঃকামী দম্পতী আপনাদের গৃহগণ্ডী মধ্যে দ্বিতীয় কোন গুণী, সুরূপ কিম্বা কোন দিকে 'চিত্তাকর্ষক' স্ত্রী অথবা পুরুষকে প্রবেশ করিতে দিবে না; নিজের কোন 'ভাই'কে বা অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও বিশ্বাস করিতে নাই; পৃথিবীর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই। অথচ স্বাধীনতা-প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে এরূপ 'পারিবারিক আদর্শ' পোষণ করেন বলিয়া ত কোনমতে ধারণা করিতে পারি না! * * তিনটি গ্রন্থেই

হিন্দুপারিবারের শুদ্ধান্তমন্দিরে আধুনিক আদর্শের 'স্বাধীনতা'র নূতন আবহাওয়া ঢুকাইয়া একই রকম দুর্ঘটনার উপন্যাস করিতে যাওয়াতে, বিশষতঃ একটা অসামান্য পাপাগুনকে অসতর্কভাবে নাড়া চাড়া করিতে যাওয়াতেই ঙ কবির উদ্দেশ্য ও তাঁহার শিল্পের মর্ম্মার্থ যেদিকে সেদিকে বেয়াড়া হইয়া, দগ্ধিয়া যাইতেছে ; শিল্পের 'রস', 'অর্থ,' 'মর্ম্ম' ও 'শরীর স্থান' সমস্তকে—কবির অনিচ্ছাসত্ত্বেও—ছাইভস্মে পরিণত করিতেছে !"

রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের অনুশীলন কালে শ্রীযুক্ত সোম নাথ মৈত্র লিখিয়াছেন —"প্রথম শ্রেণীর কবি গদ্যলেখক হিসাবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেচেন এরূপ দৃষ্টান্ত অন্য সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত গদ্যে ও পদ্যে, যেদিকে প্রতিভা পরিচালিত হয়েচে সেই দিকেই সর্ব্বোচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি করেচেন, অনেক সময় সাহিত্যের এইদুটি বাহনকেই জুড়িতে সমান তালে চালিয়েচেন, এমন লেখক জগতে কমই জন্মেচেন।

পাদ্রী টম্‌সন্ যাঁর কাছে থেকে শুনে তাঁর বইয়ে লিখেচেন যে 'These Torn Letters contain some of the best prose that he ever wrote,' তিনি বিচার শক্তিরই পরিচয় দিয়েচেন। ভাষার মধ্যে এত স্বচ্ছতা, এত নমনীয়তা ভাবের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বর্ণ বৈচিত্র্য প্রকাশে এমন উপযোগিত', সহজ অনাড়ম্বর সুষমার সঙ্গে এমন শক্তির সমন্বয়, রবীন্দ্রনাথের গদ্যের কম দেখা যায়। * * * চিঠিতে তিনি দ্বিধামাত্র না ক'রে আমাদের প্রতিদিনের মুখের ভাষা ব্যবহার করেচেন, কৃত্রিম সাধুভাষায় তাঁর নিবিড় অনুভূতি ও অন্তরঙ্গ মনো-ভাব প্রকাশ করতে যাননি। এগুলি যদি চিঠি না হ'ত তা'হলে হয়ত

এসব কথা তিনি সাধুভাষাতেই লিখতেন,—সে আজ চল্লিশ বছরের কথা, যখন বঙ্গ সাহিত্য ছিল সাধু সাধুভাষারই মুলুক,—তা' সে ভাষার-জোর থাক আর না থাক। যিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে সাধুভাষার বহিষ্করণে ছিলেন অগ্রণী, চল্‌তি-ভাষার সেই বিজয়ী সেনাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী একবার বলেছিলেন যে, সাধুভাষা হচ্চে ধোপদুরস্ত, তার একটুও রং নেই এবং অনেকখানি মাড় আছে, ফলে তা স্বতঃই ফুলেও ওঠে এবং খড়্ খড়্ও করে। * * * কিন্তু বলবার কথা যেখানে গভীর অথচ একান্ত সরল সেখানে আমাদের চল্‌তি ভাষা যে কতদূর উপযোগী এবং গুণীর হাতে তা কত সুরে বাজে তা এই চিঠিগুলি থেকে বুঝি। * * *" দৃষ্টান্ত স্বরূপ সোমনাথ বাবু একটা পত্রাংশও উদ্ধৃত করিয়াছেন; 'পাড়া গাঁয়ের কর্ম্মস্রোত খুব বেশী তীব্রও নয়, অথচ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নির্জ্জীবও নয়। কাজ এবং বিশ্রাম দুই যেন পাশাপাশি মিলিত হয়ে হাত ধরাধরি ক'রে চলেচে। খেয়ানৌকো পারাপার করচে, পান্থরা ছাতা হাতে ক'রে খালের ধারের রাস্তা দিয়ে চলেচে, মেয়েরা ধুচুনি ডুবিয়ে চাল ধুচ্চে, চাষারা আঁটিবাঁধা পাট মাথায় ক'রে হাটে আস্‌চে, দুটো লোক একটা গাছের গুঁড়ি মাটিতে ফেলে কুড়ুল নিয়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দে কাঠ চেলা করচে, একটা ছুতোর অশথগাছের তলায় জেলেডিঙ্গি উল্টে ফেলে বাটারি হাতে মেরামত করচে, গ্রামের কুকুরটা খালের ধারে ধারে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্চে, গুটি কতক গরু বর্ষার ঘাস অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহারপূর্ব্বক অলসভাবে রৌদ্রে মাটীর উপর প'ড়ে কান এবং লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্চে, এবং কাক এসে তাদের মেরুদণ্ডের উপর ব'সে যখন বড় বেশি বিরক্ত করচে

তখন একবার পিঠের দিকে মাথাটা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে। এখানকার এই দুই একটা একঘেয়ে ঠক্‌ঠক্ ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ, ছেলেমেয়েদের খেলার কল্লোল, রাখালের করুণ উচ্চস্বরে গান, দাঁড়ের ঝুপ-ঝাপ ধ্বনি, কলুর ঘানির তীক্ষ্ণ কাতর নিনাদস্বর, সমস্ত কর্ম্মকোলাহল একত্র মিলে এই পাখীর ডাক এবং পাতার শব্দের সঙ্গে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য ঘটাচ্ছে না—সমস্তটাই যেন একটা শান্তিময়, স্বপ্নময়, করুণামাখা একটা বড় সঙ্গীতের অন্তর্গত—খুব বিস্তৃত বৃহৎ অথচ সংযত মাত্রায় বাঁধা।'

উক্ত সোমনাথ বাবু রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র হইতে একটী জনহীন, তৃণহীন বালুচরের চিত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন; "দিগন্তের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত বালির চর ধূধূ করছে, তাতে না আছে গাছ না আছে বাড়িঘর, না আছে কিছু। আকাশের শূন্যতা সমুদ্রের শূন্যতা আমাদের কাছে চিরাভ্যস্ত, তার কাছে আমরা আর কিছু দাবি করি না,—কিন্তু ভূমির শূন্যতাকে সব চেয়ে বেশী শূন্য মনে হয়। কোথাও গতি নেই, জীবন নেই, বৈচিত্র্য নেই; যেখানে ফলে শস্যে তৃণে পশুপক্ষীতে ভ'রে যেতে পারত সেখানে একটী কুশের অঙ্কুর পর্য্যন্ত নেই,—কেবল একটা-উদাস, কঠিন নিরবচ্ছিন্ন বৈধব্যের বন্ধ্যাদশা। ঠিক পাশ দিয়ে পদ্মা চ'লে যাচ্ছে, ওপারে ঘাট, বাঁধা নৌকা, স্নানের লোকজন, নারকেল এবং আমের বাগান, অপরাহ্নে নদীর ধারের হাটের কলধ্বনি—দূরে পাবনার পারে তরুশ্রেণীর ঘননীল রেখা, কোথাও গাঢ় নীল, কোথাও পাণ্ডুনীল, কোথাও সবুজ, কোথাও মাটীর ধূসরতা—আর তারই মাঝখানে এই রক্তশূন্য মৃত্যুর মত ফ্যাকাশে সাদা। সন্ধ্যা বেলা সূর্য্যাস্তের সময় এই চরের উপর আর কিছুই নেই, কেউ নেই, কেবল আমি একলা।"

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"ছোটগল্পের আয়তন ক্ষুদ্র, সেজন্য ইহার আর্টও স্বতন্ত্র। উপন্যাসের ব্যাপকত্তা ও বৃহৎ পরিধি নাই বলিয়াই ইহার বিষয় নির্ব্বাচনে একটু বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন। ইহাতে জীবনের এমন একটী খণ্ডাংশ বাছিয়া লইতে হইবে, যাহা ইহার স্বল্পপরিসরের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করিবে। ইহার আরম্ভ ও উপসংহার উভয়ের মধ্যেই বিশেষ রকম নাটকোচিত গুণের সন্নিবেশ থাকা চাই। উপন্যাসের মত ধীর-মন্থর গতিতে ইহার আরম্ভ হইবার অবসর নাই, পাত্র পাত্রীর দীর্ঘ পরিচয় বা বিশ্লেষণের ইহাতে স্থানাভাব। * * * ছোটগল্পের আর্ট উপন্যাসের আর্ট অপেক্ষা দুরধিগম্য। * * *

তাঁহার গল্পগুলি আমাদের কর্ণে এই আশার বাণী ধ্বনিত করে, যে, আমাদের বিষয় দৈন্য ও বৈচিত্র্যহীনতার জন্য আমাদের কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই, আমাদের রস-সম্পদের কোন অভাব নাই, অভাব কেবল সূক্ষ্ম দৃষ্টির ও কবিত্বপূর্ণ অনুভূতির। * * *

তাঁহার গল্পগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায়েই তিনি আমাদের প্রাত্যহিক সাধারণ জীবনের উপর রোমান্সের অসাধারণতা ও দীপ্তি আনিয়া দিয়াছেন—(১) প্রেম; (২) সামাজিক জীবনে সম্পর্ক বৈচিত্র্য; (৩) প্রকৃতির সহিত মানবমনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ; (৪) অতি-প্রাকৃতের স্পর্শ। আমরা এই চারিটী উপায়ের বৈধতা ও কার্য্যকারিতা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি হইতে তাহাদের প্রভাবের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা করিব * * *

রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও ঔপন্যাসিক উভয়ের দৃষ্টি লইয়া

প্রেমের যে বিচিত্র ও রহস্যময় বিকাশ লীলায়িত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-জগতে নিতান্ত দুর্ল্লভ। আবার, ব্যর্থ, প্রতিহত প্রেম জীবনকে যে একটা বৃহৎ দুঃখে অভিষিক্ত করে ও মর্ম্মস্পর্শী করুণ সুরে প্লাবিত করিয়া দেয়, তাহাকেও তিনি আশ্চর্য্য গভীর সহানুভূতির দ্বারা অভিব্যক্তি দিয়াছেন।

যে-সমস্ত গল্পে প্রেমের এই বিচিত্র লীলা অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কতকগুলির বিশেষ উল্লেখ করা যাইতে পারে—'একরাত্রি', 'মহামায়া', 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান', 'মাল্যদান', মধ্যবর্ত্তিনী, শাস্তি, 'প্রায়শ্চিত্ত' 'দুরাশা' 'অধ্যাপক' ও 'শেষের রাত্রি'। * * *

'একরাত্রি' গল্পে চরিত্রাঙ্কনের চেষ্টা নিতান্ত সামান্য, ইহা কেবল প্রলয়-দুর্য্যোগ-রাত্রির অন্ধকারে নীরব স্থির প্রেমের ধ্রুবতারাটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। * * 'দুরাশা' গল্পটিতে সামান্য একটু মনস্তত্ত্বের স্পর্শ ও যথেষ্ট ঘটনা-বৈচিত্র্য থাকিলেও ইহা প্রকৃত পক্ষে মহামহনীয় প্রেমের আত্মকাহিনী। * * * 'অধ্যাপক' গল্পটার অনেকগুলি দিক আছে—একটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দিক। বক্তার লাঞ্ছিত সাহিত্যিক খ্যাতি ও ব্যর্থ কবি-যশঃ-প্রার্থিতার মধ্যে যে বিদ্রূপ-রসটি আছে তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। কিন্তু ইহার প্রধান বাণীটা প্রেমের—প্রকৃতির বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন শ্রীর সহিত সুন্দরী নারীর যে একটি নিগূঢ় প্রাণময় ঐক্য দেখান হইয়াছে, তাহা কবিপ্রতিভার সৃষ্টি—ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণ এখান পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। * * *

'দৃষ্টিদান' গল্পটি আগাগোড়া মৃদু কুসুম-সৌরভের ন্যায় নারীহৃদয়ের একটি অনুপম সংযত মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ—রমণীসুলভ কোমলতা একটি স্নিগ্ধশীতল প্রলেপের মত সমস্ত গল্পটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। * * *

কি পল্লীপ্রকৃতি বর্ণনায়, কি জীবনের সমালোচনাতে সর্ব্বত্রই এই অনির্ব্বচনীয় সুকুমার পবিত্রতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির ছাপ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ অন্ধের স্বচ্ছ গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টি ও শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাত্মক প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্য-বোধের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রশংসার অতীত। একটিমাত্র উদাহরণ দিব—'অথচ পত্রদ্বারা তিনি যে সর্ব্বদাই তাহার খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম ; যেমন পুকুরের মধ্যে বন্যার জল যেদিন একটু প্রবেশ করে সেই দিনই পদ্মের ডাঁটায় টান পড়ে—তেমনি তাঁহার ভিতরে একটুও যেদিন স্ফীতির সঞ্চার হয়, সেদিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করিতে পারি।' এই যে গভীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি—বোধ হয় চক্ষুহীন ভিন্ন ইহা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। গল্পটি পড়িলে মনে হয় যেন লেখক আপনার চক্ষুষ্মান প্রকৃতির সমস্ত সুবিধা বিসর্জ্জন দিয়া, পুরুষের সমস্ত শিক্ষাভিমান ও বুদ্ধিবিস্তার সঙ্কুচিত করিয়া এই পরম রমণীয়, সূক্ষ্ম-অনুভূতিময়, স্বচ্ছ অন্ধলোকে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন।

'মধ্যবর্ত্তিনী' গল্পটিতে কবিত্ব অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেরই প্রাধান্য। প্রেমের আবির্ভাব কি করিয়া তিনটি নিতান্ত সাধারণ যন্ত্রবদ্ধ জীবন যাত্রার মধ্যে গভীর বিপ্লব ও দুশ্ছেদ্য জটিলতা আনিয়া দিয়াছে তাহারই কাহিনী ইহার বিষয়। আপিস ও গৃহস্থালীর লৌহনিগড় বদ্ধ চিরাভ্যস্ত জীবনের নিতান্ত বাঁধা ধরা রাস্তার পথিক নিবারণ এই দুর্দ্দান্ত প্রেমের অত্যাচারে একেবারে সর্ব্বনাশের গভীর গহ্বরে ঝাঁপ দিয়াছে। হর সুন্দরী প্রৌঢ় বয়সে এই অকাল-জাগ্রত, বুভুক্ষু মনোবৃত্তির অতর্কিত পরিচয় লাভ করিয়া নিজের লৌকিক কর্ত্তব্যরত অতীত জীবনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও প্রবঞ্চিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। আর এই গল্পের তৃতীয়

ব্যক্তি শৈলবালা প্রেমের অপরিমিত আদর ও অযাচিত সোহাগ অনায়াসে লাভ করিয়া জীবনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও পরিণতি হইতে বঞ্চিত হইয়া অকালমৃত্যুর দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে। এই কাহিনীটি আমাদের বাঙালী পরিবারের অতিসাধারণ ঘটনা। কিন্তু লেখক এই অতিসাধারণ ঘটনার মধ্যেও কিরূপ অদ্ভুত ক্ষমতার সহিত গভীর রসধারা সঞ্চারিত করিয়াছেন ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যবোধ হয়। * * *

'মহামায়া' গল্পে মহামায়ার দীপ্ত তেজোপূর্ণ চরিত্রটি, অভেদ্য অবগুণ্ঠনের অন্তরালে, সুদূর রহস্য মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে ; * * *

'মাল্যদান' গল্পটিতে হরিণ শিশুর ন্যায় উদার, সরল, লৌকিক বোধহীন বালিকার মনে প্রথম প্রেমের লজ্জাকুণ্ঠিত অভ্যুদয়ের বর্ণনা উপলক্ষ্যে লেখক বেদনারহস্যমণ্ডিত মানবহৃদয়ের সহিত সতঃউৎসারিত আনন্দনির্ঝরস্নাত ইতরপ্রাণী ও বহিঃপ্রকৃতির কি সুন্দর, কবিত্বপূর্ণ তুলনা করিয়াছেন ! * * *

পারিবারিক জীবনে সাধারণতঃ যে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে স্নেহধারা প্রবাহিত হয়, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সেখানে একটা ক্ষুদ্র বিপর্য্যয়, এক বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাতের সৃজন হইয়া থাকে। স্নেহ প্রেম প্রভৃতি মানুষের হৃদয় বৃত্তি, পারিবারিক ব্যবস্থা ও সমাজ নির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে চাহে বলিয়াই রোমান্সের উদ্ভব হইয়া থাকে। * * * 'কাবুলীওয়ালা'তে এই স্নেহ বন্ধন অনেক দুরতিক্রম্য বাধা লঙ্ঘন করিয়া এক রুক্ষদর্শন, পরুষমূর্ত্তি বিদেশীর সহিত বাঙালী ঘরের একটি ছোট মেয়ের একটি ক্ষণস্থায়ী প্রীতির সম্পর্ক রচনা করিয়াছে। * * *

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা ও কবিসুলভ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ঔপন্যাসিকের

সহায়তাবিধানে অগ্রসর হইয়াছে। তিনি স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব-শক্তির বলে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির কার্য্যকলাপ বা চিন্তাধারার সহিত বিশাল বহিঃ প্রকৃতির একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অতি সাধারণ তুচ্ছ ঘটনাবলীরও আশ্চর্য্যরূপ রূপান্তর সাধন করিয়াছেন। * * *

ভাষার ধ্বনি, ব্যঞ্জনা, সাঙ্কেতিকতায় এক De Quinceyর Dream Visions ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের অনুরূপ কিছু ইংরেজী সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীত প্রবাহে বোধ হয় De Quincey রবীন্দ্রনাথ হইতে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় ইংরেজ লেখকের যে প্রধান দোষ বস্তুহীনতা ও ভাবের কুহেলিকাময় অস্পষ্টতা—তাহার লেশমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় না। আবার এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার বিবৃতি হইয়াছে ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে, ট্রেন প্রতীক্ষার অবসরে।

আধুনিক গল্পগুলির আদর্শ ও রচনা প্রণালী পূর্ব্বতন গল্প হইতে অনেকটা বিভিন্ন। * * পূর্ব্ব গল্পগুলি আমাদের সনাতন জীবন যাত্রার গভীর মর্ম্মস্থল হইতে উদ্ভূত। এক একটি গল্প যেন তাহার হৃদ-পদ্মের এক একটি বিকশিত পাপড়ি। ইহাদের মধ্যে যে সমস্যাগুলি আলোচিত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ের গভীর রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা কেবলমাত্র জীবনের উপরিভাগে একটা বিক্ষোভ ও আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই। নূতন গল্পগুলির মধ্যে এই বাহিরের চাঞ্চল্য ও আন্দোলনকে অবলম্বন করিয়া বৈচিত্র্য আহরণের চেষ্টা হইয়াছে। হয়ত লেখক অনুভব করিয়াছিলেন যে পুরাতন রসধারা শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, সেদিকে আর নূতন কিছু করিবার সম্ভাবনা অল্প। * * এই গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ অতি আধুনিক উপন্যাসের পথপ্রদর্শক ও পূর্ব্বসূচনকারী।

ইহাদের মধ্যে 'নষ্টনীড়' গল্পটী সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যদিও রচনাকাল হিসাবে ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী গল্পগুলির সমসাময়িক, কিন্তু বিষয়ের দিক হইতে ইহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গল্পগুলির সমশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। * * * সুতরাং সাহিত্যে এই নূতন আবির্ভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অভাব হয় নাই। * * * কলাসৌন্দর্য্য ও বিশ্লেষণকুশলতা থাকিলে প্রেমের এই সমস্ত সমাজ-বিগর্হিত বিকাশ ও সাহিত্যের বিষয় হইতে পারে—বিপদ সেইখানে, যেখানে ইহাকে কেবলমাত্র কুৎসিৎ আলোচনার সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করা হয়, যেখানে কল্পনার স্বচ্ছসলিলে ইহার কালিমাকে ধৌত করিবার কোন প্রয়াস দেখা যায় না। * * *

'পাত্র ও পাত্রী' গল্পটাও স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষের নির্ম্মম ব্যবহারের প্রতিবাদ। কিন্তু এই প্রতিবাদের ঝাঁজের মধ্যে সত্যের তিক্ততা অধিক পরিমাণে আছে। গল্পের যে অংশ আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়, তাহা পুরুষের স্ত্রীজাতির উপর কাপুরুষোচিত আস্ফালন ; সমাজচ্যুতার বিবাহে বিঘ্ন নহে। * * *

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা তাহার প্রসার ও বৈচিত্র্যে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারি না। আমাদের পুরাতন ব্যবস্থা ও অতীত জীবনযাত্রার সমস্ত রসধারা অগস্ত্যের মত তিনি এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া নিঃশেষ করিয়াছেন। * * * রবীন্দ্রনাথ বাংলার সাহিত্যভাণ্ডারে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার বীজ বপন করিয়াছেন তিনি নিজে, কিন্তু তিনি যে বীজ বপন করিয়া গেলেন, তাহার পরিণত ফল কোন্ ভাগ্যবান আহরণ করিবে তাহা এখন আমাদের কল্পনারও অতীত। তাঁহার আগমন

প্রতীক্ষায় সমগ্র দেশ অনিমেষ নয়নে ভবিষ্যৎ কালের দিকে চাহিয়া থাকিবে।”

সাহিত্যে শ্লীলতারক্ষা বিশ্লেষণকালে কবিরঞ্জন যতীন্দ্র মোহন সিংহ লিখিয়াছেন—“আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বিধবার প্রেমে পড়ার চিত্র কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন কবিগণ ব্রহ্মচারিণী বিধবাকে চিরদিন সম্মানের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। * * স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই কুন্দনন্দিনীর সৃষ্টি করিয়া ইহার পথ দেখাইয়াছেন। কুন্দনন্দিনীর পরে রোহিণীও তাঁহার সৃষ্টি। * * কিন্তু কুন্দনন্দিনী বা রোহিণীকে কবি নায়িকার আসন দেন নাই, বরং তাহাদের শোচনীয় পরিণাম দেখাইয়া তিনি সমাজের উপকার সাধন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

* * বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আমরা পাইয়াছি কবিবর রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট বিধবা-চরিত্র—‘চোখের বালি’র বিনোদিনী। * * * প্রেমের খেলা জিনিষটা কখনও হিন্দুর গৃহে প্রচলিত ছিল না, ঘরের বাহিরে অবশ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে হিন্দুগৃহে তাহা প্রবেশ করাইয়াছেন। * * গ্রন্থকার মহেন্দ্র, বেহারী, বিনোদিনী ও আশাকে লইয়া অনেক খেলা খেলিয়াছেন। * *

বিনোদিনী বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিল—‘জীবনসর্ব্বস্ব, জানি, তুমি আমার চিরকালের নও,—কিন্তু আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে ভালবাস! তারপর আমি আমাদের সেই বনজঙ্গলে চলিয়া যাইব, কাহারও কাছে কিছু চাহিব না। মরণ পর্য্যন্ত রাখিবার আমায় কিছু একটা দেও।’ বলিয়া বিনোদিনী চোখ বুজিয়া তাহার ওষ্ঠাধর বিহারীর কাছে অগ্রসর করিয়া দিল।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনায় নবেলী প্রেম চরম মাত্রায় (climax) উঠিয়াছে। ইহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত আয়েষার 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' শিশুর আলিঙ্গন। * * *

গ্রন্থকার একজন হিন্দুবিধবাকে পরপুরুষের প্রেমে তপস্বিনী সাজাইয়া ও তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া সমাজের অনিষ্ট করিয়াছেন। আর এই গ্রন্থের প্রায় পনের আনা ভাগে পাপের চিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। এইরূপ পাপচিত্রের সহিত পাঠক পাঠিকার মনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে, পাপের প্রতি ঘৃণাও ক্রমে কমিয়া আসে। এই হিসাবে এই গ্রন্থ সমাজ-শরীরের পক্ষে বিষস্বরূপ। * * *

এবার আমরা বিবাহিতা স্ত্রীর পরকীয় প্রেমাসক্তির বিষয়ে আলোচনা করিব। * * কবিবর স্যার রবীন্দ্রনাথই এইরূপ চিত্রের পথপ্রদর্শক। * * 'নষ্ট নীড়ে' যাহার অঙ্কুর দেখা গিয়াছিল, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তাহার পূর্ণ বিকাশ। আবার রবীন্দ্রনাথের 'নষ্ট-নীড়' ও 'চোখের বালি'র একটা মিলিত সংস্করণ বাহির হইয়াছে—— তাহার নাম শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'চরিত্রহীন'। * *

ভারতচন্দ্র অবিবাহিত প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের জন্য মাটীর তলে সুড়ঙ্গ কাটার কথা লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে বিবাহিত স্ত্রীর মনের মধ্যে পরপুরুষের ধ্যানের জন্য সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের পথ দেখাইয়াছেন। * * তাঁহার অনুকরণকারীরা ইহার পরে অনেক দেবর-বৌঠা'নের সঙ্গে প্রেম ঘটাইয়াছেন ও ঘটাইতেছেন। এই সকল, সাহিত্য-সমাজ শরীরে বিষের ন্যায় কার্য্য করিতেছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। * *

কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস এই 'নষ্ট-নীড়ে'র রাজকীয় সংস্করণ (royal edition)। * *

এই গ্রন্থে নিখিল, বিমলা ও সন্দীপ ইহার কেহই মানুষ হয় নাই ; * * এতদূর পাশবতা, এতদূর নির্লজ্জতা, এতদূর কাপুরুষতা প্রকৃত মানুষে কখনও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না,—সন্দীপ প্রকৃতই একটা দানব বা রাক্ষস। * * সন্দীপের ন্যায় অতিমানুষ (super-human) দানব লইয়া পুরাণ রচনা চলে, কিন্তু উপন্যাস রচনা ব্যর্থ হয়। * * এই পূতিগন্ধময় কাব্য রচনা করিয়া সমাজের নৈতিক বায়ু (moral atmosphere) কলুষিত করিবার তাঁহার কোন অধিকার আছে কিনা ইহাই সুধীগণের বিবেচ্য।"

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য "নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালিতে' যে বাস্তবের সহিত আমরা পরিচিত হই, তাহাতে শুধুই রক্তমাংস—ইন্দ্রিয়লালসার নগ্ন ও কুৎসিত মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তব এখানে রক্তমাংসের, ভোগ-লালসার ; সুতরাং ইহা অনিত্য, মিথ্যা ও সমাজ-দ্রোহী। রসের হিসাবেও বলা যায়, কোন রসই ইহাতে বিকাশ লাভ করে নাই। রসাভাব হইয়াছে,—সুতরাং শিল্প-কলার দিক হইতেও ইহা অসুন্দর।

পক্ষান্তরে 'গোরা'। চরিত্র-অঙ্কনের দিক হইতে বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও, গোরার বাস্তব অলোকসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন কবির মানস আদর্শ বাস্তব। রস বৈচিত্র্য বেশী নাই ; তবুও ব্যক্তি ও সমাজ, ব্যক্তিগত নীতি ও সমাজধর্ম্ম প্রভৃতির সম্বন্ধ-বিকাশে কবির প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা নিত্য ও সত্যানুসন্ধান-প্রয়াসে সফলকাম হইয়াছে।

আমাদের সাহিত্যে 'গোরার' কল্পিত আদর্শ বাস্তব অপেক্ষা

'চোখের বালির' হেয়, জঘন্য ও অসত্য বাস্তব অধিকপরিমাণে দেখা দিতেছে। জোলা, ডডে, ফ্লবেয়ার একটা ঝুটা বাস্তবের ধুয়া লইয়া আমাদের সাহিত্য-আসরে প্রবেশলাভ করিয়াছে। আদর্শ ছাড়িয়া সাহিত্য সাধারণ বাস্তবকেই আশ্রয় করিতেছে। হেয় ও জঘন্য বাস্তব সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিতেছে প্রকটিত হইতেছে কেবল তাহাদের নগ্ন ও বীভৎসরূপ—আদর্শের মহিমা ও সৌন্দর্য্য তাহাতে নাই। * *

রবীন্দ্রবাবুর 'ঘরে বাইরে' পুস্তকে কোন কল্পিত আদর্শ বা কোন নিত্য বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শুধু পাওয়া গিয়াছে, উদ্দাম কাম-প্রবৃত্তির পোষাকী রূপ। চরিত্র-বিশেষের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যে বিশেষ আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা জঘন্যবাস্তব। কল্পনা বা আদর্শ অথবা নিত্যবস্তু ছাড়িয়া উপন্যাসখানি জঘন্য বাস্তবকে আশ্রয় করিয়া আপনার মর্য্যাদা হারাইয়াছে। শুধু আদর্শের দিক দিয়া নহে, সাধারণ ও সার্ব্বজনীন নৈতিক জীবনের মাপকাটিতেও রবিবাবুর বাস্তব একেবারেই হীন, অসঙ্গত।"

রবীন্দ্রনাথের লিপিকুশলতা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত রাধাকমল বাবু লিখিয়াছেন "রবীন্দ্রনাথের রচনায় একটা নূতন ছাঁদ, নূতন ভঙ্গী আনিয়াছেন। তাহার শক্তি আছে, স্ফূর্ত্তি আছে। কিন্তু অনেক স্থলে তাহার নিয়ম নাই, সংযম নাই। একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সে সহজ-বুদ্ধির অগম্য হইয়া পড়ে। এই হালের 'সবুজ পত্র' হইতে রবীন্দ্রনাথের লিখনভঙ্গীর অনাবশ্যক আড়ম্বরের একটা উদাহরণ দিতেছি,—

'একজন লোক ব্যবসা করচে। সে লোক করচে কি ?—তার মূলধনকে, অর্থাৎ পাওয়া-সম্পদকে, সে মুনফা, অর্থাৎ না-পাওয়া সম্পদের দিকে প্রেরণ করুচে। পাওয়া-সম্পদটা সীমাবদ্ধ ও ব্যক্ত, না-

পাওয়া সম্পদটা অসীম ও অব্যক্ত। পাওয়া-সম্পদ সমস্ত বিপদ স্বীকার করে' না-পাওয়া সম্পদের অভিসারে চলেছে। না পাওয়া সম্পদ অদৃশ্য ও অলব্ধ বটে, কিন্তু তার বাঁশি বাজচে,—সেই বাঁসি ভূমার বাঁশি। যে বণিক সেই বাঁশি শোনে, সে আপন ব্যাঙ্কে জমানো কোম্পানি-কাগজের কূল ত্যাগ করে', সাগর গিরি ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে কি দেখছি?—না, পাওয়া-সম্পদের সঙ্গে না-পাওয়া সম্পদের একটি লাভের যোগ আছে। এই যোগে উভয়ত আনন্দ। কেন না, এ যোগে পাওয়া না-পাওয়াকে পাচ্চে এবং না-পাওয়া পাওয়ার মধ্যে ক্রমাগত আপনাকেই পাচ্চে।'

এই রকম ঘোর-প্যাঁচে একটা দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করা সহজ ভাষার উপর অযথা অত্যাচার! যাহার যাহা ক্ষমতা নাই তাহাকে তাহা করিতে দিলে সে যে শুধু নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া হাস্যাস্পদ হইবে তাহা নয়, উপরন্তু যে ভাবটীকে সে প্রকাশ করিতে যাইতেছে তাহাকেও হাস্যাস্পদ করিবে; এ যেন কোন রাজা মহা-রাজাকে দরবারী পোষাক পরাইয়া ধূলা-কাদা-মাটী মাখা কুলি মজুরের মধ্যে টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে নাচিতে বলা। 'না-পাওয়া সম্পদ অদৃশ্য ও অলব্ধ বটে, কিন্তু তার বাঁশি বাজবে—সেই বাঁশি ভূমার বাঁশি।' প্রথমতঃ:—'না-পাওয়া'র অর্থই হইতেছে অলব্ধ, সুতরাং এটা পুনরুক্তি! দ্বিতীয়তঃ—ইহার মধ্যে তিনটী কথা, 'অদৃশ্য' 'অলব্ধ' ও 'ভূমা'র আভিজাত্য গৌরব পরিস্ফুট, অথচ ইহাদের বাদ দিলে ভাবটী প্রকাশিত হইবে না! তাহা ছাড়া ভূমার যে অর্থ তাহার উপর এই চল্‌তি ভাষার কোন দাবী নাই। * * *

যদি চল্‌তি ভাষা ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে চল্‌তি concrete-

ভাব প্রকাশক শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে ভাবগুলি যেখানে Abstract সেখানে ভাষা Abstract ইঙ্গিতবহুল, 'পোষাকী' হইতেই হইবে, সেখানে লেখ্য ভাষা এবং সংস্কৃত শব্দ আশ্রয় না করিলে চলিবে না। * * *

রবিবাবুর লেখা হইতে উদ্ধৃত অংশটুকু পাড়লেই মনে হয় একটা উচ্চ ভাবকে জোর করিয়া কাঙালের সাজে সাজান হইয়াছে।

আমি চল্‌তি ভাষা সম্বন্ধে কোন অগৌরবের কথা বলিতেছি না। * * চল্‌তি ও পোষাকী ভাষাকে এক জোয়ালে জুড়িয়া দিলে ভাব-বোঝাই গাড়ী একেবারে অচল হইয়া পড়িবে।

রবীন্দ্রবাবু হালের লিখন-ভঙ্গীতে Abstract ভাব জোর করিয়া চল্‌তি ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং তাহা কৃত্রিমতা-দোষ-দুষ্ট হইয়াছে তো বটেই, ভাবগুলি অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। সবুজপত্রে রবীন্দ্রী ভাষা কৃত্রিম, আর 'বীরবলী' সেই কৃত্রিম রবীন্দ্রীর কৃত্রিম সংস্করণ। * * *

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা-ভঙ্গী ও বঙ্কিমের রচনা-ভঙ্গীর মধ্যে অনেক তফাৎ। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গী বিভিন্ন। বিবেকানন্দের রচনা-ভঙ্গীর একটা বিশিষ্টতা আছে। আধুনিক যুগেই দুই একজন প্রতিভাবান লেখকের লিখন-ভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের লিখন-ভঙ্গীকে পরাজিত করিবে না কে বলিল? বিদ্যাসাগরী গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রী চলিল না। রবীন্দ্রী চলিবে কে বলিল? * * *

রবীন্দ্র বাবুর 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে আমার মনে হয় শুধু Conventional morality নহে, সার্ব্বজনীন, সর্ব্ব কালের ও সর্ব্বসমাজের নীতিকে অপমানিত করা হইয়াছে।

* * 'গোরা' ও 'নৌকাডুবি' অপেক্ষা 'ঘরে বাহিরের' ঢের বেশী ঝাঁঝ। * * Passion টুকু তিনি ঝাঁঝালো করিয়া ফুটাইয়াছেন কিন্তু passionsএর ঘাত প্রতিঘাত, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি সেরূপ তিনি কোথাও ফুটাইতে পারেন নাই। * * *

সন্দীপ উত্তেজনার নেশায় স্বদেশী আন্দোলন জাগাইয়াছিল তাই সে বিফল হইয়াছে,—জাতীয় জীবন-মরণ-সমস্যার আলোচনার এ অংশ বটে, কিন্তু নিতান্ত সামান্য অংশ। দেশের আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শ সমগ্র জাতীয় জীবনের অতি অল্পটুকু ইহাতে প্রকাশিত। এবং যেটুকু প্রকাশিত তাহাও নিতান্ত ঢালের একপিট one side of the shield হইয়াছে। 'গোরা'য় পরেশ বাবুর উপদেশ ও সন্দীপের প্রতি ঘরে-বাইরের নিষেধ বাক্য,—দেশধর্ম্ম বিশ্বমানবের বৃহত্তর যোগ হইতে ছিন্ন হইলে সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতার নামান্তর হয়, ইহা আমরা মানি। কিন্তু ইহাও মানিতে হইবে, বিশ্বধর্ম্ম দেশের অন্তরের যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে অলীক ও বস্তুতন্ত্রহীন। * * *

কল্পনার রংমশালে তিনি যে যৌন সম্বন্ধ ফুটাইয়াছেন, তাহা আমাদের এবং অন্যের দেশ সত্য বলিয়া কিছুতেই বরণ করিতে পারিবে না। * *

'গোরায়' রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের আদর্শ আংশিক ভাবে আলোচিত। কিন্তু 'ঘরে বাহিরে'তে ইহা সবিশেষ পাওয়া যায়। এইবার ঐ বই খানির মূলতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখিয়াছেন যে 'ঘরে বাহিরে' তিনি শুধু আপন মনে জালই বুনিয়াছেন, অর্থাৎ এটাতে কোন তত্ত্ব তিনি জাহির করিতে চেষ্টা করেন নাই। ইহা কেবল আর্টেরই সৃষ্টি। কিন্তু তাঁহার পাঠকবর্গের সকলেই ইহার ভিতর বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যার একটা মীমাংসা খুঁজিয়া বাহির

করিতেছেন। এই উদ্দেশ্য না সম্মুখে রাখিলে বইটির পূর্ব্বাপর কোন সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি লক্ষিত হয় না।

এখন বইটির উদ্দেশ্য বা তত্ত্বের ব্যাখ্যা নানাভাবে করিতেছেন। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একস্থলে বলিয়াছেন, সন্দীপ হইতেছে নবীন ইউরোপ, নিখিলেশ হইতেছে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও বিমলা হইতেছে বর্ত্তমান ভারত। বিমলা 'এই দোটানার ভিতর পড়েই নাস্তানাবদ হচ্ছে—মুক্তির পথ যে কোন দিকে তাহা খুঁজে পাচ্ছে না'। এই symbolism রূপটুকু আগাগোড়া টানিলে বইয়ের ভিতর আমরা কি নবীন ইউরোপকে সন্দাপের বেশে কেবল Nietzcheর জোর যার মুল্লুক তার থিয়রি সপ্রমাণ করিতে দেখিতেছি? Patriotismটা ইউরোপে কি শুধুই প্রচণ্ড ক্ষুধা ও কামোন্মত্ততার রূপে দেখা গিয়াছে? নিখিলেশের সহিষ্ণুতা যাহা এক প্রকার দুর্ব্বলতারই নামান্তর তাহা কি সনাতন ভারতবর্ষের আসল প্রকৃতির পরিচয়! আর বিমলা কি পাশ্চাত্য-সভ্যতার রংমশালে মুগ্ধ ভারতের অন্তরাত্মার প্রতিমূর্ত্তি! বাস্তবিক প্রমথবাবুর রূপক কিছুতেই গল্পের আগাগোড়ার সহিত থাপ খায় না।

'ঘরে বাহিরে'কে যদি বর্ত্তমান নারীশিক্ষা-সমস্যার মীমাংসা ধরা যায় তাহা হইলেও ইহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। প্রথমতঃ আমাদের দেশের বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা যে রমণীর হৃদয়ে লালসাবৃত্তিকে প্রবলভাবে জাগাইয়া তুলিবে এবং স্ত্রীলোককে ঘর হইতে টানিয়া আনিলে সে মাতা না হইয়া রমণী বা কামিনী হইবে, এই দিকটাই রবিবাবুর উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য পাশ্চাত্য স্ত্রীশিক্ষার আসল সমস্যা হইতেছে এইটা, যে স্ত্রীলোকের মাতৃত্বের ভিতর দিয়া জন্মের ও শিক্ষার সার্থকতা, না শ্রমজীবনে পুরুষের সহিত সহকারিতার দ্বারা! * * *

তাহার পর যদি বইখানিকে বর্ত্তমান দেশসেবাপদ্ধতির আলোচনা বলিয়া ধরি তাহা হইলেও আমরা যে মীমাংসা পাই তাহাতে কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিনা। প্রথমতঃ সন্দীপের বাজার-পোড়ানো ও Picketting স্বদেশ ভক্তিকে যদি নবীন ভারতের ভাব বলি তাহা হইলে নবীন ভারতকে স্বদেশিকতাকে অপমানিত করা হইবে। নবীন ভারতের স্বদেশ ভক্তিকে কেরোসিন তেলের আগুনের মত ভাবিলে অত্যন্ত অন্যায় ও নিতান্ত অবিচার করা হয়। নূতন ভারতের স্বদেশ-প্রেম এখন অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক এবং বিচিত্র পথে বিচিত্র কর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বিচিত্র ত্যাগের মহিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই নূতন কর্ম্মজীবনের নূতন কর্ত্তব্য ও সমস্যার দিকে তিনি দৃক্‌পাতও করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ—সনাতন ভারতবর্ষের সর্ব্বসহনশীলতা কি নিখিলেশের জড়ভবতত্ত্বর দ্বারা সঠিক প্রকাশিত? নিখিলেশের Passivityকে কখনই আমাদের কর্ম্মযোগীর দেশে বড় আদর্শ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। * *

নিখিলেশের চরিত্র মনস্তত্ত্ব হিসাবে অসত্য ও অসম্ভব। সন্দীপ, বিমলা ও নিখিলেশ তিনটিই বস্তুতন্ত্রহীন কেবল তত্ত্বমাত্র বলিয়া ইঁহাদের সম্বন্ধটাও সেইরূপ বস্তুতন্ত্রহীন। কোন সত্যকার স্বামী নিখিলেশের অবস্থায় পড়িলে এরূপ করিতে পারে কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ—ইহা কেবল বস্তুতন্ত্রহীন আর্টের জালবুনানি।

আর বিমলাকে বাহিরের একটা নৈতিক অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে আনিয়া তাহাকে পুনরায় ঘরে টানিয়া লওয়ার শুধু একটা মনস্তত্ত্ব-ঘটিত কারণ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। উপন্যাসে তাহার ফিরে আসাটাই যদি প্রতিপাদ্য বিষয় হয় তাহা হইলে তাহাকে শুধু মানসিক উদ্বেগের

মধ্যে না ফেলিয়া সামাজিক ও অন্যান্য নির্য্যাতন ও দুঃখভোগের মধ্য দিয়া নির্ম্মল ও শুদ্ধ করা উচিত ছিল। বিমলার বাহিরে যাওয়াটা কেবলমাত্র মনস্তত্ত্ব ঘটিত ব্যাপার নহে।

ইহা সকল দেশে ও সকল সমাজের মূলে কিরূপ আঘাত করে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, অথচ ঔপন্যাসিক তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত বস্তু তন্ত্রহীন আর্ট থিয়রির খাতির রাখিতে গিয়া তাহার গুরুত্ব বিবেচনা করেন নাই। * * *

বিমলার প্রায়শ্চিত্তের তীব্রতা রবিবাবু কিছুই ফুটান নাই—ইহাতে শুধু তত্ত্বের কেন শিল্পেরও খর্ব্বতাই প্রমাণিত হইয়াছে। * * * সন্দীপের মধ্যে 'অনেক লোভ, অনেক স্থূল, অনেক ফাঁকি আছে, বুঝিয়াও সে যে পুনরায় আর এক বুদ্ধিতে বলিতেছে—'এই ত মধুর ; এই ভাবটা (বিমলার) শেষ পর্য্যন্ত রহিয়া গেল। শেষে সে সন্দীপকে রুদ্রদেবতার একটা প্রকাশ বুঝিয়া তাহার প্রতি একটা তীব্র মধুর মোহে আকৃষ্ট হইল—এই আমরা বইয়ের শেষে পাই। ঘরে-বাহিরের মূল স্ত্রীচরিত্র সত্যই প্রলয় রূপিণী ও সমাজের পক্ষে হৃৎপিণ্ডমালিনী করা হইয়াছে। তাহাতে প্রলয়ঙ্করী প্রিয়া অর্থাৎ মোহিনীর ভাবটুকু বেশী ফুটিয়াছে, তাহাতে গৃহিণী ও জননীর ভাব তেমন ফুটে নাই।"

রবীন্দ্রনাথের রচিত গদ্য গ্রন্থ সমূহের মধ্যে বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, লোক সাহিত্য, হাস্যকৌতুক, গোড়ায় গলদ ও বৈকুণ্ঠের খাতা, শান্তি নিকেতন ভক্তবাণী, বিদ্যাসাগরচরিত, চারিত্রপূজা, ছিন্নপত্র, জীবনস্মৃতি, পরিচয়, গোরা, নৌকাডুবি, চোখের বালি, রাজর্ষি, বৌঠাকুরাণীর হাট, গল্পগুচ্ছ, ঘরে বাইরে প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভূমণ্ডলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া পরিগণিত হইতে না পারিলে সুদুর্লভ নোবেল পারিতোষিক লাভ করিতে পারা যায় না; সেই নোবেল পারিতোষিক পাইয়াছেন এই রবীন্দ্রনাথ। সুতরাং ইঁহার সম্বন্ধে আর অধিক বলাই নিষ্প্রয়োজন।

বিষ্ণুপুরাণ, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ভাতের জন্মকথা, সওগাত, প্রভৃতি প্রণেতা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ গল্পলেখক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও বিখ্যাত ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে এই সম্প্রদায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে।

দ্বিজেন্দ্র সম্প্রদায়ের নাটকীয় ভাষা:

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—(১৮৬৩-১৯১৩)—

বঙ্গের ব্যঙ্গ ও হাস্য-কৌতুকের অদ্বিতীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—যিনি বাঙ্গালা নাটকীয় ভাষায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন—এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকের ভাষা অতি সুন্দর, অতি সুললিত সন্দেহ নাই; কিন্তু দ্বিজেন্দ্র এক নূতন বেগময়ী প্রাণস্পর্শিনী ভাষা নাটকে ব্যবহার করিয়াছেন, যে জ্বালাময়ী ভাষা তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ ব্যবহার করেন নাই; ইংরেজি সুরে ও ইংরেজি তালে দ্বিজেন্দ্র যে সমস্ত বাঙ্গালা গীত রচনা করিয়াগিয়াছেন সে সমস্ত তাঁহার নিজস্ব। বস্তুতঃ দ্বিজেন্দ্র একজন অতুল প্রতিভাবান লেখক ছিলেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিজেন্দ্র রবীন্দ্রযুগের এক উজ্জ্বল রত্ন। ইঁহার হাসির গান একখানি চিরনূতন গ্রন্থ।

Dr. Johnsonএর balanced style যেমন অপরে যোগ্যতার সহিত অনুকরণ করিতে সমর্থ হ'ন নাই; দ্বিজেন্দ্রের সেই 'একটা

প্রচণ্ড উল্কার মত' বেগময় পদ বিন্যাস অপরে সেরূপ কৃতিত্বের সহিত অনুকরণ করিতে সমর্থ হ'ন নাই।

শশাঙ্কমোহন সেন বলিয়াছেন: "দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীতে এমন একটা তীক্ষ্ণতা, সুস্পষ্ট ছবি গ্রহণের শক্তি, ঋজুতা, বাস্তব-বুদ্ধি এবং প্রমোদ আনন্দের পরিচয় আছে, যাহা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কবিগণের মধ্যে দুর্লভ! গদ্যের ক্ষেত্রে, একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই উহার প্রাক্‌ভাস্ করিতেছি। এ সমস্ত গুণও সাহিত্য-লোকে পরম মহার্ঘ! * * * বলিতে কি, দ্বিজেন্দ্রলাল নানাদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী। * * *

দ্বিজেন্দ্রলাল গদ্যের ক্ষেত্রে কাব্যশিল্পের একটা প্রধান শক্তির অধিকারী। * * দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে এবং নাট্য সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন! তাঁহার অনতিগভীর সরস ঋজুতায় বঙ্গসাহিত্যের পাঠক সাধারণ সবিশেষ উপকৃত হইতেছে। * * *

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্চ শ্রেণীর কবিত্বে এবং স্বাতন্ত্র্যেই স্থায়িত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। * * *

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হাসির গানে বঙ্গের সঙ্গীত-সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। * * দ্বিজেন্দ্রের অনেকগুলি চরিত্র লৌকিকতার ক্ষেত্রেই যে সজীবতা, তীক্ষ্ণতা এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়া সহানুভূতি অর্জ্জন করিতেছে, তাহাও-বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

* * * দ্বিজেন্দ্রলাল * বঙ্গীয় নাটককে অনেক দিকে অগ্রসর করিয়া গিয়াছেন * * বাঙ্গালার লোকশিক্ষকগণের মধ্যেও দ্বিজেন্দ্রলাল বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন। * * *

এ দেশে দশবৎসর পূর্ব্বপর্য্যন্ত * * নাটক নিম্ন হইতে নিম্নতর

নিয়েই চলিয়াছিল ; ক্ষীরোদ প্রসাদ, বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল উহাকে রক্ষা করিয়াছেন মাত্র। * * *

দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীর আধুনিক নাট্যমঞ্চের নেতা ; সুতরাং জাতীয় শিক্ষা-সাধনার প্রধান নেতা, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না ; বাঙ্গালীর হাস্য কৌতুকের সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ আসন ; সঙ্গীত সাহিত্যের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের পদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকারগণের সমস্থানীয় ; সাহিত্য-সাধনার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান এ দেশের কোন সাহিত্য-সেবীর পশ্চাতে নহে। *

দ্বিজেন্দ্র সমগ্র বঙ্গদেশের অধিবাসী। বাঙ্গালার এমন গ্রাম নাই যেখানে দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশ্যে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সাধুবাদ পড়ে নাই ; যেখানে তাঁহার 'আমার দেশ' বা 'আমার জন্মভূমি' বাঙ্গালীর হৃদয় তন্ত্রী নবস্পন্দনে ঝঙ্কারিত করে নাই ; তাঁহার 'নন্দলাল' বাঙ্গালীর মনকে পরমশিক্ষাপ্রদ সরস কৌতুকদণ্ডে মথিত করে নাই ! এমন ভদ্রগ্রাম নাই, যেখানে তাঁহার রাজস্থানের বীরকাহিনীগুলি অভিনীত হইয়া, গ্রামীনগণের অন্তর্লোকে এক অভিনব স্থান স্পর্শ করতঃ তাহা-দিগকে অভিনব 'স্বদেশ' এবং 'মনুষ্যত্ব' আদর্শে উৎসাহিত করে নাই ! * * তাঁহার নাম এ দেশের প্রাচীন কিংবা আধুনিক শিক্ষাগুরুগণের কাহারও নিম্নে নহে।

বাল্যবয়সেই দ্বিজেন্দ্রলালের অপরূপ কৌতুক প্রবণতা ও বাক্‌পটুতা স্ফূর্ত্তিলাভ করে। * * স্বাভাবিক শক্তির প্রেরণাবশেই তিনি বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে অপূর্ব্ব কৌতুক কবিতা ও কৌতুক সঙ্গীতের জনক হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের সহজাত কৌতুকচ্ছন্দকেই নানাপ্রকার বাক্যচ্ছন্দে প্রমূর্ত্ত করিয়া ১৮৯০ সনে 'আষাঢ়ে', ১৮৯২

সনে আর্য্যগাথার ২য় ভাগ, ১৮৯৬ সনে কল্কি অবতার, ও ১৯০০ সনে 'বিরহ' প্রকাশিত হইয়াছে। এ সমস্ত রচনায় বঙ্গভাষা অজ্ঞাতপূর্ব্ব দেশে শক্তি প্রসার লাভ পূর্ব্বক অপরূপ রসতারল্যে বিলসিত হইয়াছে। * * সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ এবং বিদ্বেষহীন হাস্যরস-সাধনার দৃষ্টান্ত বঙ্গ-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রের মধ্যেই প্রথম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অত্যুক্তি হয় না। * * হুতোম প্রভৃতির সমসূত্রে রবীন্দ্রনাথ মানসীর মধ্যে কয়েকটী ব্যঙ্গ কবিতার নমুনা দেখাইয়াছেন। কিন্তু সঙ্গীতে হাস্য! উহা সহজ কৌতুকপ্রবণ হৃদয় লইয়া স্বয়ং গায়ক না হইলে অসম্ভব ছিল। সহজাত শক্তির ইঙ্গিতবশেই দ্বিজেন্দ্র উক্ত পথে পরিচালিত হইয়াছিলেন। * *

পাষাণীর কবিত্ব-সম্পদ্ সর্ব্বথা প্রথম শ্রেণীর না হইলেও, উহা একটা পরিপূর্ণহৃদয় এবং পরিণত সাহিত্য-বুদ্ধির দৃষ্টান্ত লইয়াই উপস্থিত আছে। * *

কবি মৃত্যুর দুটি ঘণ্টা পূর্ব্বেই তাঁহার 'সিংহল-বিজয়ে'র প্রেসকাপি পরিদর্শন করিতেছিলেন বলিয়া প্রকাশ পায়। সুতরাং নিজের সারস্বত সাধনার সাজে-পোষাকেই অক্লান্তকর্ম্মা পুরুষ আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া গিয়াছেন। * *

দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষভাবে মনুষ্যচরিত্রের কেবল মহনীয় অংশে এবং মহত্বের দিকে দৃষ্টি করিয়াই বিভোর! * *

দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রধানতঃ সঙ্গীত কবি; এখন বঙ্গসাহিত্যে গীতি-কবিতার বা সঙ্গীত-ভাব-সাধক কবিতারই যুগ। * *

স্থায়ী সাহিত্যের রীতি কিংবা আদর্শে নিষ্ঠা বিষয়ে দ্বিজেন্দ্র শীলারের সমকক্ষ না হইলেও, পরিব্যাপ্ত মহত্ত্ব এবং পরিপ্লাবী হৃদয়োচ্ছ্বাসের ঘটনায় স্বদেশের এবং জাতীয়ত্ব-সাধনার ক্ষেত্রে তিনি শীলারকেও অতি-

ক্রম করিয়াছেন ; এবং এই বিষয়ে, তাঁহার রচনা গুলির মধ্যে 'মেবার পতন' যে অতুলনীয়তা লাভ করিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ হয় না। এই কাব্যের 'মেবার পাহাড়—মেবার পাহাড়' হইতে আরম্ভ করিয়া, 'আবার তোরা মানুষ হ' বলিয়া পরিশেষের মধ্যে, এমন একটী হৃদয়োচ্ছ্বাস, এবং ঐ উচ্ছ্বাসের পাকে-পাকে এমন অপরূপ আলোক-মধুর তরঙ্গ-ভঙ্গ, এবং সমগ্র শিল্প-সমাধানের মধ্যে এমন একটা সুমার্জ্জিত দীপ্তি আছে যে, ভারতের জাতীয় ব্যাধি এবং উহার প্রতীকার নিরূপণ আছে যে, সকল দিক বিবেচনা করিলে, উহাকে তাঁহার এই যুগের সর্ব্ব-গুণ-ঘনীভূত 'শ্রেষ্ঠ প্রকাশ' বলিয়া নিঃসন্দেহে উল্লেখ করিতে পারা যায়। আমাদের জাতীয় জীবন-সাধনার চিরস্থায়ী সাহিত্য ভাণ্ডারে উহার স্থান নির্দ্দেশ করিতেও ইচ্ছা হয় !

দেশ-প্রাণতা এবং জাতীয়তা ! নীতি, ধর্ম্ম এবং সমাজের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ ! দ্বিজেন্দ্রের নাটকগুলি এই সকল আদর্শের ভাবোজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি উপস্থিত করিয়া বাঙ্গালীকে যেই শিক্ষাদান করিয়াছে, সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া এইরূপে লোকশিক্ষক হওয়াও কম সৌভাগ্যের কথা নহে। এই সকল নাটক চিরকাল বাঙ্গালীর সমুন্নত-ভাব-প্রয়াগের গুরু এবং সহযাত্রী হইয়া থাকিবে ! কবি এইরূপ পুণ্যব্রত হইয়া লেখনী-ধারণ করিয়াছিলেন যে উহাদের মধ্যে মনুষ্য হৃদয়ের কিংবা তাহার মেরুদণ্ডের অবসাদক কোনরূপ পরামর্শ বা ইঙ্গিত-ঈশারাও মুখ দেখাইতে পারে নাই ; নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় He uttered nothing base * * বর্ত্তমানের অভিনয়-রঙ্গে এবং জাতীয়তার প্রত্যক্ষ-শিক্ষা-ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী ! * * *

তাঁহার নুরজাহান, আরংজেব বা চাণক্য ! উহারা এলিজাবেথ

যুগের দুরাত্মা চরিত্র (fiend) হইতে কতদিকে সমুন্নত, অথচ উহারা মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় সত্যকে ভিত্তি করিয়াই দাঁড়াইয়াছে ! এই study সম্পূর্ণ আধুনিক। উহারা ভারতবর্ষীয়—এবং এই ক্ষেত্রে সাহিত্য জগতে অতুলনীয় ! 'নির্জ্জলা' দুরাত্মতা, কোনরূপ পুণ্যসম্পর্কহীন দুর্ব্বৃত্ত-চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থে নাই ! দ্বিজেন্দ্রলাল কৌতুক-রসিক ; * * তাঁহার হাস্যোল্লাস সর্ব্বথা হৃদয় হইতে, নিজের সদয় সহৃদয়তা হইতেই উৎসারিত। তিনি বার-বনিতাকে পর্য্যন্ত মহত্ত্বের আলোকে মণ্ডিত করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন ! * * তাঁহার নীতি—উপদেশও কুত্রাপি উপদেষ্টার অহং-কৃত উচ্চ আসন হইতে কিংবা ঘৃণা বিকৃত মুখ-রন্ধ্র হইতে বহির্গত হয় না ! তাঁহার স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যেও নিখুঁত দুরাত্মা বা 'লেডী ম্যাক্‌বেথ' জাতীয় স্ত্রী নাই ! রমণী জাতির প্রতি একটা অন্তর্নিহিত সম্মানের ভাব হইতেই যেন তাঁহার স্ত্রী চরিত্রগুলি অঙ্কিত ! কমলমণি, গিরিজায়া কিংবা শান্তি জাতীয় স্ত্রীলোকই তাঁহার লেখনীমুখে পুনঃ পুনঃ আমাদের দৃষ্টিপথে আসিতেছে ! মনুষ্য চরিত্রের অবিমিশ্র দুরাত্মভাব যেন তাঁহার দৃষ্টির পক্ষে অসহ্য। * *

এই কারণেই দ্বিজেন্দ্রের দুরাত্মাসমূহ তৃতীয় রিচার্ড বা আয়াগো, লেডী ম্যাকবেথ, গনিরীল্ বা রীগাণ হইতে পারে নাই। এই লক্ষণটুকুর মধ্যে সমগ্র লোকটার অধ্যাত্ম চরিত্রের গুপ্ত রহস্য নিহিত ! এই রঙ্গপ্রিয় এবং ভিতর-বাহির-খোলা, এই দোষে-গুণে সরল এবং সহৃদয় ব্যক্তিই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ! * *

তাঁহার কবিকৃত্য মধ্যে কোথাও উৎপথ-গামিতার পরিচয় নাই।

* * বঙ্গসাহিত্যে এই-জাতীয় আর একজন শিল্পী গিয়াছেন—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। এ সাহিত্যে বঙ্কিমগুণের উত্তরাধিকারী কেহ থাকিলে,

তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল। এ কারণেই দৃঢ় এবং বৃহৎ-তুলি-শিল্পী, স্পষ্ট শিল্পী, দ্বিজেন্দ্রলাল, বঙ্গসাহিত্যের সূক্ষ্মশিল্পী এবং রেখা-আভাস-শিল্পীগণের—'অস্পষ্টতা'-শিল্পীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন। * * *"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তৎসম্প্রদায়ের ঔপন্যাসিক ভাষা ঃ

শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—)—বলা বাহুল্য, স্বয়ং শরৎচন্দ্র এই সম্প্রদায়ের অধিনায়ক এবং ডাক্তার নরেশ চন্দ্র, বুদ্ধ বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি লেখক এই সম্প্রদায়ভুক্ত। ইঁহারাও যে প্রত্যেকেই এক একজন বিশিষ্ট প্রতিভাবান লেখক সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। তবে ইঁহাদের হাতে সাহিত্যিক পবিত্রতা উত্তরোত্তর অধোগামী হইতেছে।

(একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে শরৎ চন্দ্র একজন অদ্বিতীয় কথাশিল্পী। তিনি বাঙ্গালা উপন্যাসে কথাশিল্পের যে নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব এবং তদ্দ্বারা তিনি বাঙ্গালাসাহিত্যে স্থায়ী নাম অর্জ্জন করিয়াছেন। স্বল্প কথায়, অতি সহজ এবং বোধগম্য ভাষায় নিজ বক্তব্য বিষয় এরূপ সুচারুরূপে ব্যক্ত করিতে বা ঈদৃশ কুশলতা সহকারে পাঠকের মানসপটে চিত্রিত করিতে আর কেহ ইতিপূর্ব্বে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এ কৃতিত্ব, এ কুশলতা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব।)

শরৎচন্দ্রের এই শিল্পনিপুণতার অভিনব ধারা বিশ্লেষণ কালে শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত স্বরচিত 'শরৎ-প্রতিভা' নামক পুস্তকে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—"শরৎচন্দ্র তাঁহার নারীচরিত্রের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব, অবচেতন প্রবৃত্তির সহিত সচেতন সংস্কারের এই সংঘাতকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। সেখানে ভালবাসার আকর্ষণ

অয়স্কান্তের আকর্ষণের মত প্রবল, আবার তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তিও পর্ব্বত-নিঃসৃত প্রবাহের মত দুর্ব্বার। এই দ্বন্দ্বের কোনও মীমাংসা নাই—ইহা হইতে কোন কল্যাণ নাই। ইহাই তো সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। * * * শরৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন মানব মনের সংঘাত ও দ্বন্দ্বের ছবি। * * * আজ কালকার নারী সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাবী করিতেছে। কিন্তু * শরৎ-সাহিত্যে এই নতুন যুগের মানবীর পরিচয় নাই বলিলেই চলে। তাঁহার সাহিত্যে নারী জানে শুধু স্নেহ-মমতা। আর এই জন্যই তাঁহার রচনায় পুরুষের অপেক্ষা নারীর স্থান এত উঁচু।

* * * শরৎ সাহিত্যে মাত্র একটী পুরুষ আছে যাহার চিত্তপটে রমণী তাহার প্রাধান্য মুদ্রিত করিতে পারে নাই। সে হইতেছে শেষ প্রশ্নের রাজেন। রাজেন ঘোর বিপ্লবী—প্রলয়ঙ্কর অস্ত্র লইয়া তাহার কারবার; কাযেই কুসুমেষুর সঙ্গে তাহার সংস্রব নাই।

* * * শরৎ সাহিত্যে পাঠশালা বাগ্‌দেবীর পীঠস্থান হউক না হউক ইহা অতনুদেবতার প্রধান লীলাভূমি—এখানে রমার সঙ্গে রমেশের দেখা হইয়াছিল, পার্ব্বতী দেবদাসকে পাইয়াছিল আর রাজলক্ষ্মী বঁইচিমালা দিয়া শ্রীকান্তকে বরণ করিয়াছিল।

* * * পারিবারিক জীবনের সুখদুঃখের কথাও তিনি লিখিয়াছেন। যে সব ক্রূর, কৌশলী, ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তিরা সামাজিক ও পারিবারিক জীবন বিষে ভরিয়া দেয় তাহাদের চিত্র তিনি নিপুণভাবে আঁকিয়াছেন। বেণী ঘোষাল, রাসবিহারী, জনার্দ্দন রায়, স্বর্ণমঞ্জরী, দিগম্বরী, নয়নতারা এমনি কত নিষ্ঠুর, কপট নির্ম্মম চরিত্র তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ইহারই পাশে তিনি আর এক শ্রেণীর নরনারীর সৃষ্টি করিয়াছেন

যাহাদের স্নেহ-মমতার কল্যাণ রশ্মি সম্পাতে সংসার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দিগম্বরী নীচমনা, স্বার্থানুসন্ধিৎসা, তাহার মধ্যে স্নেহ-মমতার লেশ মাত্র নাই, কিন্তু তাহার কন্যা নারায়ণীর, হৃদয়ে অফুরন্ত স্নেহ। জনার্দ্দন রায় বিষয়ী জমিদার, শিরোমণি মশায় ততোধিক বিষয়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ইঁহাদের সঙ্গে চণ্ডীগড়ে আর একটি লোক বাস করিতেন যিনি জনার্দ্দনের মত অর্থগৌরব করিতে পারেন না আবার শিরোমণির মত বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও নহেন। তিনি একজন মুসলমান ফকির। তাহার মন বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, স্নেহ ও করুণায় ভরপুর। রাসবিহারী কপট কূট বুদ্ধির প্রতিমূর্ত্তি, দয়ালের তত বুদ্ধি নাই কিন্তু হৃদয় আছে। পল্লীসমাজের সমস্ত আবর্জ্জনার কেন্দ্র হইতেছে বেণী ঘোষাল আবার তাহার সমস্ত মাধুর্য্যের সুধাপাত্র হাতে করিয়া আছেন তাহার জননী বিশ্বেশ্বরী। শরৎচন্দ্র রমণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়াছেন, কিন্তু ইহার সঙ্গে তিনি নারীহৃদয়ের বাৎসল্য-রসেরও বহুচিত্র আঁকিয়াছেন। সেখানেও তাঁহার বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বাৎসল্যরসের সহজ সাধারণ চিত্র আঁকেন নাই, জননীর যে স্নেহ বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রমণ করিয়া উৎসারিত হইয়াছে তিনি তাহাকেই ভাষা দিয়াছেন। একটা জিনিষ প্রায়ই দেখা যায়; তাহা হইতেছে এই যে তাঁহার শ্রেষ্ঠচিত্রে মাতৃস্নেহ ক্ষরিত হইয়াছে স্বীয় গর্ভজাত সন্তানের জন্য ততটা নয় যতটা ঈষৎদূর সম্পর্কিত সন্তানস্থানীয় আত্মীয়ের জন্য। নারায়ণী তাহার পুত্র গোবিন্দকে ভালবাসিত না এমন নহে, কিন্তু তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে তাহার কাছে গোবিন্দ ও রামের মধ্যে প্রভেদ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বেণী, রমেশ ও রমার মধ্যে দলাদলির অভাব ছিলনা। কিন্তু বিশ্বেশ্বরীর হৃদয়ে তাহারা

সবাই নির্ব্বিরোধে স্থান পাইয়াছিল। কুসুম চরণের মা, কিন্তু জননী নহে। বিন্দু ছিল অমূল্যের ছোট-মা বা কাকীমা। গোকুল ভবানীর সপত্নী-পুত্র, কিন্তু বিমাতা ও সপত্নী-পুত্রের মধ্যে স্নেহবন্ধন ছিল এমনি সুদৃঢ় যে নিমাইরায়ের সুবুদ্ধি ও গোকুলের দুর্ব্বুদ্ধি মিলিয়াও তাহাকে শিথিল করিতে পারে নাই। মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর মাতৃস্নেহ বর্ষিত হইয়াছে তাহার নিষ্ঠুর বড়জায়ের হতভাগ্য ভ্রাতা কেষ্টর উপরে। * * * শরৎচন্দ্রের উপন্যাস যখন প্রথম বাহির হইতে লাগিল তখন তাহার দুর্নীতিতে ভদ্র সমাজ শিহরিয়া উঠিল। অনেকে তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েদের এইসব বই পড়া বন্ধ করিয়া দিলেন, বঙ্গসাহিত্যের স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য কত লোক কত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্রের রচনার অশ্লীলতার প্রতি এই বিতৃষ্ণা এখনও একেবারে লোপ পায় নাই।

* * * বাস্তবিক শরৎসাহিত্যে পাপ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। মানুষের অন্তরতম অন্তঃস্থলে যে আকাঙ্ক্ষা নীড় বাঁধিয়াছে তাঁহাকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা মূঢ়তা।

* * * ভ্রমর জোর করিয়া বলিয়াছিল 'যদি আমি সতী হই, যদি কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে…আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে। যদি একথা নিষ্ফল হয় তবে জানিও দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্মমিথ্যা, ভ্রমর অসতী।' শরৎ-চন্দ্রের কোন নারীর মধ্যে এই দৃপ্ত তেজ, নিজের ধর্ম্মে এই নিঃসঙ্কোচ নির্ভর নাই।"

শশাঙ্ক মোহন সেন তাঁহার বঙ্গবাণীতে লিখিয়াছেন: "গল্প-কথা আধুনিক সাহিত্যের একটা প্রবল লক্ষণ। * * অধিকাংশই বর্ত্তমান

ইয়োরোপীয় সমাজের যুবক যুবতী কর্তৃক যৌননির্ব্বাচনের সহায়তাকল্পেই লিখিত। বস্তুতঃ, যুবক—জীবন এবং অবিবাহিত জীবনকে মুখ্যভাবে উদ্দেশ্য করাই এ সমস্ত গ্রন্থের উদ্যম প্রকটিত এবং বিবাহ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই পরিসমাপ্তি। * * অনেক সময় উলঙ্গ প্রাকৃতবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক বিপুল লিপি বাহুল্যে অধ্যায়ের পর অধ্যায় ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াই, এ সকল গ্রন্থ পরিণয়ে পরিশিষ্ট হইয়া পড়ে।"

বর্ত্তমান যুগের লেখকগণের রচনায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব সমধিক হইলেও শরৎচন্দ্রের নিকট সে প্রভাব নিতান্ত হীনপ্রভ বলা যাইতে পারে। তাই অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন বলিয়াছেন। "It is not possible to trace any western influence in the form of Sarat Chandra Chatterji's novels, he had assimilated earlier writers ; he had been fed on the writings of Bankim, and Rabindra Nath ; he asserts that he read Gora at least twenty times ; this supplies a link no doubt between novelists, but Sarat Chandra had also read much that is worth reading in English literature and the result of his miscellaneous studies is partly indicated in his book Narir Mulya"—(Western Influence in Bengali Literature p 320).

পূর্ব্বোক্ত শশাঙ্কমোহন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বাণী-মন্দির নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ; "বর্ত্তমান কালের একজন প্রসিদ্ধ এবং শক্তিশালী গল্পলেখক শরৎচন্দ্রের 'বিরাজবৌ' গ্রন্থের নায়িকাটীর 'প্রকৃতি'র মধ্যেও একটা অসম্ভব পরিবর্ত্তনের 'দুর্ঘটনা' আছে * * 'বিরাজ বৌ'র

চরিত্রের গোঁয়ার্তুমীর মধ্যে ওইরূপ বিঘটনার কিছু কিছু উপক্রম সূচিত হইয়াছে, সত্য; কিন্তু সে সমস্ত পাঠককে উপযুক্ত মতে সচেতন করিবার মত প্রয়োগশালী বা 'অনুভাব'শালী নহে। 'বিরাজ বৌ'র মত চরিত্রের পক্ষে উপস্থিত অবস্থায় স্বামী পরিত্যাগ সম্ভবপর হ তে পারে; কিন্তু, 'স্বামীভাবে' পরপুরুষের আশ্রয়গ্রহণ! বিরাজের সম্পর্কে ওইরূপ একটা 'সেকায়েত', ওইরূপ একটা Libel লেখকের কলমে আসিতে পারিল! উহা একবারে বিভীষিকাময়—অপিচ বীভৎস হইয়া সমগ্র গ্রন্থের প্রাণ এবং সমাধানের উপর বজ্রাঘাতের মতই পতিত হইয়াছে! শরৎচন্দ্র সূক্ষ্মদৃষ্টিশালী শিল্পী। মানব চরিত্রে ধার তুলিতে, উহাকে 'কোণে কাণে' তীক্ষ্ণ এবং স্বাতন্ত্র্যময় বা 'রোখা' করিয়া তুলিতে এবং চারিত্রের সামঞ্জস্যে ঘটনার মধ্যেও এক একটা 'মোচড়' দিতে শরচ্চন্দ্র সিদ্ধহস্ত। এ ক্ষেত্রে তিনি ইংলণ্ডের হার্ডীর মতই 'মোচড় দেওয়া,' 'রোখা' এবং ধারাল চরিত্র সাহায্যে কারুণ্যরস সমাধানে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু, চরিত্রের 'বিঘটনা' কতদূর পর্য্যন্ত আমাদের রসবুদ্ধির সমক্ষে ভয়ানক কিংবা কারুণ্য-জনক হয়? কোথায় উহা একেবারে বীভৎস এবং জুগুপ্সার যোগ্য হইয়া উঠে? প্রয়োগ-বিজ্ঞানের সেইদিকে তাঁহার দৃষ্টি যেন যথোচিত প্রখর নহে! তাঁহার অনেক গ্রন্থে, সাচ্চা রসনিষ্পত্তির মধ্যস্থলে, এইরূপ বীভৎস এবং 'বে-ধারা' মোচড়ের এক একটা হঠকারিতা পাঠকের 'সহানুভূতি' না জন্মাইয়া বরং 'আস্ত' বেদনাই জন্মাইতে থাকে! 'চরিত্র হীন' উপন্যাসেও এইরূপে কিরণময়ী-চরিত্রে 'ধার' উঠিতে উঠিতে পরিশেষে উহা একেবারে 'ভাঙ্গিয়া' গিয়াছে! উহার নিজের 'ধার' নিজেকেই কাটিয়াছে! একের দিকে নিষ্ফল অনুরাগ বা 'হতাশ-প্রেম'টা ক্রোধ

এবং অভিমানের তাড়নায় যে-কোন-একটা আগন্তুকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া একেবারে কুলটাধর্ম্মী আত্মদানে পরিণতি লাভ করিয়াছে! নিদারুণ বীভৎস হইয়া গিয়াছে! উহা সাহিত্য ক্ষেত্রে, পাঠকের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির মুখের উপরেই একটা বিপর্য্যয় বেত্রাঘাত এবং নির্দ্দয় অত্যাচারের দৃষ্টান্তরূপেই উজ্জ্বল থাকিবে। মোটের উপর, শরচ্চন্দ্র যেন মনুষ্যের রুচিক্ষেত্রে অসঙ্গত এবং বীভৎস বলিয়া কোন পদার্থকে গ্রাহ্যই করিতে চাহেন না। তাঁহার অনেক গ্রন্থের অবস্থা ও ঘটনায় এবং চরিত্র চিত্রণে উহার পরিচয় আছে। শুনিতে শুনিতে সমস্তই সহিয়া যাইবে, ইহা যেন তাঁহার ধারণা। এই ধারণা এবং (Experiment) পরীক্ষার ব্যাপার কোন উচ্চ শ্রেণীর শিল্পীরই যোগ্য নহে। * * *

প্রচণ্ড রোমান্সের দৃষ্টান্ত এ'যুগের আর একজন ক্ষমতাশালী গল্প-লেখক শরচ্চন্দ্রের মধ্যে যথেষ্ট মিলিবে। * * 'চরিত্রহীন' গল্পে উপেন্দ্রের প্রতি নিষ্ফল প্রেমের ক্রোধবশেই কিরণময়ী দিবাকর নামক স্বরূপ পরপুরুষকে ঐরূপে ঘরের বাহির করিয়া মায় একশয্যায় শয়ন করিয়াও চলিতে লাগিল! * * * আধুনিকের রিয়ালিজম্ ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ প্রভৃতিও অনেক স্থলে অসম্ভব ধরণের রোমান্স্ চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই হইতেছে না। কেবল যৌন ভাবের বিশ্লেষণ আনন্দেই যেমন উহার ঐকান্তিক্ ঝোঁক, যৌন আনন্দ ব্যতীত যেমন এই 'মনস্তাত্ত্বিক'গণের কিছুতেই মন বসে না; তেমন উপস্থিত মতে এক একটা মতলবী চালের অজুহাত উপন্যস্ত করিয়া তাঁহারা অনেক অভাবনীয় রোমান্টিক্ 'কারসাজি'কেই কথাশিল্পের ক্ষেত্রে রিয়ালিষ্টিক্ বলিয়া চালাইয়া দিতেছেন।"

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সুনীতিবাবু লিখিয়াছেন—"আধুনিকযুগে বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক (শরৎচন্দ্র)। শরৎচন্দ্রের লিখন ভঙ্গী এতই মনোরম ও ঘটনা-সমাবেশ এতই অভিনব যে, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার আবির্ভাব নবযুগের সূচনা করিয়াছে। ('শ্রীকান্ত' বহুপ্রকার সৌন্দর্য্যের আকর; বিবিধ মনোবৃত্তির বিকাশ, নানারূপ অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনার একত্র সংস্থান ও জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি, ইহার শ্রীকে নানাভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।")

পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহ শরৎবাবুর 'বড়দিদি' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তিনি 'বড়দিদিকে' বড়দিদি রাখিয়াও বাৎসল্য রস বেশ ফুটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি বীভৎসরস প্রধান হইত না। তবে আজকাল লোকে এইরূপ উৎকট রসই বেশী পছন্দ করে। গ্রন্থকারও বোধ হয় তাহাদের খোরাক যোগান আবশ্যক মনে করেন। কিন্তু এইরূপ অপবিত্র প্রেমের চিত্রদ্বারা সমাজের কি অনিষ্ট হইতেছে ইহা একবার চিন্তা করা উচিত।"—সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষা, পৃঃ ২৮-২৯।

যতীনবাবু আরও বলিয়াছেন—"এই গ্রন্থকারের 'পল্লীসমাজে' আর একটী হিন্দু বিধবার পতনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। * * তাঁহার 'পল্লীসমাজে' এই অবৈধ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়া পল্লীগ্রামের দলাদলি ও কলহদূষিত বায়ু যে আরও দূষিত করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার ফলে পল্লীগ্রামে অতি কুৎসিত আকারে প্রচলিত স্বকীয় ও পরকীয় প্রেম সভ্য বেশ ধারণ করিয়া সাধারণের ঘৃণার স্তর কাটাইয়া উঠিতে পারে।

সধবা স্ত্রীর পরপুরুষের সহিত প্রেম করাটা সকল সমাজেই নিন্দনীয়, এবং তাহার চিত্রাঙ্কন সকল সমাজের পক্ষেই অনিষ্টজনক। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের অনেক উপন্যাসলেখক বিলাতী

উপন্যাসকে আদর্শ করিয়া সধবার পরপুরুষের প্রতি প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং করিতেছেন। * * *

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে তাঁহার শৈবলিনী-চরিত্রে [এই] শ্রেণীর প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। * * শৈবলিনীর পাপ মানসিক পাপ; * * তাহা হইলেও গ্রন্থকার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুষানলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। * * ইহা দ্বারা পাঠকের মনে পাপীর প্রতি সহানুভূতি ও পাপের প্রতি বিতৃষ্ণা হয়। * * এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের আর্টের সার্থকতা। * *

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'দেবদাসে' এই শ্রেণীর আর একটি প্রেমচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। * * পার্ব্বতী * দেবদাসকে আপনার লোক ও স্বামীকে পর ভাবিতেছে। ইহা একজন বিবাহিতা রমণীর মুখে নিতান্ত বিসদৃশ ও নিতান্ত বিগর্হিত শুনায়। * * সমাজের হিসাবে পার্ব্বতীর এই পরকীয় প্রেম যে নিতান্ত গ্লানিজনক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। * *

'স্বামী' পুস্তকে [শরৎ বাবু] আর একটি পরপুরুষাসক্তা নারীর চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। * * সৌদামিনী তাঁহার মামার নিকট এই godless education পাইয়াছিল, এবং নরেনের সঙ্গে অবাধে মিশিতে পাইয়া তাহার প্রতি অবৈধ প্রেমে আসক্ত হইল। এইরূপ অগঠিত-চরিত্র-যুবক-যুবতীকে পরস্পরের সহিত অবাধে মিশিতে দেওয়া আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় কতদূর সমীচীন তাহাও এ স্থানে বিবেচ্য। * * কিন্তু সৌদামিনী যতই অনুতাপ করিয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক, তাহার অধঃপতনের ইতিহাস যে একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই * *

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', 'নষ্টনীড়' ও 'ঘরে বাইরে' অপেক্ষা শরৎ বাবুর চরিত্রহীন সমাজের পক্ষে অধিকতর অনিষ্টকর, কারণ শরৎ বাবুর আর্ট অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী এবং তাঁহার লেখা অনেক বেশী popular * *

বিনোদিনী বাঘিনী হইলেও কিরণময়ীর তুলনায় যেন একটি পোষা বিড়াল। * *

এরূপ সমালোচকও আছেন, যাঁহারা আর্টের হিসাবে কিরণময়ীকে প্রশংসা করিয়াছেন। এই পাপ পঙ্কিল আর্ট আমাদের মাথায় থাকুক ; যে আর্টের দ্বারা সমাজের আবহাওয়া দূষিত হয়, পাঠক পাঠিকার মনে কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা করে——আমরা সে আর্ট চাই না। আমরা এপর্য্যন্ত যত কলুষিত নারীচরিত্র সাহিত্যে পাইয়াছি, কিরণময়ী তাহার সকলের উপরে টেক্কা দিয়াছে। * * সে স্বামীকে ভালবাসিতে শেখে নাই; * * প্রথমে [তার] প্রেম অনঙ্গ ডাক্তারের প্রতি ছিল, পরে উপেনের ও সতীশের প্রতি, অবশেষে দিবাকরের প্রতি—অথবা একসঙ্গেই উপেন এবং দিবাকরের প্রতি ধাবিত হইল। * *

কিরণময়ী প্রকাশ্যভাবে বেশ্যা না হইয়াও বেশ্যার অধম। সাবিত্রী প্রকাশ্যভাবে বেশ্যার গৃহে বাস করিলেও সে প্রকৃত বেশ্যা নহে। সে নানা প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও নিজের চরিত্র ঠিক রাখিয়াছিল। * *

সাবিত্রীর ভালবাসা, দেবদাসের প্রতি চন্দ্রমুখীর ভালবাসার ন্যায় স্নেহের পবিত্র সীমায় উঠিয়াছিল। সাবিত্রী সতীশের জন্য যেরূপ দুঃখ ভোগ করিয়াছে, তাহা পড়িতে পড়িতে আমাদের চোখে জল আসে। কিন্তু তাহা হইলেও সাবিত্রী-চরিত্র সমাজ শরীরে বি

কার্য্য করিবে। ইহার পরে যদি 'মেসে'র ছেলেরা সুন্দরী যুবতী চাক্‌য়াণীর সঙ্গে প্রেম করিতে যায়—তবে এই সাবিত্রীর জন্মদাতা সে জন্য দায়ী হইবেন। অধিকাংশ 'মেসে'র ঝি অবশ্য সাবিত্রী নহে, সুতরাং সতীশের অনুকরণে ঝির সঙ্গে প্রেম করিতে গেলে কত কত ছেলের যে পরকাল নষ্ট হইবে, তাহা বিচিত্র কি? অন্ততঃ 'মেসে' এই সকল চরিত্র লইয়া যে আলোচনা ও 'এয়ারকি' চলিবে, তাহা-দ্বারা ছাত্রনিবাসের আবহাওয়া দূষিত হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। * *

"কিরণময়ীকে গৃহস্থ-নারী ও বারনারীর মধ্যবর্ত্তী সেতু মনে করা যাইতে পারে।"

পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের নানা গল্প-উপন্যাসের মধ্যে তাঁহার প্রতিভার বিশেষত্ব পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার 'শ্রীকান্তে'। একহিসাবে 'শ্রীকান্ত' যেমন তাঁহার বস্তুগত জীবনের প্রতিরূপ, তেমনি, সব দিক দিয়া দেখিতে গেলে, তাঁহার আর্ট ও তত্ত্বের সম্পূর্ণ অবয়বের পরিচায়ক। * * গৃহ এবং সমাজ-জীবনে স্নেহ ভালবাসা স্বাভাবিক আধার হইতে বঞ্চিত অথবা বিক্ষিপ্ত অথবা সমাজের বিধি-নিষেধের জন্য অবিন্যস্ত হইয়া অহরহঃ যে কত গভীর বেদনায়, কত দুঃখ-গ্লানি লজ্জার সৃষ্টি করিয়াছে ও

রতেছে, শরৎ চট্টোপাধ্যায় সেই ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, ব্যর্থ প্রেমের বেদনার পুরোহিত। তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী লেখার ছত্রে এই গভীর বেদনা গুমরিয়া-গুমরিয়া উঠিয়াছে,—pathos স্ফুরণে তিনি বাংলা উপন্যাসে

সমাজ ও গৃহের বিধি-বিধানের জন্য এই ক্ষুব্ধ এবং উৎক্ষিপ্ত ভালবাসার বিহ্বলতা যে গৃহে ও সমাজে কত করুণায়

প্রকাশিত হয়, তাহা অতি ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শরৎ চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন,—ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। 'বিন্দুর ছেলেতে' স্নেহ বিবশা কাকীমার অপরিসীম বেদনা, 'পল্লী-সমাজে' বিধবা রমার নিষ্ফল নিষ্পাপ প্রেম এবং অব্যক্ত ত্যাগ ও দুঃখ এমন কি 'দত্তাতে'ও বিলাস ও রাসবিহারী কর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত দত্তা কন্যার নীরব ভালবাসা গার্হস্থ্য-বিধান ও সামাজিক ব্যবধানের আঘাতে ক্ষিপ্ত-ও চূর্ণ হইয়া কত না মর্ম্মস্পর্শী কাহিনীর উপাদান হইয়াছে—একদিকে ভালবাসা ও স্নেহের নিষ্ফলতা, অপরদিকে অনুদার গৃহ ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইন্ধন জোগাইতেছে।

শরৎবাবুর আর একটা বিশেষ কথা বলিবার আছে; সেটা এই, জীবনে শুধু কতকগুলো দুঃখ ভোগ করিয়া গেলেই যে সুখ আসিবেই, তাহা নহে। জীবনকে ফুলে ফলে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে,—আর সেই সার্থক করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় ত্যাগ। ঐ ত্যাগই একমাত্র সত্য—গৃহ-ধর্ম্ম, সমাজ-ধর্ম্ম ও ন্যায়ধর্ম্ম এই ত্যাগের কাছে নিতান্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। যাহার ভিতরে সত্যই এই ত্যাগের শিখা জ্বলিয়াছে তাহাকে বংশপরম্পরাগত সাধারণ বিধি-নিষেধের মাপ কাটীতে বিচার করা উচিত নহে। এইটাই তাঁহার উপন্যাস-সাহিত্যে খুব modern note, এবং এইখানেই তিনি হিন্দু-সমাজকে সঙ্কীর্ণ বিধি-নিষেধ-প্রবর্ত্তিত হীনতা ও দুর্ব্বলতা হইতে উদারতা ও বিশালতার দিকে আহ্বান করিয়াছেন। * * *

বিরাজ-বৌতে স্বামী-প্রেম স্বাধিকার হইতে ক্রমশঃ বিচ্যুত হইয়া অভিমানের শিখায় জ্বলিয়া পুড়িয়া শেষে মিলনের সার্থকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। * * *

শ্রীকান্ত ভবঘুরে, দেবদাস উচ্ছৃঙ্খল; সাধারণ বিচারে সে উন্মাদ, তাহার কথোপকথন সাধারণের নিকট প্রলাপের ন্যায় পীড়াদায়ক * * * 'গৃহদাহের' সমস্যাটী 'দত্তা'র তুলনায় আরও জটিল হইয়াছে। কারণ বিভিন্ন আদর্শে চালিত অচলা স্বেচ্ছায় হিন্দুগৃহের ও হিন্দু নারীত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়াছে। যতদিন অচলার স্বামীপ্রেম পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত না হয়, ততদিন এই সংঘর্ষ ও যন্ত্রণা অফুরন্তভাবে চলিতে থাকিবে এবং অচলার সামাজিক আদর্শের স্মারক ও প্রতিরূপ সুরেশ ততদিনই ধূম-কেতুর মত তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়া অকল্যাণের পথে লইয়া যাইতে থাকিবে। ঘরে বাইরের নিখিলেশের মত অচলার স্বামীও নীরবে, নির্ব্বিবাদে প্রেমের ত্যাগ ও মিলনের জন্য ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছেন। * * শরৎ চট্টোপাধ্যায় বলিতে চাহিয়াছেন নর ও নারী যদি আপনাদের জীবনের ত্যাগ ও দুঃখের ভিতর দিয়া পরস্পরের সম্বন্ধ সার্থক করিতে পারে তাহা হইলে কোন অলঙ্ঘনীয় বিধি-নিষেধের দাবী তাহাদের পক্ষে খাটে না। অবশ্য সকলেই যে এইরূপ ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিতে পারে তাহা নহে * * * তাঁহার উপন্যাস সাহিত্যের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান তত্ত্ব।

বাংলার স্বাভাবিক গৃহ ও সমাজ জীবনে বিধি-নিষেধের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যে পূর্ণ স্নেহ ও প্রেমের ছবি আমরা সচরাচর দেখি এবং যাহা আমাদের আর সকল ঔপন্যাসিক চিত্রিত করিয়াছেন, শরৎবাবুর প্রেম সেরূপ স্বাভাবিক ও সহজক্ষেত্রে প্রকাশ পায় নাই। শরৎ বাবুর লেখার ভিতর আমরা বিধিনিষেধের দ্বারা বিপর্য্যস্ত অসমাপ্ত প্রেমের গভীর হাহাকার-ধ্বনি নিয়ত শ্রবণ করি। তিনি যেন গৃহ,

সমাজ ও জগৎকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখিয়া নিজের ও আমাদের অন্তঃপীড়ার নিগূঢ় রহস্য বাহির করিয়াছেন। * *

বাংলার মাতৃপ্রকৃতির কোথাও সেই স্নিগ্ধ, শ্যামল ও হরিৎ কান্তির মাধুর্য্য, ঋতুর সেই সরস ও স্নেহ-বিহ্বল হৃদয়ের আকর্ষণ, বাংলার সুনীল আকাশের কোলে রঙ্গীন মেঘের স্ফূর্ত্তিময় লীলা-খেলা অথবা জ্যোৎস্না-প্লাবিত মত্ত মধুযামিনীর আনন্দ উৎসব ও অবসাদ, তাঁহার উপন্যাসে আমরা পাই না। শুধু পাই তাঁহার নিকট, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ অমানিশার বিরাট কালীমূর্ত্তি, উগ্রা ও প্রচণ্ড প্রকৃতির বিভীষিকা, নিবিড় কালরূপের নিদারুণ আহ্বান, অন্ধকার-শূন্য, প্রান্তরে ঝড়ের উদ্দাম অনিবার্য্য লীলা ও মানুষের অপমানের মধ্যে অসহায়া এক রমণী, মহা-শ্মশানের অসংখ্য পিশাচের উদ্বেল অট্টহাস্য, কিংবা ভীম-বাহিনী ভাগীরথীর আবর্ত্ত-সঙ্কুল বিপুল ও উন্মত্ত জলস্রোতের উপর ক্ষুদ্র একটী তরণী ও অসহায় মানুষ। প্রকৃতি তাঁহার নিকট করালরূপে প্রতিভাত। * * সুরেশ; নরেন ও সতীশের অকস্মাৎ আবির্ভাব ও তিরোভাব, পিয়ারী, অচলা ও বিজয়ার মুহুর্মুহুঃ ব্যবহারের পরিবর্ত্তন, আখ্যায়িকার মধ্যে ঘন ঘন দৃশ্য-পরিবর্ত্তন, এই সমুদায়ে,—যাহাকে পাশ্চাত্য-সমালোচকেরা bioscopic literature নাম দিয়াছেন,—সেই লঘু ও চঞ্চল ঘটনাবহুল সাহিত্যের প্রতিচ্ছবি, bioscopeএর বিচিত্র আনাগোনার সহিত উদ্বেগের চক্ষু ও অন্তঃপীড়াদায়ক অসহ্য ঘাত-প্রতিঘাত দেখিতে পাই। * * *

দেবদাস, সুরেশ, সতীশ ও কিরণ ময়ীর চরিত্রাঙ্কনে লেখকের আর্ট অতর্কিতে যদি আবেগের অধীন হইয়া স্নায়বিক বিক্ষোভ ও বিকারের মধ্যে একটি অসাম্য ও কেন্দ্রচ্যুতি আনিয়া ফেলে, তাহা হইলে এই ত্রুটি, এই দোষটুকু ত আমরা স্বীকার করিয়া লইব। * * *

সাবিত্রী ও সতীশ, কিরণময়ী ও সতীশ, কিরণময়ী ও উপেন, কিরণময়ী ও দিবাকর প্রভৃতির কথোপকথনে মধুর রহস্যালাপ, মানভিক্ষা, অনুনয়-বিনয়, অভিমান—পরিহাসের পালার আতিশয্যে অতর্কিতে যে অবোধ বিষের বীজ ঝরিয়া পড়ে এবং অলক্ষ্যে অপরিণামদর্শীর অন্তঃকরণে অজ্ঞাতসারে উপ্ত হইয়া যে বিষ-বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে, তাহা অসম্ভব নহে; অথচ, যাহা তাহাদিগকে পাঠান্তে বিশ্লেষণের অবকাশের পর ক্ষুব্ধ চমকিত করে, তাহা মধুর ও চিত্তাকর্ষক ভাবে অন্তরে তাহার অধিকার পূর্ব্বেই বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে।

তাঁহার সকল উপন্যাসের মতই [চরিত্রহীনেও] প্রেম বিধি-নিষেধের দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইয়া অন্তস্তলের আলোড়নে রক্তে ভিজিয়া ভারী ও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, প্রেম প্রেমই। প্রেমকে বিজ্ঞের দল নিজেরাই বিধি-নিষেধের গণ্ডী সৃষ্টি করিয়া ঘৃণিত, অবৈধ ও কুৎসিত বলিলেও, তাহার দাবী অবজ্ঞা করিবার নয়। * * * তিনি আরও দেখাইতে চাহিয়াছেন, মানুষই যে শুধু ভুল, ভ্রান্তি, অন্যায় ওপাপ করিতে জানে, তাহা নয়, সমাজও জানে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রত্যেকের অধিকারের একটা সীমা আছে। সে সীমা ব্যক্তি অথবা সমাজ, মূঢ়তায় হউক, প্রবৃত্তির ঝোঁকে হউক, জিদের বশে হউক, যে ভাবেই হউক লঙ্ঘন করিলেই অমঙ্গল। দেবদাস ও কিরণময়ীর জীবনের tragedyটুকু ব্যক্তিগত জীবনের এই অধিকারের সীমা লঙ্ঘনকে অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে চন্দ্রমুখী ও সাবিত্রীর ধৈর্য্য, ক্ষমা ও সেবাপরায়ণতা তাহাদের জীবনকে শত আঘাত, বেদনা, জ্বালা, নৈরাশ্যের ভিতর দিয়াও একটা অনাবিল মাধুর্য্য ও অক্ষত মহিমায় সফল করিয়া তুলিয়াছে। অর্থ ও পদ-

গৌরবের মর্য্যাদা ও প্রত্যাখ্যানের অভিমানকে আশ্রয় করিয়া দেবদাস ও পার্ব্বতীর মধ্যে যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মিথ্যার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা উভয়দিক হইতে হইলেও, একদিকে যেমন অত্যাচার এবং দৈহিক ও মানসিক সর্ব্বনাশ, অপরদিকে নিষ্ফল প্রেমের মর্ম্মন্তুদ ও অস্ফুট বেদনার ইন্ধন যোগাইয়াছে। আরও একদিকে করুণার্দ্র স্নেহ করস্পর্শ দেবদাস জীবনের শেষ ক্ষণেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে নাই। এখানেও আর এক ধরণের ভয়ানক ব্যবধান স্নেহ ও ভালবাসাকে সম্মানের আসন দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছে। অথচ চন্দ্রমুখী দেবদাসের নিকট হইতে সেই সনাতন পুরাতন পুরুষের (the eternal masculine) প্রভাবের নিকট হার মানিয়াও চরিত্রের শিক্ষা পাইয়া আপনার জীবনকে শত ধৈর্য্য ও সেবার ভিতর দিয়া সার্থক করিয়া তুলিয়া দেবদাসকে বাঁচাইতে পারিল না; কারণ, দেবদাস তাহার নিকটে থাকিয়াও অতিদূরে।

* * দেবদাসে যে সকল কঠিন-প্রশ্ন শরৎবাবু সমাজকে বিচার করিতে বলিয়াছেন, তাহার মীমাংসা তিনি নিজেই দিয়াছেন 'চরিত্র-হীনে।' 'চরিত্র হীন' বইখানা 'দেবদাসের' অতি সুন্দর sequel, দেবদাসের ঘটনা অতি সরল ও বাহুল্য বর্জ্জিত; আবেগ অতি তীব্র ও রুক্ষ,—tragedy অত্যন্ত concentrated; জমাট ও মর্ম্মন্তুদ। সাহিত্যে ইহার স্থান খুব উচ্চে। ইহার একাগ্রতা ও একভাবমুখীনতা আজ-কালকার পাশ্চাত্য সামাজিক নাটকের তেজ ও উত্তাপ ইহাকে প্রদান করিয়াছে। বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক পুষ্কিনের Dovbrovsky ও Thomas Hardyর Tessএর পার্শ্বে ইহার স্থান। * * *

'চরিত্রহীনে' বিভিন্ন দিক হইতে প্রেমের এই কঠিন পরীক্ষা ও পরীক্ষার ফলাফল দেখান হইয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষাটা সমাজের ও গৃহধর্ম্মের অননুমোদিত ব্যথিত স্নেহ ও ভালবাসার পরীক্ষা। সতীশ ও সাবিত্রীর বিচ্ছেদে একদিকে সাবিত্রী আপনাকে বিধবা, কুলত্যাগিনী ও সমাজে লাঞ্ছিতা বিবেচনা করিয়া অতলস্পর্শী দুঃখের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া যেমন ভালবাসার জোরেই সতীশ হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়াছে, অপরদিকে সতীশ তাহার বিচ্ছেদকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে না পারিয়া নানা সংশয়, দুঃখ, সর্ব্বনাশ, মায় পঞ্চমকারের ভিতর দিয়া শেষে উপীনদার আদর্শ ও বিচারে ধৈর্য্যের পরীক্ষায় টিকিয়া গেল।

আজন্ম শুদ্ধ নির্ম্মল ও সমাজের অনুমোদিত উপেন্দ্র-সুরবালার নিষ্কলঙ্ক বিবাহিত জীবনের অতলস্পর্শী প্রেম শুকতারার মত একান্ত ব্যথিত, ব্যগ্র ও সংশয়হীন চোখে সকলের পানে চাহিয়া সকলেরই অন্তরে একটা সুধা ও সান্ত্বনার ধারা সর্ব্বদাই বর্ষণ করিয়াছে। * * সুরবালার সংশয়লেশহীন, অন্ধ ভালবাসা ও উপেন্দ্রের স্বচ্ছ, কঠিন পবিত্রতা তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু স্বামীর অকালমৃত্যুতে তাহার স্বাধিকারচ্যুত নিষ্ফল প্রেম উপেন্দ্রকে ঘিরিয়া কল্পনার জাল বুনিতে লাগিল। উপেন্দ্রের অবিশ্বাস ও ঘৃণায় কিরণময়ীর অন্তর্বিদ্রোহ তাহাকে আবার বিপথে প্রেরণ করিল। * * কিরণময়ী দিবাকরের রহস্যালাপে এমন সব লালসার ইঙ্গিত আছে, যাহা কিরণময়ীর চরিত্রকে এইস্থলে অতি সংক্রামক করিয়া ফেলিয়াছে। * * কিরণময়ীর শেষের অধঃপতন ও বিকার যেরূপ অস্বাভাবিক, তাহার শেষের উন্মত্ততা, তাহার আস্তিক্য-বুদ্ধির উন্মেষ ও তাহার জড়তাও সেইরূপ

মামুলী। কিরণময়ীর চরিত্রাঙ্কণে শিল্পহিসাবে তাহার হঠকারিতা তত দোষের নয়, যত দোষের এই লক্ষ্যচ্যুতি। * *

কিরণময়ীকে যেভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে তাহাতে তাহার প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসা ও প্রেম-অভিমানের চিহ্ন তাহার মধ্যজীবনে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

যতদিন কিরণময়ী তাহার মধ্যজীবনের উদ্দাম কল্পনার কেন্দ্র উপেন্দ্রকে ত্যাগ করে নাই, ততদিন তাহার বিষ ও হুল থাকিলেও তাহা মৌমাছির ন্যায় সত্য ছিল। কিন্তু যখন আরাকান যাত্রার সূচনা হইতে সে আবার কেন্দ্র ভ্রষ্ট হইল, তখনই সে শিল্প হিসাবে অসত্য এবং নিজ চরিত্র হিসাবে সে নিতান্ত অস্বাভাবিক, বিকৃত হইল।

প্রথমে উপেনের প্রতি আকর্ষণ। দ্বিতীয় তাহা হইতে বিকর্ষণ এবং দিবাকরের প্রতি আসক্তি এবং তৃতীয় পুনর্ব্বার উপেন্দ্রের নিকট তাহার নিস্ফল প্রত্যাগমন—এই তিনটির মধ্যে সাহিত্য-শিল্পের অস্বাভাবিক কার্য্য—কারণ ও সংলগ্নতার সূত্র খুব কৃশ ও দুর্ব্বল। * *

কিরণময়ীর চরিত্রটা সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। * * কিরণময়ীর চরিত্রটা প্রথম দৃষ্টিতে বুঝা যায় না; তাহার কারণ তাহার চিত্ত একেবারে বুদ্ধি-প্রধান। * *

কিরণময়ীর পাপ তাহার উচ্চশিক্ষা ও বুদ্ধির উপর চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত না হইলেও; সে বিচার আমরা করিব না। * * *

একদিকে যেমন [কিরণময়ীর] বিদ্রোহটা এই হেতু অস্বাভাবিক ও বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, অপরদিকে বিমলা ও বিনোদিনীর মত তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের উপযোগী বৃত্তিনিচয়ের স্বাভাবিক পরিণতিরও ইতিহাস আমরা লেখকের নিকট পাই নাই। * * * উপেন্দ্রের নিষ্পাপ.

নিষ্কলঙ্ক বিশাল প্রাণ ও উপেন্দ্র সুরবালার বিবাহিত জীবনের সহজ মধুর প্রেম যেমন নৈরাশ্যের অন্ধকারে গল্পের বাসনা ও সুখ, দুঃখ ও বেদনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছে, সেইরূপ সতীশ, সরোজিনী, দিবাকর ও শচীর চিত্রও গল্পের সমাপ্তিতে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ রজনীরপর শান্ত সূর্য্যোদয়ের মত ফুটিয়া উঠিল। বিবাহিত জীবনের প্রেমকে আশ্রয় করিয়া, সাবিত্রী বাহির হইতে উহাকে বুকে করিয়া রাখিল; কিরণময়ী বাহিরে যাইয়া উহাকে বুকে করিতে না পারিয়া পাগলিনীর মত বেড়াইতে লাগিল। অনেকে বলিয়াছেন, আর্ট এখানে লোকাচারের উপর উঠিতে না পারিয়া আপনাকে হীন করিয়াছে। কিন্তু ইহাও ভাবিবার কথা। আর্ট যে শুধু সৃষ্টি করে তাহা নহে, সৃষ্টিরক্ষাও করে। * * * সৃষ্টি করা অপেক্ষা সৃষ্টি রক্ষা করা কাজটাই কঠিন। * * বাহিরের দিক দিয়া হঠাৎ ত্যাগ, অথবা কৃত্রিম বিধি—নিষেধের ব্যবস্থাপিত ত্যাগ কেবল ত্যাগই মাত্র; উহাতে সৃষ্টির রক্ষাও নাই বিকাশও নাই!

শরৎবাবুর সাহিত্যে কি আছে, তাহা লইয়া এতক্ষণ আলোচনা করিলাম; কি নাই, তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। বঙ্কিমের সে জীবনের অভিজ্ঞতা, সে কল্পনা, সে বিপুল প্রয়াস, রবীন্দ্রনাথের সে ভাবপ্রবণতা, সে বিচিত্র জ্ঞান, সে কারুকলা তাঁহার নাই। শুধু বাংলার ভাবী সাহিত্য তাঁহার নিকট কি আশা করে, তাহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। জীবনের নিষ্ফল ও সংক্ষুব্ধ প্রেমের গভীর দুঃখের কথা তিনি ত কত না বিচিত্র দিক দিয়া মনুষ্যহৃদয়ের নিভৃত অন্তঃস্থলের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিতে করিতে নিঃসংশয়ে বুঝাইলেন। * * * (সমাজের কোলে, দুঃখের সংসারে নির্য্যাতনে লালিত পালিত

কিরণময়ী একদিন তাহার বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতায় উত্তপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিল, 'মেয়ে মানুষের কখনও অসুখ হয় না, মেয়ে মানুষ মরে, কোথায় শুনেছ? অযত্নে অত্যাচারে মেয়ে মানুষ মরে গেছে, ভগবান্ মেয়ে মানুয়ের দেহে তা কি দিয়েছেন, যে যাবে? এ জাতকে গলায় দড়ি বেঁধে দশবিশ বছর টাঙ্গিয়ে রেখে দিলেও মরে না।' নারীর প্রতি এমন শ্রদ্ধা, তাহার দুঃখে এমন সমবেদনা খুব কম লেখাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রেম এবং প্রেমের নিষ্ফলতা, নারীর অভিমান ও গোপন বেদনা জীবনের সবটা ঘিরিয়া বসে নাই। শুধু তাহাই তাঁহার নিকট হইতে পাইলে যে আমাদের একটা অবসাদ ও পুনঃপুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের ফলে একটা আবেগের শান্তি ও ঔদাসীন্য আসিবে। সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয়জীবন, শিক্ষা, ধর্ম্ম, ও সমূহ-জীবনে যে সংঘর্ষ, আদর্শের কত বিপ্লব, কত ভাব বিপর্য্যয়, কত অধঃপতন, কত অপমান, অবিচার বিফল প্রয়াসের মধ্য দিয়া বাংলার জন-সমাজের প্রাণান্তকর বেদনা অহরহ জাগিয়া উঠিতেছে, বেদনার পুরোহিত তিনি ত তাহা অনুভব করিয়াছেন। নূতন আবেগের ধারা ও ভাবের বিপর্য্যয়কে তিনি নূতন উপন্যাসে প্রকাশ করুন, তাহার অভিনব স্নেহ ও বেদনার সহিত তাঁহার স্বভাব-সুলভ আবেগ ও বিহ্বলতায় মধ্য দিয়া, তাঁহার উত্তপ্ত, তীব্র অনুভূতি ও সমবেদনা এবং অপরূপ লিখনভঙ্গীর মধ্য দিয়া, বস্তুগত জীবনের প্রাচুর্য্য ও উত্তাপ তাঁহার সমস্ত লেখার সজীবতার এই নানা বাধা ও নিরাশার স্পর্শ দিয়া জাতির বিক্ষিপ্ত, ক্ষুব্ধ চিত্তকে সুন্দর ও কল্যাণের পথে অনিবার্য্য বেগে ঠেলিয়া দিক।"

বর্ত্তমানযুগে ভাষায় পঙ্কিলতা—

বঙ্কিম যুগ ও বর্ত্তমান যুগের পাশাপাশি তুলনাকল্পে দীনেশবাবু

তাঁহার ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য নামক পুস্তকের ৩৩৮-৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"ইংরাজী কবিদের কাছে যে বাঙ্গালার কবিওয়ালা শুধু দাঁড়াইতে পারে তাহা নহে, তাঁহাদিগকে এমন বীণার সুর শুনাইয়া দিতে পারে, যাহা Bay of Biscay কিম্বা English Channel-এর পারে কখনও বাজে নাই—এই কথা অক্ষয়বাবু সর্ব্বপ্রথম বুঝাইয়াছিলেন। চন্দ্রবাবু সংস্কৃত সাহিত্যের দিক দিয়া হিন্দু আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরবাবু সুকোমল চিত্তবৃত্তির খেলা খেলিয়া বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যটী নূতন করিয়া আধুনিক গদ্যছন্দে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আর্য্যদর্শনের যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদেশী ক্ষাত্রতেজ বাঙ্গালায় আমদানী করিয়া পাশু-পত অস্ত্রের সন্ধান করিতেছিলেন। আমি ইঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি। গতযুগ ইঁহাদের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে,—সাহিত্যক্ষেত্রে ইঁহাদের অগাধ পাণ্ডিত্য এ যুগের লেখকগণের মধ্যে নাই। ইঁহাদের কাছে বসিলে, কথায় মুগ্ধ হইতে হইত। ইঁহারা বিদ্যার গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন—ইঁহাদের তুলনায় এখনকার লেখকেরা হাল্কা,—সে পাণ্ডিত্য, সে পুরুষোচিত তেজ, সে গাম্ভীর্য্য এখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে পাওয়ার আশা বৃথা। তাঁহারা ছিলেন সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা, পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া ইঁহারা পথ করিয়া দিয়া গিয়াছেন—তাই এখনকার নির্ঝরনিনাদ ও মৃদুতরঙ্গের গান আমরা শুনিতেছি।

* * কি করিয়া [চন্দ্রশেখর বাবু] বাঙ্গালাসাহিত্যের পথে আসিলেন, বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে পরিচিত হইলেন, স্ত্রী-হারা হইয়া আহার নিদ্রাশূন্য বিরহী যক্ষের মত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেলেন—[একদিন তিনি আমায়] সমস্ত বলিয়াছিলেন, তেমন কথার মোহিনী অল্পই

শুনিয়াছি। চন্দ্রশেখর বাবু শুধু নহেন, বঙ্কিমযুগের প্রায় সকলেই এইরূপ কথা ও পাণ্ডিত্যদ্বারা বিস্মিত, স্তব্ধ এবং মুগ্ধ করিতে পারিতেন। * *

তখনও সাহিত্যিক জগতের রবি মধ্যাহ্ন-গগনে উদিত হইয়া অপরাপর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ করিয়া দেন নাই। তখনও হেমবাবু যশডঙ্কা-নিনাদে বিঘোষিত হইত, 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' শুনিলে বঙ্গযুবকের শিরায় রক্ত তপ্ত হইয়া উঠিত।"

বাস্তবিকই রবীন্দ্রযুগে সাহিত্য ক্রমেই হাল্কা হইয়া পড়িতেছে। সে গাম্ভীর্য্য, সে গুরুত্ব, সে পুরুষোচিত নিনাদ আর নাই; এখন তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে মৃদুতা, লঘুতা ও স্ত্রীজনোচিত কোমলতা। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের যুগে বাঙ্গালাসাহিত্যে যে নির্ম্মল পবিত্রতা পরিলক্ষিত হইত এখন ক্রমেই তাহা তিরোহিত হইতেছে। বঙ্কিম যখন বাঙ্গালাসাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হ'ন, তখন তাঁহার একহস্তে ভুবনবিজয়ী অমর তুলিকা, অপর হস্তে লম্বা চাবুক। তাঁহার অমৃত-নিষ্যন্দিনী তুলিকা হইতে বাহির হইতে লাগিল অনবদ্য ও অনাবিল উপন্যাস ও প্রবন্ধ আর পঙ্কিল পূতিগন্ধময় লেখকগণের উদ্দেশে তীব্র সমালোচনা। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—যেসকল লেখক কদর্য্যরুচিসম্পন্ন পাঠকগণের মনোরঞ্জনার্থে আবর্জ্জনাময় কলুষিত রচনা সরবরাহ করেন তাঁহাদিগকে চাবুক মারিয়া সাহিত্যের আসর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া। যুগসাহিত্যের স্রোতে বা তৎকালে প্রচলিত পাঠকবর্গের রুচির স্রোতে তিনি তাঁহার রচনাবলীর গা ঢালিয়া দিতে রাজি ছিলেন না। রুচি মার্জ্জিত করা, সমাজ সমুন্নত করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। ভাষার পরিপুষ্টি সাধন ও তৎসঙ্গে পাঠকমণ্ডলীকে সৎ-

পরামর্শদান এবং তাহাদের সমক্ষে সদ্দৃষ্টান্ত সমুপস্থাপিত করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য এবং ব্রত। ফলে, দাঁড়াইয়াছিল সে সময়ের সাহিত্যে অনাবিল পবিত্রতা, যেন Cromwellian যুগের সাহিত্য। আর—অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে—বর্ত্তমান সাহিত্য ঠিক যেন ইংলণ্ডের Restoration যুগের সাহিত্য।

শশাঙ্কমোহন সেন 'বাণী-মন্দির' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন: "সরস্বতীর 'সেবা' আদর্শ এখন কেবল অর্থসঙ্কল্পী বাণিজ্য ব্যবসায়েই পরিণত! সারস্বত জীবনের কৌলিন্য বুদ্ধি এবং দায়িত্বজ্ঞানও লুপ্ত! প্রতিদিন শত সংখ্যাতীত, স্থিতিনীতিদ্রোহী এবং মনুষ্যত্ব-বিদ্রোহী অপাঠ্য গ্রন্থও মুদ্রাযন্ত্র হইতে উদ্গীর্ণ হইয়া নূতনত্ব বিলাসী পৃথিবী-কীটের খোরাক যোগাইতেছে। এইকালে শ্রেয়ঃকামী পাঠকমাত্রকে একবার—দুইবার—বারবার সতর্ক করিয়া দিবার সময়টিই উপস্থিত।"

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের বিস্তৃত সমালোচনা কালে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন: "যেমন সৎসাহিত্য আমাদের সুপ্রবৃত্তি অনুশীলনে সাহায্য করে সেইরূপ অসৎসাহিত্য কুপ্রবৃত্তির অত্যধিক উত্তেজনা দ্বারা মানসিক সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া মানসিক ব্যাধির উৎপাদন করে। * * *

অধিকাংশ নবেল ও গল্পের বই আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেখানে যে একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার (unhealthy atmosphereএর) সৃষ্টি করিতেছে—আমাদের সমাজের বায়ু দূষিত করিতেছে, ইহাই আমাদের প্রধান আপত্তির কারণ। * *

ললিত বাবু বলেন—'* * মানব শরীরের নগ্নতা অশোভন, সাহিত্যেও নগ্নবস্তুতন্ত্রতা সেইরূপ অশোভন। * * যে

উত্তেজক উন্মাদক উপাদান আছে, চিত্ত কলুষিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সে সব চিত্র উদ্ঘাটন করা যুক্তিযুক্ত নহে।' * *

গণিকাতন্ত্র-সাহিত্য-রচয়িতা কবিগণ * * রচিত এই প্রকার সাহিত্য দ্বারা সমাজের উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হয়। আর বড়ই দুঃখের বিষয়, বঙ্গসাহিত্যে এই শ্রেণীর সাহিত্যের প্রসার দিন দিন বাড়িতেছে। * * আজকাল বঙ্গ-সাহিত্য পাপ চিত্রের প্রসারে ভারাক্রান্ত হইয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' করিতেছে। ভগবান্ বাঙ্গালীর অতি সাধের ধন, সাধনার বস্তু বঙ্গসাহিত্যকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। * *

সমাজে বিনোদিনী, বিমলা বা কিরণময়ী অপেক্ষাও অনেক খারাপ লোক আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের কে খোঁজ রাখে? কবি তাঁহার আর্টের দ্বারা তাহাদের প্রলোভনময় পাপচিত্র অধিকতর প্রলোভনীয় করিয়া ধরাতে, তাহারা আমাদের পরিচিত হইয়াছে, এমন কি অনেকের অনুকরণীয়ও হইতে পারে। * *

পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বে (সেক্ষপীয়ার) পাপের অতিমাত্র প্রভাব স্বীকার করিয়াও পরিণামে পুণ্যের পবিত্র প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। * *

আমাদের উপন্যাস লেখকগণ আর্টের সাহায্যে বিলাতী প্রেমকে আমাদের সমাজে আমদানি করিতেছেন। বিলাতী আলু, বিলাতী বেগুণ প্রভৃতির ন্যায় এই বিলাতী প্রেমেরও চাষ এখন আমাদের সমাজে তাঁহারা চালাইতে চান। চোখের বালির 'বিনোদিনী,' বড়-দিদির 'মাধবী,' পল্লীসমাজের 'রমা', নষ্ট-নীড়ের 'চারুলতা,' ঘরে বাইরের 'বিমলা', চরিত্র-হীনের 'কিরণ ময়ী,' দেবদাসের 'পার্ব্বতী,' স্বামীর 'সৌদামিনী' ইহার দৃষ্টান্তস্থল।"

পূর্ব্বোল্লিখিত যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' নামক পুস্তকের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীন্দ্রমোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন—"আজকালকার উপন্যাস সমূহে যে অশ্লীলতা ও অস্বাভাবিকতার একঘেয়ে স্রোত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই গ্রন্থ সেই স্রোত ফিরাইবার মুখে প্রথম খুঁটি বসাইল ; * * *

সাধু ব্যক্তিকে চোর বলিতে বলিতে সাধুও চোর হইয়া পড়ে এবং চোরকে সাধু বলিতে বলিতে চোরও সাধু হয়, এইরূপ একটী গভীর অর্থপূর্ণ প্রবাদ আছে। এই প্রবাদ অনুসরণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, মানুষের সম্মুখে মন্দভাবের অসৎবিষয়ের চিত্র ধরাই উচিত নয়, সাধুভাবের কল্যাণকর বিষয়েরই চিত্র প্রত্যেক মানবহিতৈষীর, অঙ্কিত করা উচিত। * *

[এখনকার] উপন্যাসগুলির অনেকগুলিতে কেবল অশ্লীলতা জাগিয়া নাই, অস্বাভাবিকতাও অতিমাত্রায় জাগ্রত * * * তেরো বৎসরের বালিকার মুখে যে সমস্ত কথা বলানো হইয়াছে সেরূপ কথা বাহির হওয়া একেবারেই অসম্ভব। দুদিনের আলাপে আগন্তুক ব্যক্তির মুখে ভদ্রমহিলাকে যেরূপ অভদ্র ভাষায় সম্বোধন করানো হইয়াছে, সেরূপ ভাষায় সম্বোধন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

"আমাদের জাতীয় সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন : "আজ আমাদের সাহিত্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হোয়ে পড়েছে, কেবল কতকগুলো আবর্জ্জনা এসে সাহিত্যের নামে মিথ্যা পরিচয় দিচ্ছে। যে প্রচণ্ড প্রতাপ, যে শঙ্খ নিনাদি ভাষা যা উন্নতশির কোরে আমাদের দাঁড়াতে শিখাতো, যার একটা গভীর চেতনা আমাদের প্রতিটি শিরায় প্রবল বন্যার ঢেউ বহিয়ে দিতো, আজ

সাহিত্য একেবারেই লুপ্ত হ'তে চলেছে। আজ শুধু হা হুতাস, প্রেম ভালবাসা, দীর্ঘ নিশ্বাস, বিচ্ছেদ বেদনা প্রভৃতি আমাদের সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়েছে। * * * আজ দুর্ভাগ্য আমাদের, এই জাতীয় আত্ম-প্রকাশের দিনে সেখানে কলা-লক্ষ্মীর বেদীতলে কুৎসিৎ প্রেমের বেসাতি চলেছে! আমাদের সাহিত্য হীন এত নীচ হয়ে পড়েছে! এই কি আমাদের বাণীদেবীর তরুণ পুজারীদের হৃদয়-বৃত্তির পরিচয়? *

আমাদের জাতীয় সাহিত্যের বিকৃত ক্ষুধা দূর কোরে আজ এ জাতীয়তা মহাযজ্ঞের দিনে বাণীর নিকুঞ্জে সুস্থ ও সবল কোরে আমাদের সাহিত্যকে নূতন রূপ দিতে হবে। এ পূতিগন্ধময় সাহিত্যের পঙ্কিল গণ্ডী থেকে কলালক্ষ্মীর উদ্ধার কোরে বাণীর নিকুঞ্জে আমাদের অতীতের গৌরবময় অধ্যায়গুলিকে জাতির নিকট উপস্থিত কোরে আত্মচেতনার উন্মেষ করতে হবে।"—শ্রীদেশবন্ধু, কার্ত্তিক, ১৩৪১; পৃঃ ১০২-৩।

পয়ঃপ্রণালীর বারিস্রোতঃ দীর্ঘকাল রুদ্ধ করিয়া রাখিলে সেই রুদ্ধ জল যেমন সর্ব্বদাই নির্গমমার্গ অন্বেষণ করিতে থাকে, এবং অধিক দিন রুদ্ধথাকা হেতু ক্রমশঃ তাহা পূতিগন্ধময় হইয়া উঠে; আর কোন প্রকারে একটু ফাঁক পাইলেই সমস্ত বাধাকে সবেগে ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং চারিদিকে সেই পঙ্কিল গন্ধ বিস্তার করে; সেইরূপ বঙ্কিমের চাবুকের ভয়ে যে শ্রেণীর সাহিত্য সে সময়ে সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ্য-ভাবে দেখা দিতে সাহস করে নাই, আজ সেই শ্রেণীর সাহিত্যের পঙ্কিল পূতিগন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সময়ের গতি, স্রোতের গতি রোধ করাও কঠিন; রোধ করিতে হইলে খুব কঠিন বাঁধের প্রয়োজন; অতি পবিত্র, অতি শক্তিমান লেখকের প্রয়োজন; বোধ করি, তাহা

এখন আর নাই ; নতুবা বাঙ্গালা সাহিত্যে আজ এত পঙ্কিলতা, এত পূতি গন্ধ কেন ?

ক্লাশে শিক্ষকের সমক্ষে ছাত্রেরা গোল করিলে, ক্লাশের শিক্ষকের অযোগ্যতার দরুণ নিন্দা হয়। আমরা কি তাহা হইলে এই কদর্য্য সাহিত্য প্রসারের দরুণ বর্ত্তমান সাহিত্য রথীবৃন্দকে দোষ দিতে পারিব না ? হয়তো প্রসঙ্গটা বিষয়ের গুরুত্ব বশতঃ একটু মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে। তবে এটা অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে এই উক্তি ব্যক্তিগত ভাবে প্রযুক্ত, সমগ্র রবীন্দ্রযুগের সাহিত্যিকের উপর সমষ্টিগত ভাবে প্রযুক্ত নহে। অধিকন্তু শরৎ সম্প্রদায়ের হাতে সাহিত্যিক-পঙ্কিলতা-অবলম্বনে যাহা বলিলাম তাহা স্বমতের অভিব্যক্তি মাত্র ; সর্ব্বজনানুমোদিত মত নহে। শরৎ চন্দ্রের অনুপম শিল্প-নিপুণতা বা বিশিষ্ট প্রতিভাশক্তি যে অবিসংবাদিত—তাহার উল্লেখ, এবং শরৎ চন্দ্রের সম্বন্ধে ভিন্ন মতেরও উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রযুগের সাহিত্য সেবীর সংখ্যা এত অধিক যে তাঁহাদের সকলের রচনার বিস্তৃত অনুশীলন করা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। কিন্তু কয়েকজন সাহিত্যসেবী এই যুগের অতি উজ্জ্বল রত্ন ; তাঁহারা এক একজন একএকবিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন। এস্থলে আমরা মাত্র জন কয়েক বর্ত্তমানযুগের বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীর নাম উল্লেখ করিব—

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭)

বঙ্গসাহিত্যে শ্লেষ রচনায় সিদ্ধহস্ত, হিতবাদীর ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—ডিটেক্‌টিভ গল্প দুইভাগ, মিঠে-কড়া, পেনেলপ্রসঙ্গ প্রভৃতি প্রণেতা। অল্পবয়সে পরলোকগমন

না করিলে বঙ্গভাষা ইঁহার নিকট হইতে আরও কত অমূল্য রচনা লাভ করিতে পারিত। এতদ্ব্যতীত ইনি বিদ্যাপতির পদাবলীর এক সটীক সংস্করণ প্রণয়ন করেন। "ইনি যেরূপ সুলেখক, সেইরূপ সুরসিক ও সুবক্তা ছিলেন।"

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১—)—

নিগূঢ় ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানকারী, গৌড়ের বহুলুপ্ত তথ্য আবিষ্কার কর্ত্তা—সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাশিম, গৌড়লেখমালা, সীতারাম প্রভৃতির রচয়িতা।

রায়বাহাদুর জলধর সেন (১৮৬১—)

বর্ত্তমানযুগের খ্যাতনামা প্রবীণলেখক রায়বাহাদুর জলধর সেন—হিমালয়, বিশুদাদা, অভাগী, বড়বাড়ী প্রভৃতি প্রণেতা; ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সুযোগ্য সম্পাদক।

বিবেকানন্দ স্বামী (১৮৬২-১৯০২)

ধর্ম্মবিষয়ক বহু প্রবন্ধলেখক, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে উভয়ত্র প্রখ্যাত-যশাঃ নরেন্দ্রনাথ দত্ত; উত্তরকালে ইনি বিবেকানন্দ স্বামী নামেই সমধিক পরিচিত। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, পত্রাবলী, পরিব্রাজক, চিকাগো লেকচার, বর্ত্তমান ভারত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভৃতি গভীর গবেষণাপূর্ণ বহুপুস্তক ইঁহার রচিত। অতি অল্পবয়সে দেহত্যাগ না করিলে ইঁহার দ্বারাও দেশের আরও বহুবিধ উপকার সাধিত হইত

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (১৮৬২—)—

দক্ষিণাপথ ভ্রমণ, রামানুজ চরিত, শঙ্করাচার্য্য চরিত প্রভৃতি প্রণেতা শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬২—)—

প্রবীণ সাহিত্যিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার—বর্ত্তমান যুগের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। প্রহসন, গল্প, উপন্যাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, কাব্যালোচনা—সকল বিষয়ের রচনাই ইঁহার বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়।

দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৮৬৩—)—

পৃথিবীর ইতিহাস, লক্ষ্মণ সেন; বাঙ্গালীর গান, দ্বাদশনারী, রাণী ভবানী, স্বাধীনতার ইতিহাস, এনক আর্ডেন, লোকারণ্য, রাজা রামকৃষ্ণ, সাধনা, সুবর্ণ বলয়, সৎপ্রসঙ্গ, সুখ ও শান্তি প্রভৃতি প্রণেতা—দুর্গাদাস লাহিড়ী।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৩-১৯২২)

বর্ত্তমান যুগের বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক বহুপ্রবন্ধলেখক ভূতপূর্ব্ব আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী—জিজ্ঞাসা, মায়াপুরী, কর্ম্মকথা, জগৎকথা, জড়বিজ্ঞানের ও উচ্চদর্শনের জটিল তত্ত্বের উৎকৃষ্ট সমাধান প্রভৃতির রচয়িতা। ইনি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, তত্ত্বকথা, প্রত্নতত্ত্ব, ইত্যাদি অনেক বিষয়েই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইঁহার রচনা প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণ বিশিষ্ট ও ওজস্বী। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ইঁহার নীলাম্বরী, বিবিবউ, মুদ্রাদোষ, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রভৃতি আরও কয়েকখানি সুলিখিত গ্রন্থ আছে। সুনীতিবাবু বলিয়াছেন, "বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্ব তাঁহার প্রাঞ্জল রচনা রীতির সাহায্যে সহজ বোধ্য হইয়া ধরা দিয়াছে।"

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—(১৮৬৩—)—

বাঙ্গালা ভাষায় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাম নাটক ও

প্রহসন রচনার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহার ভাষাও অতিশয় প্রাঞ্জল এবং মর্ম্মস্পর্শী। ইঁহার নারায়ণী নামক উপন্যাস জটিল গল্পাংশ-সম্বলিত।

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪)—

বাঙ্গালার উজ্জ্বলতম রত্ন, বাণীর বরপুত্র স্যর আশুতোষ বঙ্গভাষায় কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা না করিলেও তিনি বঙ্গভাষার একজন একনিষ্ঠ সেবক, সন্দেহ নাই। তাঁহারই প্রচেষ্টার ফলে আজ বঙ্গভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, ও এম, এ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত (১৮৬৫—)

দুলালি, মন্ত্রের সাধন, বঙ্গের শেষ বীর, জ্যোতির্ম্ময়ী, চিত্রা ও গৌরী, মিলন মন্দির, মোহন মালা, পারিজাত মালা, হেমহার, ফুল, ফুলের বাগান, সাহিত্যসাধনা, ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালাসাহিত্য, বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিম, রাণী ভবানী, প্রতিভাসুন্দরী, কামিনী ও কাঞ্চন, রামকৃষ্ণ, ভক্তের ভগবান, প্রভৃতির লেখক ও অমর কবি শেক্সপীয়রের নাটকাবলীর অনুবাদক—রায় সাহেব হারাণ চন্দ্র রক্ষিত।

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী (১৮৬৫-১৯০২)

বঙ্কিমচন্দ্র, গৃহলক্ষ্মী, দম্পতির পত্রালাপ, হিতকথা প্রভৃতি প্রণেতা গিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরী।

দীনেশচন্দ্র সেন—(১৮৬৬—)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের বর্ত্তমান স্তম্ভস্বরূপ প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন—ওপারের আলো, রামায়ণী কথা, নীলমাণিক, সতী, বেহুলা, ফুল্লরা, মুক্তাচুরি,

সুকথা, জড়ভরত প্রভৃতির রচয়িতা। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে ইঁহার গ্রন্থই প্রামাণিক। এ বিষয়ে অধিক বলিতে গেলে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করা হইবে। ইঁহার রামায়ণী কথার ভাষা অতি সুললিত, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। এই পুস্তকে তিনি মূল বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি অতি সুচারুরূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-)—কায়স্থের জাতীয় ইতিহাস, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রভৃতির রচয়িতা, বিশ্বকোষ সম্পাদক, বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু। ইঁহার অমরকীর্ত্তি বিশ্বকোষ।

রমণীমোহন মল্লিক (১৮৬৬—১৯০৫)—জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস, প্রাচীন স্ত্রীকবি, বলরাম দাস, মুসলমান কবি, শশিশেখর, নরোত্তমদাস, নবীন সম্রাট প্রভৃতি প্রণেতা।

পঞ্চানন তর্করত্ন (১৮৬৬-)—বর্ত্তমানে শ্রীমদ্ ভট্টপল্লীর শ্রেষ্ঠরত্ন। ইনি বহু সংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া বঙ্গভাষার সম্পদবৃদ্ধি করিয়াছেন। অত্রি সংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, রত্নাবলী, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্ভগবতী গীতা, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র প্রভৃতি ইঁহা কর্ত্তৃক অনূদিত। এতদ্ভিন্ন অধ্যাত্ম রামায়ণ কাশীখণ্ড, শ্রীমদ্ভাগবত, মনুসংহিতা, দশকুমার চরিত, যোগবাশিষ্ঠ, হারীত উষন প্রভৃতি ষোড়শ সংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, কূর্ম্ম, শিব, মার্কণ্ডেয়, বৃহন্নারদীয়, সৌর, বৃহস্পতি, দেবীভাগবত, উৎকলখণ্ড, দেবীপুরাণ, পদ্মপুরাণ, কালিকাপুরাণ, বাল্মীকীয় রামায়ণ প্রভৃতি নব্য প্রাচীন বহুতর গ্রন্থানুবাদ ইঁহারই সম্পাদিত। অধিকন্তু, সংস্কৃতের ছায়াবলম্বনে মালতীমাধব নামক একখানি

উপন্যাস, বিদ্যাপতির পদাবলীর টীকা সমালোচনা ও অলঙ্কার নির্ণয় এবং সাংখ্যদর্শনের বঙ্গানুবাদ—এ সব ইঁহারই রচনা। এতদ্ব্যতীত অনেক মৌলিক প্রবন্ধও নানা মাসিক পত্রে সময়ে সময়ে প্রকাশিত করিয়াছেন।

পাঁচকাড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭—১৯২৩)—উমা, রূপ-লহরী প্রভৃতি উপন্যাস প্রণেতা, নায়কের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদক—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে যথার্থ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁনি আইন-ই-আকবরীর একটী অনুবাদ ও চৈতন্য চরিতামৃতের একটী সংস্করণ মুদ্রিত করেন এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছেন।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯২৯)—প্রেমের কথা, সাতনরী, ফোয়ারা, পাগলাঝোরা, কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব, অনুপ্রাস, ব্যাকরণ বিভীষিকা, বানান সমস্যা, সখী, ছড়া ও গল্প, সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা, ককারের অহঙ্কার, আহ্লাদে আটখানা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহার রচনা সরস অথচ সারগর্ভ এবং গভীর গবেষণাপূর্ণ।

জগদীন্দ্র নাথ রায় (১৮৬৮—১৯২৫) সন্ধ্যাতারা, নূরজাহান, শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি প্রণেতা জগদীন্দ্র নাথ রায়। খুব অল্পসংখ্যক ধনী-লোকেই বাণী-পরিচর্য্যা করিয়াছেন; ইনি সেই স্বল্পসংখ্যকের মধ্যে একজন।

জগদানন্দ রায় (১৮৬৯—)—খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক রায়সাহেব জগদানন্দ রায়—বৈজ্ঞানিকী, প্রাকৃতিকী, গ্রহনক্ষত্র, জগদীশ চন্দ্রের আবিষ্কার, গাছপালা প্রভৃতি প্রণেতা।

সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২)—

ইনি একজন খ্যাতনামা সংবাদ-পত্র-সেবী। ইনি আজীবন বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। দেশের কথা, ঝান্সীর রাজকুমার, মহামতি রাণাডে, বাজীরাও প্রভৃতি ইঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

রামপ্রাণ গুপ্ত (১৮৬৯—)

মোগল বংশ, পাঠান রাজবৃত্ত, হজরত মহম্মদ, ইসলাম কাহিনী প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি একজন একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবী ছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রিয়াজুস সালাতিনের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৬৯-১৯২১)

বিবিধ ক্ষুদ্রগল্প রচয়িতা, সাহিত্য নামক মাসিক পত্রের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদক ও একজন নিপুণ, নির্ভীক এবং নিরপেক্ষ সাহিত্য-সমালোচক—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সাহিত্যের আসরে ইঁহারও আসন যথেষ্ট উচ্চে। ইনি কল্কিপুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করেন। বঙ্গভাষায় সুন্দর বক্তৃতা করিবার ক্ষমতাও ইঁহার যথেষ্ট ছিল।

দীননাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭০—)

'চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রবর্ত্তনের জন্য দীননাথের নাম অতি প্রসিদ্ধ। এই পত্রে এক্ষণে স্থানীয় দেওয়ানী আদালতের যাবতীয় নিলামী ইস্তাহারের প্রচার হয়। এতদ্ব্যতীত দীননাথ বহু প্রবন্ধও অন্যান্য সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

কেদারনাথ মজুমদার (১৮৭০—)

সারস্বত কুঞ্জ, ঢাকার বিবরণ, ময়মনসিংহের বিবরণ, ময়মনসিংহের ইতিহাস, চিত্রা প্রভৃতি প্রণেতা—কেদার নাথ মজুমদার।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (১৮৭০—?)

পালিভাষায় সুপণ্ডিত, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্রও মাতৃভাষার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। ইহার রচিত—ভবভূতি, বুদ্ধদেব, আত্মতত্ত্বপ্রকাশ—বঙ্গভাষায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—(১৮৭২-১৯৩১)—সিন্দুর কৌটা, নবকথা, গহনার বাক্স, অদৃষ্ট পরীক্ষা, বিলাত ভ্রমণ, বলবান জামাতা, রমাসুন্দরী, নবীন সন্ন্যাসী, ষোড়শী, অভিশাপ, রত্নদীপ, মনের মানুষ, গল্পবীথী, দেশী বিলাতী, বিলাত ভ্রমণ, আরতি, সত্যবালা, পত্রপুষ্প প্রভৃতি বহু উপন্যাস ও গল্পরচয়িতা—প্রভাতকুমারমুখোপাধ্যায়। ইঁহার সমধিক খ্যাতি ছোট গল্প রচনার জন্য।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৮৭৬—) দগ্ধহৃদয়, চোরাবালী, নিরুদ্দেশ, ঋণপরিশোধ, স্নেহের অত্যাচার, আষাঢ়ে গল্প, উত্তরাধিকারী, রায়বাহাদুর, প্রত্যাবর্ত্তন, বিপত্নীক, অধঃপতন, নাগপাশ প্রভৃতি বহু উপন্যাস প্রণেতা ও বসুমতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭—)

যমুনা পুলিনের ভিখারিণী, চোরকাঁটা, পঙ্কতিলক, আগুনের ফুল্‌কি, সওগাত, পুষ্পপাত্র, দোটানা, মুস্কিল্লান, যা নয় তাই, ভাতের জন্ম কথা, ধোঁকার টাটি, হেরফের প্রভৃতি উপন্যাস প্রণেতা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার রচিত সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিম প্রবন্ধ, মেঘদূত, মাঘ প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যের সমালোচনা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। লিখন সৃষ্টির ইতিহাস ইঁহার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রথমে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ ক্লাসের শিক্ষক হ'ন ; পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হ'ন।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (১৮৭৭-)—যে কয়জন বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন অমূল্যবাবু তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। ইনি ২৬টী ভাষায় ব্যুৎপন্ন; তন্মধ্যে প্রাকৃত ভাষায় বিশেষজ্ঞ বলিয়া ইঁহার সমধিক প্রসিদ্ধি। ইঁহারই সম্পাদকতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে শ্রীকৃষ্ণবিলাস এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী হইতে 'শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত' প্রকাশিত হইয়াছে। বহুদিন যাবৎ ইনি বিদ্যাসাগর কলেজের গৌরব কেতন।

নগেন্দ্রবালা মুস্তফী সরস্বতী (১৮৮১-১৯১০)—নগেন্দ্রবালা মুস্তফী সরস্বতী—দানবনির্ব্বাণ, ঊষাপরিণয়, মর্ম্মগাথা, চামেলী, নারীধর্ম্ম, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, অমিয়গাথা, শিশুমঙ্গল, ধবলেশ্বর প্রভৃতি রচয়িত্রী।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২)

সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্তের সুযোগ্য পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙ্গালায় এক অপূর্ব্ব ঝঙ্কারময়ী কবিতার প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও তাঁহার রচিত দু'একখানি বাঙ্গালা উপন্যাসও আছে—ভুল-ভাঙ্গা, জন্মদুঃখী ডঙ্কনিশান।

বর্ত্তমান যুগের অন্য লেখকগণ—

এতদ্ব্যতীত অবিনাশচন্দ্র দাস, ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, কেদার না। বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু (পরশুরাম), প্রমথ চৌধুরী (বীরবল), বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদার নাথ মজুমদার, জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, কুমার দেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার, চিত্তরঞ্জন দাস, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম রচয়িতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ভূপ্রদক্ষিণ লেখক চন্দ্রশেখর সেন, নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বিদ্যাভূষণ) বিনয়কুমার

সরকার, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, পাঁচকড়ি দে, যতীন্দ্রনাথ পাল, ফণীন্দ্রনাথ পাল, মন্মথনাথ ঘোষ. মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, মুশারাফ হোসেন, বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই এই যুগে বঙ্গসাহিত্যের অল্পাধিক গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

কৈফিয়ৎ—

উপসংহারে বক্তব্য এই যে ইতিপূর্ব্বে যে সমুদয় সাহিত্যিকের রচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনুশীলিত হইয়াছে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ সবস্থলে ঠিক তারিখ হিসাবে পর পর করা হয় নাই। সন তারিখের অনুক্রম রক্ষা করিয়া সাহিত্যিকদিগের রচনা পর পর অনুশীলন করার অসুবিধাও অনেক। হয়তো দু'তিনজন সাহিত্যিক একসনে জন্মগ্রহণ করিয়াও সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে একসনে অবতীর্ণ হন নাই। কেহ বা পরিণত বয়সে আসরে নামিয়াছেন, কেহ বা অল্পবয়সে অধ্যয়ন কালেই সাহিত্যের আসরে সাহিত্যিকের বেশে দেখা দিয়াছেন (আবার অনেকের আবির্ভাব কাল অজ্ঞাত)। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক এই প্রবন্ধে লেখকগণের আবির্ভাবকালের অনুক্রম হিসাবে যথাসাধ্য পর পর অনুশীলন করিয়াছেন। কিন্তু কয়েকটি লেখকের আবির্ভাব কাল ঠিকনির্ণয়ে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহাদিগের রচনা অত্রপ্রবন্ধে পৌর্ব্বা-পর্য্য-ব্যতিক্রম ভয়ে অনুশীলন করিতে পারেন নাই। অতএব এই প্রবন্ধে কোন সাহিত্যরথীর নামের উল্লেখ না দেখিলে—কেহ মনে করিবেন না যে তাঁহার রচনা অকিঞ্চিৎকর; পরন্তু ইহাই বিবেচ্য

যে বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচয়িতা নিজের শক্তির অল্পতা বা অসতর্কতা নিবন্ধন তাঁহার নামোল্লেখ করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। এ প্রবন্ধে সাহিত্য-সেবিগণের নামের উল্লেখ বা অনুল্লেখের অনুপাতে সবস্থলে তাঁহাদিগের যোগ্যাযোগ্যতা বিচার্য্য নহে।

সাহিত্যে লক্ষ্য করিবার জিনিষ আর একটী এই যে জনসমাজে যে সময়ে যা' রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, প্রচারপদ্ধতি, হাবভাব, বিলাস-কলা বা পোষাক-পরিচ্ছদের প্রচলন থাকে—সেই সেই সময়ের সাহিত্য-সেবিগণ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাহা লিপিবদ্ধ করেন। মুসলমান যুগের লেখকগণের রচনায় এই জন্যই এত আরবী পার্সী শব্দের প্রয়োগ ও অল্লাধিক মুসলমানী আচার ব্যবহার বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজ লেখকদিগেরযুগ হইতে বাঙ্গালাভাষায় ইংরেজী শব্দের প্রয়োগও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপাইতেছে। [বাঙ্গলাভাষায় প্রচলিত ইংরেজি শব্দের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য] প্যারীচাঁদের আলালে বা কালীসিংহের হুতোমে তৎতৎসময়ের প্রচলিত রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, হাবভাব, বিলাসকলার ও পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাই। আবার বহুবিবাহ নিষেধ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন লইয়া বিদ্যাসাগর যখন সমাজে তুমুল আন্দোলন তুলিলেন, সাহিত্যরথীবৃন্দ তাহা লিপিবদ্ধ করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। কাব্যে ও নাটকে দীনবন্ধু, রাজকৃষ্ণ রায়, হেমচন্দ্র, অমৃতবসু প্রভৃতি, প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি, উপন্যাসে বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই সেই সাময়িক বিষয় অবলম্বনে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদ, স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতিও যথাকালে প্রবন্ধের ও উপন্যাসের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বঙ্গীয় গদ্যের বর্ত্তমান অবস্থা অনুশীলনকালে শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার বঙ্গবাণীতে লিখিয়াছেন: "বঙ্গীয় গদ্য ক্ষুদ্র গল্প, উপন্যাস, জীবনবৃত্ত, এবং ঐতিহাসিক-সামাজিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যেভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে মন পুলকিত হয়। বাঙ্গালা গদ্যও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিতেছে! পূর্ব্ব পূর্ব্ব লেখকগণ, বিশেষতঃ, কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দ কৃষ্ণপ্রসন্ন প্রভৃতি বক্তৃতায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রামপ্রাণ গুপ্ত, নিখিল নাথ রায়, বিজয় চন্দ্র মজুমদার, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নগেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি ইতিহাসে, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি সাহিত্য আলোচনায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, সীতানাথ দত্ত, তারক চন্দ্র দাসগুপ্ত, কালীবর বেদান্তবাগীশ, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, তারাকিশোর চৌধুরী, বিপিন চন্দ্র পাল, বিনয় কুমার সরকার, রাধা-কমল মুখোপাধ্যায়, বিজয়রত্ন বসু প্রভৃতি দার্শনিকগ্রন্থে এবং বিবিধ প্রবন্ধাদিতে বঙ্গসাহিত্যকে নব নব শক্তিসামর্থ্যে বলীয়ান করিয়া আসিয়াছেন। তবে, অনেকের মধ্যে যে, সাহিত্য-ভাষার রীতি, সাহিত্য-আদর্শ বা সাহিত্য-আচার বলবান হইতে পারিতেছে না, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কালীপ্রসন্ন ঘোষের নিভৃতচিন্তা প্রভৃতির মধ্যে পদ্মা-নদীর ন্যায় উদাত্তগম্ভীর শব্দনিনাদ প্রকটিত। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাদি এবং 'পাঞ্চভৌতিক ডায়ারীতে' ক্ষিতি, জল, বায়ু অগ্নি এবং আকাশ তত্ত্বের সংমিশ্রণে যে ভাষা বহিয়াছে, উহা বঙ্গভাষার ঐশ্বর্য্যরূপে তাহার সাহিত্য-ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকিবে। তদ্ভিন্ন, অনেকের মধ্যে 'খাঁটি' বাঙ্গালার স্বপ্ন-নিশ্বাসী স্ফূর্ত্তি এবং তীক্ষ্ণতাও মার্জ্জিতভাবে অভিব্যক্ত

হইতেছে। বর্ত্তমান বঙ্গভাষার শক্তি-পরিচয়-প্রার্থী ব্যক্তি চিরকাল ইঁহাদের সমক্ষে শিষ্যভাবে উপস্থিত হইতে হইবে। সত্য বটে, বাঙ্গালায় ধর্ম্ম, সমাজ কিংবা দর্শন সম্বন্ধে কোন সমুচ্চ মৌলিক গ্রন্থ এখনও রচিত হয় নাই। তাহার কারণ, আমাদের ধর্ম্ম, দর্শন বা সমাজের মূল শিকড় এখনো প্রাচীন সংস্কৃতের মধ্যেই নিহিত। সংস্কৃতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা এবং টীকা টিপ্পনী করিয়াই সম্প্রতি বুঝিতে হইতেছে। * * *

এখন যাবৎ বঙ্গীয় গদ্যের সমুচ্চ পরিণতি, কিংবা ইংরেজী ফরাসী বা জর্ম্মণভাষার গদ্যের সহিত সমকক্ষতা সিদ্ধ হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যের পরকীয় কিংবা নিজস্ব সত্য এবং সৌন্দর্য্য বস্তুর ভাণ্ডার কোন বিশিষ্ট সাহিত্যের সমপরিমাণ হওয়া দূরের কথা, এখন যাবৎ তাহার সমজাতিত্বও লাভ করিতে পারে নাই। বিশিষ্ট লেখনী সংখ্যার অভাবই উহার প্রধান হেতু। বাঙ্গালীর প্রতিভা আছে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রতিভা কোটী কোটী মনুষ্য সংখ্যার অনুপাতে, কি কর্ম্মশীলতায়, কি ঐকান্তিকতায়, কোন মতেই যথেষ্ট নহে। বিশেষতঃ বাঙ্গালী লেখকের ভাবনাশক্তি অথবা উহার প্রসার তুলনায়, তাহার বস্তু-বুদ্ধি বা শিল্পবুদ্ধি সমধিক দুর্ব্বল। * * *

বাঙ্গালীর সমাজে এবং সাহিত্যে এখন যাবৎ বৈজ্ঞানিক যুগ বা বৈজ্ঞানিক আদর্শের প্রবর্ত্তনা হয় নাই। এই বিজ্ঞানকে আমরা সকলদিকে মনুষ্যের উদ্ধার কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করি। * * * বিজ্ঞানই (বিজ্ঞান বলিতে ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি) মনুষ্যের এই অন্ধতা অপনোদন করিতে সমর্থ! মনুষ্য মনের প্রকৃত স্বাস্থ্য এবং মনুষ্যের পরমার্থ উভয়ই বিধান করিতে সমর্থ! * *

বঙ্গসাহিত্যে শেলী বায়রণ বা মিল্‌টন-প্রকৃতির সাধক জন্মিয়াছেন। কিন্তু শেক্ষপীয়রের স্থায় সর্ব্বতোমুখী শক্তিসম্পন্ন কোন কবির জন্ম হয় নাই। সুতরাং সেক্ষপীয়রের হস্তে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য যেই অতুলনীয় সামর্থ্য লাভ করিয়াছে, জীবনের ঘন-গভীর তত্ত্ব-রসে ওতঃপ্রোত হইয়া সর্ব্ববিধ অর্থ প্রকাশে যেই পুষ্কল ঐশ্বর্য্য এবং পেশলতা লাভ করিয়াছে, বঙ্গের অদৃষ্টে এখনও তাহা ঘটিতে পারে নাই। শেক্ষপীয়রের অন্তরাত্মা যেই অনুপম প্রচণ্ড শক্তি, এমন কি বর্ব্বরতার আশ্রয় করিয়া, অনির্ব্বচনীয় এবং অস্পষ্টতম অর্থকেও অধিকার করিতে এবং ঘনমুষ্টিনিবদ্ধ করিতে চাহিয়াছে, মনুষ্যের হৃদয়কে গভীর গভীরতর অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যেই সারস্বত পন্থা প্রদর্শন করিয়াছে, বঙ্গভাষা এখনো সেই পন্থার সম্যক পরিচয় পায় নাই। * * *

আবার, জাতীয় স্বাধীনতাই জাতীয় সাহিত্য উন্নতির জননী। পরাধীন দেশের সাহিত্য সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করা দূরে থাকুক, তাহাকে পদে পদে উপেক্ষিত, বিধ্বস্ত এবং হীনতাগ্রস্ত হইতে হয়। * * রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এদেশের অন্য কোনও সাহিত্যসেবক সাহিত্যের জন্য সমগ্রভাবে প্রাণমন উৎসর্গ করিতে পারেন নাই। * * বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালী জাতির এবং বঙ্গসমাজের সমস্ত ভবিষ্যৎ আশাভরসা একান্তভাবে তাহার সাহিত্য-বিকাশের উপরেই নির্ভর করিতেছে। * *

প্রত্যেক বাঙ্গালী লেখককেই তাঁহার এই মহৎ কর্ত্তব্যে এবং মহত্তম দায়িত্বে জাগরিত হওয়া আবশ্যক। * * বর্ত্তমান গ্রাম্য সমাজের দুর্ভেদ্য ভাবুকতা-গভীর 'সনাতন' দুর্গমধ্যে সুখাসীন থাকিয়াই, প্রাচীন আদর্শের

স্মৃতি-দীক্ষা প্রাপ্ত 'পণ্ডিত'গণ এবং 'মৌলভী'গণ এই শাসন কার্য্য সমাধা করিতেছেন !"

অন্যত্র : "কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্ব্বে যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়, * * এবং বাঙ্গালা গদ্যে 'প্রতাপাদিত্য চরিত' ও 'তোতার কাহিনী' লিখিত হয়, অথবা পরে যখন বাঙ্গালাশিক্ষার্থীর সাহায্যের জন্য 'প্রবোধচন্দ্রিকা' রচিত হইয়া পাঠ্যগ্রন্থের স্থান গ্রহণ করে, তখন কেহ স্বপ্নে ভাবিতে পারে নাই যে শতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই বাঙ্গালী তাহার সাহিত্য-হৃদয়কে বিশ্বদরবারে উপস্থিত করিবার জন্য যোগ্যতা লাভ করিবে ! উহার পর, ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে, যখন বাঙ্গালীর 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' প্রথম প্রকাশিত হয়, কিংবা ৪১ বৎসর পূর্ব্বে যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রথম প্রচারিত হয়, তখনো কেহ আশা করিতে পারে নাই যে, বাঙ্গালীর হৃদয় এত অল্পকালের মধ্যে ব্রহ্মতালে বাজিয়া উঠিয়া বিশ্বসাহিত্যমণ্ডলীর বিস্ময়স্থলী হইতে পারিবে ! কিন্তু, বিধাতার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে। অদ্য আমাদের সমবেত হৃদয় ঐক্যতানে উহা অনুভব করিতে পারিতেছে বলিয়াই আনন্দ !"

আরও বলিয়াছেন : "বঙ্গভাষা, নিঃসন্দেহে, নানাভাষার শক্তি-সঙ্গমে, নানা বাক্যরীতীর গুণসাধর্ম্ম্যে শক্তিমতী হইয়াছেন। রামমোহন রায় ও টেকচাঁদ, বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার বা কালীপ্রসন্ন, কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দ বা কৃষ্ণপ্রসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র চন্দ্রনাথ বা হরপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল, কিংবা নব্য লেখকগণ, যে স্বরগ্রামে এবং বাক্য-প্রণালীতে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তাহা এক নহে—এক প্রকৃতিও নহে, প্রত্যেকেই আত্মনিষ্ঠায় ভাবপ্রকাশের ন্যূনাধিক নব পন্থায় অগ্রসর হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য প্রত্যেকের দ্বারাই উপকৃত। একদিকে

এই ভাষা যেমন স্থির ধীর এবং আর্য্যশব্দ বহুল ওজস্বী তরঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে, অন্যদিকে তেমনি সহজ সরল এবং প্রত্যক্ষ-পরিচিত বাক্যচ্ছটায় পরিস্ফূরিত হইতেছে! আবার তেমনিই মিষ্টমধুর মন্দাক্রান্তা গতি অবলম্বনে, কঙ্কণ কিঙ্কিণীর ঝঙ্কারে, সুখিনী এবং প্রমোদিনী হইয়াও চলিতেছে! * * রামমোহন ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সুস্থির আর্য্যপদ-বিন্যাসে, সরল ভাবরসের বিকাশে চেষ্টা করিয়াছেন; কেশবচন্দ্র প্রভৃতি বাগ্মী এই ভাষাকে দ্রুতবিলম্বী এবং ভক্তি উজ্জ্বলিত হৃদয়ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন; কালীপ্রসন্ন এই ভাষাকে উভয়গুণের সম্মিলনে—ভাবুকতায়, উজ্জ্বলভূষণপ্রভায় এবং গৌরবগর্ব্বে বহুমানিনী ও অধৃষ্যা শক্তিরূপে প্রকটিত করিয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সে শক্তিকেই বিরাট মূর্ত্তিতে এবং পরিচ্ছদে, বিপুল বঙ্গদেশ ব্যাপ্ত এই ছায়ালোকময়, সুখদুঃখময়, জ্ঞানকর্ম্মভক্তি এবং আলস্য বিলাসময় সপ্তকোটী বঙ্গবাসীর হৃদয়ে উদ্বোধিত করিয়া, উহাকে 'সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা'রূপে, 'বাঙ্গালীর বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তি' রূপে উদাত্তভাবে বন্দনা করিয়া গিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকগণ, নানাভাবে, তাঁহাকেই নিত্য এবং নৈমিত্তিক রাজসিক এবং সাত্ত্বিক, পরিচিত্ত এবঞ্চ অপরিচিতের সন্ধিভূমে কল্পনা পূর্ব্বক তাঁহার 'ভুবন মনোমোহিনী' রূপ স্বপ্ন দেখিতেছেন! ইঁহারা প্রত্যেকেই বহুরূপী বঙ্গসরস্বতীর সেবায়, অলঙ্করণে এবং পরিবর্দ্ধনে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তিই নিবিষ্ট অধ্যয়নে, বাক্য বিন্যাসের অন্তরালে এ সমস্ত বাণী-সাধকের হৃদয়স্পর্শ অনুভব করিয়া ধন্য হইতে পারেন; এবং উত্তরাধিকার সত্বের সুব্যবহার পূর্ব্বক সঞ্চিত সম্পত্তি হইতে লাভবান হইতে পারেন।"

বঙ্গসাহিত্যের এই নব-কলেবর সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত রাধাকমল

মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"আজ আমাদের এক নূতন জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, একটা সাহিত্যও এই জীবনকে আশ্রয় করিয়া অতি সত্য, অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাবে সৃষ্ট হইল,—মানুষের আত্মার প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিতে, মানুষ দীন হইলেও হীন নহে, হীনতার মধ্যেও আত্মার পরিপূর্ণ মহিমারও প্রকাশ হয়, এই বাণী নব-সাহিত্যে। * * *

প্রবীণ সম্পাদক বলিলেন, বকাটে ছেলের অপরিপক্ক জেঠামির সাহিত্যে অনধিকার প্রবেশ। এঁরা নূতন কাগজ করিলেন। সমালোচক বলিয়া উঠিল, এসব বেকার লোক সাহিত্যকে অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া বসিয়াছে। আর্টিষ্ট বলিলেন, এ সাহিত্য একেবারে নগ্ন ও অসভ্য, ইহাতে শিল্পের সৌন্দর্য্য নাই।

এত সমালোচনার কারণ হইতেছে এই নূতন গল্প উপন্যাসের ভাষা ও ঘটনা-বস্তুর সহিত রবীন্দ্র-সাহিত্য ও শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের একেবারে মিল নাই। * *

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত যে সকল নূতন মানুষকে সাহিত্যের আসরে আনিয়াছেন, তাহাদের দেহের ও মনের কদর্য্যতা, গ্লানি ও অপরিচ্ছন্নতা আমাদের কাহারও প্রীতিকর নহে। কিন্তু প্রীতি এক জিনিষ, অনুভূতি আর এক জিনিষ। এমন একটা সহানুভূতি তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, মানুষের হীনতা, বীভৎসতা, পঙ্গুতা, অন্ধতা আমাদের চোখে পড়ে না উজ্জ্বলভাবে উদয় হয় মানুষের একটা নিরাবিল মনুষ্যত্ব। * * *

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেই উল্‌কী কাটা সুরকীর কলের মজুরণী নেত্য আমাদের হিসাবে গৌরবময় জীবন অতিবাহিত করে না; কিন্তু তাহার জীবনের গোপন অনুচ্চারিত ব্যথা যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদের

হৃদয়ে মনুষ্যত্বের চিরন্তন প্রশ্ন জাগায় এটা সুনিশ্চিত। ঠনঠনের মুচীর মেয়ে পাঁচি সংস্কারের বশে তাহার ব্যর্থ-জীবনের সমস্ত বেদনাকে উপেক্ষা ও সমস্ত কামনাকে অস্বীকার করিয়া আপনাকে নির্ম্মমভাবে বঞ্চনা করিয়াছে, এবং জীর্ণ কস্থিতে আপনার লজ্জা আবরণ করিতে না পারিয়াও ভ্রাতাকে দারিদ্র্যের নিদারুণ লজ্জা ও পাপের স্পর্শ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সদা সচেষ্ট,—হ'লেই বা সে মুচিপাড়ার রণচণ্ডী কিন্তু সাহিত্যের আসরে সে ত একটি নিস্ফল-যৌবনা, মমতাময়ী ভগিনীরূপে দেখা দিল। যতদিন মনুষ্যত্ব আছে ততদিন ভগিনীর মর্য্যাদা, অন্ধকার অপরিসর গুণরাশিনাশী পঙ্কিল বস্তির মধ্যে অথবা বাধা-বন্ধনহীন ধনি-পরিবারের স্বচ্ছন্দ জীবনের মধ্যে তাহার প্রকাশ হউক, ইহাতে কিছু আসে যায় না।

শুধু দেখিতে হইবে ঘটনা-সংস্থানটা সহজ, সরল, সত্য হইল কিনা। শৈলজানন্দ অতসী ও অতসীর মার চিত্র আঁকিয়াছেন, কাঙ্গাল, উপায়হীন নারী যৌবনের ভাণ্ডারে ডাকাতি করিয়া রোগ ও দারিদ্র্য তাহাকে পথে বসাইয়াছে, সে ও তাহার ম্লানমুখী স্বামী-পরিত্যক্তা ভিখারিণী মাতা—দুই জনই নর্দ্দমার ফেনের দ্বারা লালিত পালিত। বাস্তবিক বস্তি-জীবন শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যের প্রত্যেকেরই লেখনীতে অতি স্পষ্ট, সহজ ভাবে ফুটিয়াছে।

তাই ভাষাও হইয়াছে তাঁহাদের নূতন রকমের। এক, ভাষার দিক হইতে ইহাদের দান বড় কম গৌরবের নহে। অচিন্ত্যবাবু বর্ণনা করিতেছেন—মাঠ ও বাজার। রেল-রাস্তা পেরলেই মাঠ,—সমস্ত হাওয়া একচেটে ক'রে রেখেছে। এ দিকের ঘেঞ্জি সহরগুলি ধোঁকে,—রে-পাওয়া সহর। শৈলজানন্দের সৃষ্ট—যমুনা-পাঁয়ের অন্ধ

কুঞ্জবিহারীর সহিত লখিন্দরের আলাপ অথবা ষোল-আনার কথোপকথন, ভৈরবতলার আলাপ প্রেমেন্দ্র মিত্রের লক্ষ্মীকান্ত শিবু অথবা পটলী-মুলোর কথাবার্ত্তা বাংলা সাহিত্যে নূতন জিনিষ। এ সকল ভাষা সতেজ, জীবন্ত, মর্ম্মস্পর্শী। তথাকথিত, কথিত ভাষার মত ইহা ন্যাকামিতে পূর্ণ নহে, খাঁড়ার মত ইহা কাটিতে কাটিতে চলে। মানুষ-গুলোর যেমনি শুক্নো খোসা-ওঠা মুখ, কোটরে-ঢোকা চোখ, রোগে, অতিশ্রমে, অত্যাচারে ঠোঁটগুলা তাহাদের যেমন বাঁকা, তীক্ষ্ণ, ভাষাও তাহাদের তেমনি শক্ত ও জোরালো। আধুনিক ছোট গল্পের অভ্যস্ত, চায়ের পেয়ালার উপর কথিত ভাষার মত হাল্কা ও ঠুন্কো নহে।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় গৌরব ইঁহাদের, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র অপেক্ষা ইঁহারা জীবনের জটিলতা ও বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাইয়াছেন। সাহিত্য-গুরু-গণের অপেক্ষা ইঁহাদের চিত্রপট অনেক বড়, অনেক রহস্যময়, অনেক নূতন। রবীন্দ্র তাঁহার দামিনী শচীশ, শ্রীবিলাস জ্যাঠামহাশয়, ভাই ফোঁটা প্রভৃতি গল্পে ও নানা গল্প কবিতায়, ও শরৎচন্দ্র তাঁহার শ্রীকান্ত মহেশ ও দেবদাসে বাংলার গল্প-সাহিত্যে যে নূতন ধারার সন্ধান করিয়াছিলেন, সেই ধারাই—এই নূতন লেখকগণের রচনায় পূর্ণ ও বিচিত্রভাবে বহিয়া চলিয়াছে,—নিত্য নূতন জীবন-রসের ঢেউ তুলিয়া।

সাহিত্য যখন রাজবেশ এবং উকীল ব্যারিষ্টার কেরাণীর ধড়াচূড়া ত্যাগ করিয়া একবারে কাঙ্গাল সাজিয়া দিন-মজুরের সহিত রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল, ঘটনা ও রসের বৈচিত্র্য ত হইবেই। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গল্প-সাহিত্যের প্রধান বিড়ম্বনা বার বার এই হয় যে, শিল্পীর অনুযায়ী ঘটনার সমাবেশ করা যায় না। * * * রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি ও চোখের বালি এবং শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন সংস্কারের

সীমানা যাহাতে অতিক্রম না হয় এই সাবধানতা ও আড়ষ্টতায় কত না ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সমাজবদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীর চরিত্রকে বাঁচাইতে যাওয়ার চেষ্টাটাই রস-সৃষ্টির পক্ষে খুব মারাত্মক জিনিষ। আমাদের প্রধান উপন্যাস-রসিকগণের গোড়াকার বাধা হইয়াছিল ইহাই।

আমাদের নব্য সাহিত্যিকগণ এই বাধা হইতে মুক্ত। যাহাদের জীবন তাঁহারা আঁকিতেছেন বা সমালোচনা করিতেছেন তাহারাই যে একবারে বে-পরোয়া সংসারের পরিত্যক্ত টুটা-ফুটার দল। সমাজ যে ইহাদিগকে ঘৃণ্য দূষিত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে, তাই ইহাদেরও সমাজের বিরুদ্ধে অভিমান। যদি বিদ্রোহী না হয় তবে পশুর মতন হীন, পঙ্গু হয় ইহারা।

অতিশ্রম, অনশন ও অত্যাচার ইহাদের মানসিক ও নৈতিক অবনতি আনে—ইহা অনিবার্য্য। তাই পানওয়ালী রুক্‌মা, বামুনদিদি হোটেলওয়ালী, পাঁকের পটলী, মজুরণী দরদিয়া, গৃহহীন দাসী, কলঙ্কিতা।

সমালোচকগণ বলেন—এই অতি-আধুনিক মানবের আদিম প্রবৃত্তিকে নগ্ন করিয়া দেখাইয়াছে। নূতন সাহিত্যে যৌনপ্রেম সময়ে সময়ে কর্দ্যভাবে অঙ্কিত আছে সত্য। তাহার প্রধান কারণ, যাহাদের জীবনে আলো ও আনন্দ নাই, প্রেম তাহাদের প্রাথমিক ক্ষুধা না হইয়া পারে না। কিন্তু প্রেম এ সাহিত্যের একমাত্র, এমন কি প্রধান উপকরণও নহে। বরং সমাজের ভাঙ্গাগড়াকে আশ্রয় করিয়াই যৌনপ্রেম ফুটিয়াছে। মানুষের সঙ্গে মানুষ শতগ্রন্থিতে আবদ্ধ। সেখানে কোন একটি গ্রন্থি শিথিল হয়, বা কেহ উহাকে টানিয়া ছেঁড়ে, সেই খানেই এক একটি Tragedyর সৃষ্টি; গৃহ বা সমাজের ভাঙ্গন এই নূতন

সাহিত্যের প্রধান উপকরণ হইয়াছে। পূর্ব্বেকার সাহিত্যের ঘটনাবস্তু অধিকাংশই সাধারণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন হইতে সংগৃহীত। * * * নূতন সাহিত্যে বাস্তবিক ঘটনাবস্তুর বৈচিত্র্যের সীমা নাই।

এই খানেই এ সাহিত্যের প্রধান গৌরব। জীবনের যে দিকটার সহিত আমরা এতদিন সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে পারি নাই, যেখানে শত মানুষ তাহাদের অশ্রান্ত অশ্রুজল, শুষ্ক উদাসীন কঠিন মাটির উপর ফেলিতেছে, সান্ত্বনা দিবার তাহাদের কেহ ছিল না, নবীন সাহিত্যিক আমাদিগকে সঙ্গী করিয়া সেই অভিশপ্ত ব্যর্থজীবনের মধ্যে লইয়া যাইতেছেন, অসংখ্য মানবের সন্তপ্ত হাহাকার দূরদূরান্তের ব্যর্থ ক্রন্দন শুনাইবার জন্য। যে সাহিত্য যত বেশী মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের গ্রন্থি অটুট করে, নূতন করিয়া তৈয়ার করে, তাহার তত মূল্য। নূতন সাহিত্যের একটা আত্ম-ভোলা, বিশ্বজয়ী অগাধ প্রেম আছে। সমাজ ও সাহিত্য উভয়ের পক্ষে এই প্রচণ্ড সহানুভূতি কম কল্যাণকর নহে।

শত বাধা বিঘ্ন দৈবদুর্ব্বিপাকে মানুষ সদাই ত হোঁচট খাইতেছে, ক্ষত বিক্ষত ও পঙ্গু হইতেছে। পঙ্গুকে গিরি-লঙ্ঘন করাইবার ভার সাহিত্যকে লইতে হয়। কারণ, যে পঙ্গু, হউক না সে অসহায় পদানত, ধূলায় মলিন, কিন্তু তাহার অন্তর বাহির যে সেই এক বিরাট মহৎ পুরুষের উপাদানে তৈয়ারী।

বাস্তবিক দুর্নিবার কলঙ্ক, দুরপনেয় কদর্য্যতা ও জন্মপঙ্গুতার মধ্যেও মানুষ যদি তাহার বৃহত্তর জীবনের ব্যাকুলতার পরিচয় দেয়, তাহার নিষ্পাপ মনুষ্যত্বের আহ্বান যদি গভীর দুরাশার অন্ধকার হইতেও শুনা যায়, তাহা হইলে ইহাই কি সর্ব্বাপেক্ষা মহিমার কথা হয় না? ইহার মূল্য যে দ্বিধাবিরোধহীন অনেক পুরুষ ও নারীর অপরীক্ষিত, সৌখীন

ধর্ম্ম ও সতীত্বের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। আবার যদি পতনের অতল সীমাহীন অন্ধকারে তাহারা একেবারে ডুবিয়া যায়, আর না মাথা তুলিতে পারে, আমরা কি সেই আশাহীন অতলের অগৌরবের মাঝে দাঁড়াইতে ব্যাকুল হই না! তাহারা ত মানুষ এবং তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া না বুঝিলে, না ভালবাসিলে আমরা যে অ-মানুষ থাকিয়া যাইব। দুঃখ, অতৃপ্তি, বিফলতা তাহা হইলে আমাদেরও হইবে। নূতন সাহিত্য দেশকে এই পাপ ও অকল্যাণ হইতে বাঁচাইয়া রাখুক।

* * * এই নবীন সাহিত্যের পুরোহিতদিগের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র হইয়াছেন দার্শনিক, বহুদর্শী। তিনি এই আন্দোলনকে আধ্যাত্মিকতার ছাপ দিয়াছেন। মহনীয় ভাবুকতা তাঁহার, অথচ বাস্তবতার উপর ঝোঁক ও আয়ত্ত তাঁহার কম নহে।

* * * শ্রীশৈলজানন্দ হইয়াছেন এই আন্দোলনের কথক ও প্রচারক। কথকের মতন তাঁহার বলিবার কমনীয় ভঙ্গী। মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধে অসাধারণ পারদর্শিতা তাঁহার! অবনত মানব-সমাজের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের তালে তালে তাঁহার নিপুণ লেখনী দ্রুত চলিতে থাকে। শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (খুনী আসামীর লেখক), শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সান্যাল ও শ্রীজগদীশ গুপ্ত গল্প-সাহিত্যে—এই নূতন পথেরই পথিক। সমাজের কুটিলতা, নির্ম্মমতা, নৃশংসতার মাঝে ইঁহারা কাঁদিয়াছেন এবং মানুষকে ধন্য মানিয়া সাহিত্যকে নূতন মহিমায় গৌরবান্বিত করিতেছেন।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্রভাবে এই আন্দোলনকে এখন পুষ্ট করিতেছেন। গীতি কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে সব দিকেই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার বেদের বাত্তাসীর চিত্র বাঙ্গালাসাহিত্যের একটী অপরূপ নূতন সম্পদ। সঞ্জী-

ওয়ালীর নিষ্ফল যৌবনের অপরিতৃপ্ত মমতা মুলো। দিন-মজুরের অসহায়তা ও ক্লেশ, একটা নূতন প্রকার ঘটনা বস্তু ও আবেষ্টনের মধ্যে অতি মনোরম হইয়াছে। ভাষা তাঁহার অতি সতেজ ও সর্ব্বতোমুখী, চিন্তা তাঁহার নূতন, শিল্পও তাঁহার অনবদ্য।

* * * হামসুনের Wanderersএর মত অচিন্ত্য সেনগুপ্তের বেদে ধারাবাহিকরূপে ঘটনার স্রোতে গা ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছে। গর্কীর গল্প-সমুদায়ের মতন প্রেমেন্দ্র মিত্রের পাঁক ও আগামী কাল, শৈলজানন্দের ষোল-আনা বা বাণভাসি নক্সা হিসাবে অতি রমণীয়। উপন্যাসের শিল্পপদ্ধতি বিচিত্রভাবে রুশিয়া, ফ্রান্স ও নরওয়েতে এখন প্রকাশ পাইতেছে। উপন্যাস এক কাঠামে গড়া কোন দেশে হয় নাই, হইতেও পারে না। বাঙ্গালার গল্প-উপন্যাসে নানা শিল্পপদ্ধতি অনুধাবন করাই বাঞ্ছনীয়। নূতন সাহিত্যিকগণের মধ্যে কেহ না কেহ ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে করিতে এমন একটি প্রণালী খুঁজিয়া পাইবেন যে, সত্যি সত্যি নূতন মানবের একটা epic মহাকাব্য তৈয়ারী হইয়া যাইবে। বঙ্গ-সরস্বতী কোন্ অজানা ভাবুকের গলায় বরমাল্য প্রদান করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন! এ মাল্যের কুসুম-সুরভি নন্দন কানন হইতে চয়ন করা নহে; জগতের যত ব্যথিত, দলিত হৃদয় শোণিত-রাঙ্গা হইয়া মাল্যের বিচিত্র কুসুম সাজাইয়াছে; মহামানবের অনাদি ক্রন্দনাশ্রুতে অভিষিক্ত মাল্যের ডোরখানি; স্পর্শ তাহার বিশ্বসৃষ্টির নিগূঢ় ব্যথার মতন সুতীক্ষ্ণ। এ মাল্য গ্রহণ করিবার জন্য কে প্রস্তুত হইতেছেন? কাহার এ মহাভাগ্য হইবে? আমরা তাঁহাকে অনতিদূর অতীত হইতে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিতেছি।

* * * বাংলার নূতন সাহিত্যে গরীবদিগের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা

ও সহানুভূতি দেখা দিয়াছে তাহা বহুজন ও লেখকের নিকট একটা ভঙ্গী বলিয়া মনে হইতে পারে।

* * * রাজা-রাজড়ার অলৌকিক কাহিনী—অথবা ড্রইংরুমের কৃত্রিম কথোপকথন আমাদের সাহিত্যে কমিয়াছে। জীবনের সংগ্রাম ও উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা মানুষের মহত্ত্বকে সর্ব্ব-স্থানে, দীন-হীনের কুটীরেও খুঁজিতেছি। ইহাকে কেহ যেন ভঙ্গী না বলেন। * * মানব-জীবনকে আরও বড়, আরও মহৎ, আরও সুগভীর করিয়া দেখিবার ইহা একটা বিপুল আগ্রহ। * * ফলে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে তাহা প্রচলিত সমাজ-বিধি ব্যবস্থাকে অস্বীকার করিলেও সমাজ-গ্রন্থিকে শিথিল করিবে না বরং সুদৃঢ়তর করিবে।

* * বিবাহের বন্ধন, সামাজিক নিয়ম, বৈষয়িক সমাজ-বিন্যাসের বিধি-নিষেধ, নূতন সাহিত্য অগ্রাহ্য করিয়াছে, সমাজকে বিদ্রূপ ও নীতিকে অবমাননা করিবার জন্য নহে, মনুষ্যত্বের গর্ব্ব-প্রকাশের জন্য।

* * যে দেশে ও যে কালে সাহিত্য অ-জাত, নীচ জাত outcastes লইয়াকারবার করে, সমাজ ব্যবস্থার বাঁধাবাঁধি নিয়ম-কানুন তাহার নিকট বেদ বা স্মৃতি নহে। বর্ত্তমান যুগে হামসুন, গোর্কি, বুনিন, রেমণ্টের গল্প-উপন্যাস ইহার সাক্ষ্য দেয়।

* * তরুণ-সাহিত্য জনসাধারণের অনুভূতি ও কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াছে। তাহাদের জীবনের ক্ষুদ্রতা, নীচতা ও কলুষ আজ বিচিত্র ও নির্লজ্জভাবে আমাদের নিকট ধরা দিল। কিন্তু ইহা সাহিত্যের বেয়াদবী নহে। কারণ এ সাহিত্যে কামনা ও কলুষের উদ্বৃত্ত একটা মনুষ্যত্বের চিরন্তন তেজের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, যাহা শত অভাব,

ক্লেশ ও নির্য্যাতনকে পরাভব করিয়াছে। মানুষ দীন, হীন, পাপী হইয়াও আপনার মনুষ্যত্বে যদি সুপ্রতিষ্ঠ থাকে তবে কিসের লজ্জা, কিসের ভয়! পাপের ক্লেদ, পাশবিকতার উত্তাপ নবীন সাহিত্যকে যে স্পর্শ করিতেছে ইহা সত্য, কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা যদি তাহার অটুট থাকে উহাই তাহাকে সকল পঙ্কিলতা হইতে রক্ষা করিয়া সত্য ও মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই।

কারখানার শ্রমিক, কয়লার খনিক, মাঠের মজুর, বাজারের পান-ওয়ালী সাহিত্যের আসরে নামিয়াছে বলিয়াই যে যুগ-সাহিত্যের সৃষ্টি হইল, তাহা নহে। ইহাও ঠিক নহে, যে সাহিত্যের নব-যুগ বর্ত্তমান সাহিত্যের ধারাকে একেবারে অগ্রাহ্য বা লুপ্ত করিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

* * উপন্যাস-সাহিত্য বর্ত্তমান যুগে বহুমুখী বিচিত্র হইয়া জীবনকে নানা দিক হইতে আন্দোলিত করিতেচে, গড়িয়া তুলিতেছে। উপন্যাস-সাহিত্য নূতন বিষয় ও নূতন রসের গৌরবেই গরীয়ান্। এটা নিশ্চিত বাঙ্গালার তরুণ উপন্যাস-সাহিত্য নানাদিক হইতে জাতির উপেক্ষিত, অনাদৃত জনগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও জীবন অবলম্বনে একটা সম্পূর্ণ নূতন ভাব-জগৎ তৈয়ার করিতেছে। ইহার সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের অনেক প্রভেদ। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের পঙ্গুতা ও সংশয়তাকে ইহা পরিহার করিয়াছে, ইহা দ্বিধা-হীন, নির্ভীক্। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের কৃত্রিমতা-দোষ-বিবর্জ্জিত। তাহা ছাড়া, ইহার অনুভূতি প্রগাঢ়তর। * * সমাজের নীচ উচ্চ হীন মহৎ সকলকে ইহা বরণ করিয়াছে। কলসীর কাণার বিনিময়ে প্রেম বিতরণ করিয়াছে।"

পূর্ব্বাশা নামক মাসিক পত্রের জুবিলি সংখ্যায় 'বাংলা সাহিত্যে

পঁচিশ বছর' নামক প্রবন্ধে অতি আধুনিক যুগের [অর্থাৎ বিগত পঁচিশ বৎসরের] বাঙ্গালা সাহিত্য অতি সংক্ষেপে অথচ অতি সুন্দরভাবে অনুশীলিত হইয়াছে ; তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না : "শরৎ চন্দ্রের উপন্যাসকে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের জনপ্রিয় অনুবাদ। শুধু ভাষা আর টেক-নিকেরই নয় অনেকক্ষেত্রে চরিত্রের অনুবাদও দেখতে পাই। তা সত্বেও শরৎ চন্দ্র শিল্পী এবং স্রষ্টা। সমালোচকের চশমা পরে তিনি মানুষকে চিনেন নি, চিনেছেন বুকের দরদ দিয়ে। তাঁর উপন্যাসে ওতপ্রোত হয়ে আছে আবেগের তীব্রতা। তিনি ব্যক্তিকে সমাজের চেয়ে অনেক ঊর্দ্ধে স্থান দিয়েছেন, এ সত্য পুঁথির সত্য নয়—এ সত্য তাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত করেছে। তাঁর 'চরিত্রহীন' 'শ্রীকান্ত' 'শেষ প্রশ্ন' এ সত্যের আলোতেই উজ্জ্বল, শাশ্বত।

শরৎচন্দ্রের পর নাম করা যেতে পারে—শ্রীনরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত, শ্রীচারু বন্দ্যোপাধায়, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়, শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীজলধর সেন।

নরেশচন্দ্রের উপন্যাস সাহসিকতার পরিচায়ক। মানুষের অপরাধের দিকটা তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর নায়ক নায়িকার চরিত্রে যা বাংলা দেশের শান্ত আবহাওয়ার পক্ষে এক গুরুতর ব্যাপার। এ বিষয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের বিপরীত। সমাজের চোখে ঘৃণিতা বাইজীকেও নারীত্বের মহিমায় শরৎচন্দ্র উজ্জ্বল করে তুলেছেন আর নরেশচন্দ্র ভদ্র-কন্যা মনোরমাকে পাপের প্রতিমূর্ত্তি করে এঁকেছেন। শরৎচন্দ্র মেয়েদের যে দিকটার দিকে চোখ বুজে ছিলেন, নরেশচন্দ্র সে-দিকেই ভাল করে তাকিয়েছেন। * * *

শৈলজানন্দের কুলি মজুর নিয়ে লেখা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ও যুবনাশ্বের নিম্ন শ্রেণীর লোক নিয়ে লেখা এবং অচিন্ত্য কুমারের দরিদ্র মধ্যবিত্ত নিয়ে লেখা গল্প ও উপন্যাসে। সমাজের কুৎসিত কুরূপ অঙ্গের দিকে নির্ব্বিকারচিত্তে যাঁরা দৃষ্টিক্ষেপ করতে পেরেছিলেন, তাঁদের সাহসকে আমরা বিদ্রূপ করতে পারিনে। * * [আর] একজন ক্ষমতাবান লেখক—শ্রীবুদ্ধদেব বসু। আর্টের ক্ষেত্রে তিনি মানুষের কোন প্রবৃত্তিকেই অপাংক্তেয় করে রাখলেন না। অচিন্ত্যকুমারও এ ব্যাপারে অগ্রণী হলেন। সত্যিকারের অতি আধুনিক আন্দোলন এ দুজনারই। ভাবে ও ভাষায় এঁরা অনেক অগ্রসর হয়ে গেছেন।

এ সময়টাতে বাংলাদেশে সাহিত্যের একটা ব্যাপক চর্চ্চা হয়েছে। এবং তার ফলে একজন নতুন ঔপন্যাসিক সাহিত্যের আকাশে উদিত হয়েছেন। তিনি শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুমনস্তত্ত্ব নিয়ে তিনি 'পথের পাঁচালী' বলে একটি উপন্যাস লিখে বাংলার পাঠক সমাজকে মুগ্ধ করে তুলেছেন। * *

মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শ্রীঅনুরূপা দেবী, শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীসীতা দেবী, শ্রীআশালতা দেবী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এঁরা কেউ বাংলা সাহিত্যে নূতন বা কোন বড় জিনিষ দান করতে পারেন নি।

উপন্যাসেরই মত বাংলা গল্পসাহিত্য প্রচুর উন্নতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী সমস্ত ঔপন্যাসিকই অনেক বিখ্যাত গল্প লিখেছেন। এঁরা ছাড়াও প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় এবং মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় গল্প লিখে যশস্বী হয়েছিলেন। আধুনিকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র বাবু, শৈলজানন্দ বাবু, অচিন্ত্য বাবু, বুদ্ধদেব বাবু, সবাই এঁরা গল্প

রচনায় সুদক্ষ। এবং তার পরেও কয়েক নতুন কৃতী লেখকের দলে আছেন, ৺রবীন্দ্র মৈত্র, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রভৃতি।"

বঙ্গভাষার বর্ত্তমান সম্পদ্—ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় বলিতে গেলে—[বর্ত্তমান যুগে] "বাঙ্গালাভাষা সাহিত্যের ভাষার আড়ষ্ট ভাবকে একেবারেবর্জ্জন করিয়া মৌখিকভাষার অনুসারী হইয়া উঠিয়াছে।" এমন একদিন ছিল যখন দর্শন, বিজ্ঞান বা গণিত সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে বা লিখিতে গেলে বাঙ্গালা ভাষায় পারিভাষিক শব্দের অকুলান হইত। কিন্তু আজ আর বাঙ্গালাভাষার সে অভাব, সে দারিদ্র্য নাই। এখনকার বাঙ্গালা আর কেরীসাহেবের সময়কার বাঙ্গালার মত নয়। এখনকার বাঙ্গালাভাষা গর্ব্বভরে সর্ব্ব-জগতের ভাষাকে স্পর্দ্ধাসহকারে উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারে—"ওগো! আমিও তোমাদের মধ্যে অন্যতম ; আমি তোমাদের কাছে আর হেলার বা অবজ্ঞার পাত্র নহি। আমারই বক্ষঃপীযূষধারা পরিপুষ্ট অনেক সুসন্তান সমগ্র বিশ্বের সমুদয় ভাষার লেখকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হওয়ায়, লেখকমাত্রের স্পৃহণীয় নোবেল পারিতোষিক লাভে সমর্থ হইয়াছেন। আমারই সন্তান জগদীশ এবং প্রফুল্ল তাঁহাদের অপূর্ব্ব জ্ঞানালোকভাতিতে সমগ্রজগৎ সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন। আমারই তেজস্বীপুত্রবয় রাসবিহারী আশুতোষ তাঁহাদের অলৌকিক জ্ঞানগরিমায় জগৎকে স্তম্ভিত ও বিমোহিত করিয়াছেন।"—তাই বলি বাঙ্গালাভাষার আর সে দৈন্য নাই। মাইকেল মধুসূদনের বাণী আজ বর্ণে বর্ণে অক্ষরে অক্ষরে অন্বর্থ হইয়াছে। আজ সেই স্বর্গগত কবির সহিত স্বর মিলাইয়া সমস্বরে আমরা সকলেই বলিতে পারি—"হে বঙ্গ!

ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।" কাব্যে নাটকে, পুরাণে ইতিহাসে, দর্শনে বিজ্ঞানে, ছন্দে অলঙ্কারে, গণিতে জ্যোতিষে, সাহিত্যে উপন্যাসে—সকল বিষয়েই বাঙ্গালাভাষাকে আজ পৃথিবীর অপর সকল ভাষার সঙ্গে সমান বলা যাইতে পারে। ভূতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন, মনোবিজ্ঞান—এমন কোন বিষয় নাই যাহা লইয়া বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। কিন্তু যে সকল মহাপুরুষের, যে সকল সাহিত্যরথীর অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অপরিসীম জ্ঞানগরিমার বলে বঙ্গভাষা—আমাদের সেই দীনা ক্ষীণা বঙ্গভাষা—আজ এই গৌরবময়ী মহিমময়ী অবস্থালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। যতদিন বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালাভাষা থাকিবে—ততদিন সে সকল মহাপুরুষকে, সে সকল ক্ষণজন্মা পুরুষকে, কেহ ভুলিতে পারিবেন না। বাঙ্গালী যদি আজিও প্রকৃত বাণীর অর্চ্চনা শিখিয়া থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালী নিশ্চয়ই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বাঙ্গালাভাষাসেবীর প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধাবান থাকিবে। কেরী হালহেড, রামমোহন প্যারীচাঁদ, ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল মাইকেল, রাজনারায়ণ দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন কেশবচন্দ্র, সঞ্জীব বঙ্কিম, গিরিশ শিশির, রমেশ সারদা, শিবনাথ ইন্দ্রনাথ—কাহাকেও বাঙ্গালী ভুলিতে পারিবে না। যেমন জনকজননীর আনন্দবর্দ্ধন করিতে হইলে অগ্রে তাঁহাদের সন্তানকে ভালবাসিতে হয়, তেমনি যিনি বাঙ্গালাভাষার সম্যক্ পরিচর্য্যা করিতে চাহেন, তাঁহার উচিত অগ্রে ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালাসাহিত্যসেবিদের পরিচয় জানা, তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করা, তাঁহাদিগের সমুচিত স্মৃতি-তর্পণ করা। যতদিন বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালাভাষা থাকিবে, যতদিন বঙ্গভাষাবিদ্

বাঙ্গালীর ধমনীতে বিন্দুমাত্র শোণিত থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালী তাঁহার উল্লিখিত সাহিত্যসেবিদিগকে ভুলিতে পারিবে না, তাঁহাদিগের নাম চিরদিনের জন্য অনন্ত অক্ষরে ক্ষোদিত করিয়া রাখিবে। ভগবান আমাদিগকে সেই শক্তি দিন, সেই প্রবৃত্তি দিন, সেই প্রবণতা দিন, সেই ব্যাকুলতা দিন,—যাহাতে আমরা আমাদিগের অগ্রজ সাহিত্যরথীবৃন্দের সমুচিত স্মৃতিতর্পণ করিতে পারি—তাঁহাদিগের নাম, তাঁহাদিগের গুণাবলী চিরদিনের জন্য আমাদিগের স্মৃতিপটে সমুজ্জ্বল রাখিতে পারি। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—কোন জাতিকে উন্নত করিতে হইলে, আগে দরকার উন্নত করা জাতীয় সাহিত্যকে।

পরিশিষ্ট

বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত আরবী পার্সী শব্দ

অকু
অছিলা
অজুহাত
অন্দর
অন্তর
আইন
আওরৎ
আওলাদ
আওয়াজ
আখচার
আখনি
আংরাখা
আঙ্গুর
আচকান
আণ্ডা
আতর
আতস বাজী
আদব
আদমসুমারি
আদমি
আদালত
আপশোষ
আপোষ
আবদার
আবাদ
আবহাওয়া
আবলুস
আমানৎ
আমদানি
আমলা
আমীর
আয়না
আয়মাদার
আরক
আরব
আলখাল্লা
আলবৎ
আল্লা
আশমান
আশরফি
আসল
আসবাব
আসোয়ার
আস্তানা
আস্তিন
ইউনানী
ইজারা
ইজ্জৎ
ইদ্দৎ
ইমান
ইমাম
ইয়ার
ইল্লৎ
ইসলাম
ইসাদী
ইস্তফা
ইস্তাহার
ইস্তিমরারি
ঈদ
উকিল
উজির
উর্দ্দি
উমের
এক্তিয়ার
এজলাস
এজমালি
এজাহার
এত্তেলা
এমারৎ
এলাহি
এলেকা
এলেম

ওকালতনামা
ওজন
ওজর
ওমরা
ওয়াকিফ
ওয়াদা
ওয়ারিশ
ওয়াশীল
ওয়াস্তা
ওয়কে
ওস্তাগর
ওস্তাদ্
কতল্
কদম
কদর
কবর
কবুল
কব্জা
কম
কমবক্তা
কয়েদ
কলপ
কলম
কলমা
কল্জে
কসবা
কসম
কসরৎ
কসাই
কসুর
কাওয়াজ
কাগজ
কাঁচি
কাছারি
কাজি
কাতার
কানুন
কাফের
কাবা
কাবু
কামনা
কায়দা
কায়েম
কারখানা
কারসাজি
কিংখাব
কিম্মৎ
কিসম
কিসমিস
কুচ
কুচপরোয়া
কুর্নিশ
কুর্সি
কুলি
কুলুপ
কেচ্ছা
কেতা
কেতাব
কেয়াবাৎ
কেরামৎ
কেল্লা
কৈফিয়ৎ
কোটাল
কোতোয়াল
কোঁৎকা
কোবালা
কোমর
কোরাণ
কোর্বানি
কোর্মা
ক্রোক
খৎ
খতম
খতিয়ান
খবর
খরমুজ
খরিদ
খলিফা
খস্ড়া
খাজাঞ্চি
খাজানা
খাট্টা
খাতক
খাতা
খাতির
খাতুন
খানদান
খানসামা
খারিজ
খালাস
খাস
খাসী

খাস্তা
খিদ্‌মদ্‌গার
খিলাৎ
খুন
খুপসুরৎ
খেতাব
খেয়াল
খেলাপ
খেসারৎ
খোদা
খোদাবন্দ
খোরাক
খোশমেজাজ
গজ
গজল
গরজ
গর্দ্দা
গর্দ্দান
গরম
গলদ
গাজি
গালিচা
গুজরান
গুমস্তা
গুলাব
গোলাম
গোস্ত
ঘাটতি
চক্‌মকি
চমক
চরখা
চশমা
চাকর
চাকরাণ
চাচা
চাদর
চাঁদা
চাপকান
চাবুক
চিক
চিজ
চেরাগ
চোগা
চোপদার
জওজ
জখম
জনাব
জব্বর
জব্দ
জবাই
জবান
জবাব
জমা
জমাদার
জমানৎ
জমি
জর্দ্দা
জরিপ
জরিমানা
জরী
জরুরি
জল্‌দি
জল্লাদ
জল্‌সা
জহর
জহরৎ
জাজিম
জানালা
জানোয়ার
জামা
জামিন
জায়গির
জায়দাদ
জারি
জাহাজ
জাহান্নম
জাহির
জিঞ্জিরা
জিঞ্জির
জিদ
জিন
জুম্মা
জুলুম
জের
জেরা
জেহাদ
জোব্বা
জোলাপ
টাকশাল
ডেক্‌চি
তক
তক্ত

তক্‌মা
তকরার
তদবির
তদারক
তন্‌খা
তপসীল
তফাৎ
তবক
তবিয়ৎ
তমসুক
তরজমা
তরফ
তলব
তল্লাস
তসবির
তহবিল
তহসীল
তাকিয়া
তাগাড়
তাগাদা
তাজ
তাজা
তাড়া

তামাদি
তামাম
তামাদা
তামিল
তারদাদ
তালাক
তালিম
তালু
তাঁবু
তীর
তৈয়ার
তোড়া
তোপ
তোফা
তোবা
দখল
দপ্তর
দম
দরকার
দরখাস্ত
দর্জ্জা
দর্জ্জি
দরদ

দরবার
দরবেশ
দরিয়া
দরুন
দলিল
দস্তখৎ
দস্তানা
দস্তাবেজ
দস্তুর
দহরম
দাওয়া
দাওয়াই
দাখিল
দাখিলা
দাগা
দাগাবাজি
দানা
দায়রা
দায়ের
দারোগা
দালান
দীন
দুনিয়া

দুল্‌দুল্
দুশমন
দূরবীন
দেমাক
দোকান
দোয়াত
দৌলৎ
নকর
নকল
নকিব
নগদ
নগদী
নজর
নজির
নবাব
নমাজ
নমুনা
নরম
নসিব
নম্বর
নহবৎ
নাকচ
নাকাল

নাখোদা
নাজির
নায়েব
নারাজ
নাবালক
নাস্তা
নিকা
নিজাম
নিমক
নিরিক
নূর
নেকনজর
নেশা
নেহাৎ
পছন্দ
পয়গম্বর
পয়দা
পরী
পয়োরা
পরোয়ানা
পর্দা
পাক
পাট্টা

পায়জামা
পিরান
পিলখানা
পীর
পেয়াদা
পেয়ারা
পেশ
পেশোয়াজ
পেসা
পোলাও
ফকির
ফতুয়া
ফতুর
ফতে
ফতোয়া
ফয়তা
ফয়সালা
ফরমাস
ফরাস
ফরিয়াদি
ফানুস
ফারখত
ফারমান

ফারাক
ফিরিস্তি
ফুফু
ফুরসৎ
ফেরার
ফোয়ারা
ফৌজ
ফৌত
বক্‌শী
বকেয়া
বখরা
বখশিষ
বজ্জাত
বদনা
বন্দগি
বন্দোবস্ত
বয়েৎ
বরখাস্ত
বরফ
বরফী
বরাৎ
বহিন
বাগিচা

বাজেয়াপ্ত
বাদশা
বাদাম
বাবুর্চি
বারকোশ
বাহবা
বাহাদুর
বিসমিল্লা
বীমা
বুজরুক
বুরুল
বুলবুল
বেইজ্জৎ
বেইমান
বেওয়ারিশ
বেকায়দা
বেকুব
বেগম
বেতর
বেদস্তর
বেমালুম
বেলোয়ারি
বৌচকা

বোরখা
ভেস্ত
মওলানা
মকুব
মখমল
মগজ
মজলিশ
মজবুত
মনিব
মঞ্জিল
মন্‌সবদার
ময়দা
মরদ
মলম
মশলা
মসজিদ
মসনদ
মহকুমা
মহরম
মহাফেজ
মাফ
মাফিক
মামদো
মাম্‌লা
মালাই
মালিক
মারফৎ
মিছরি
মিছিল
মিঞা
মিনা
মিনার
মিয়াদ
মীর্জ্জা
মুচলেকা
মুন্সী
মুন্সেফ
মুলতুবী
মুল্লুক
মুসলমান
মুসলিম
মুসাফের
মুসাবেদা
মুস্কিল
মুহুরী
মেওয়া
মেকদার
মেকী
মেজ
মেজাজ্
মেরজাই
মেহন্নৎ
মেহেরবানি
মোকদ্দমা
মোকাবেলা
মোকাম
মোক্তার
মোতফরাকা
মোতাবেক
মোতায়েন
মোরগ
মোল্লা
মোহর
মৌরুসী
মৌলভী
যখম
যব্বর
রকম
রদ
রফা
রসদ
রসুই
রাজি
রায়
রিফু
রুজু
রুমাল
রেওয়াজ
রেকাব
রেজকি
রেজাই
রেয়াৎ
রেশম
রেহাই
রৈয়ৎ
রোকড়
রোজা
রোয়দাদ
রোশনাই
লবেজান
লস্কর
লাখেরাজ

লাগাম
লায়েক
লাস
লুঙ্গি
লেফাফা
শওয়ার
শমসের
শরিফ
শহর
শহীদ
শাগরেদ
শানাই
শাল
শিকার
শিয়া
শিরনি
শিরপেচ
শিশি
সওগাৎ
সদর
সন
সনদ
সনন্দ
সনাক্ত
সফর
সফিনা
সরকার
সরদার
সর্ব্বৎ
সরম
সরহদ্দ
সরাই
সরিফ
সস্তা
সহর
সাথ
সান্‌কি
সাফ
সাফাই
সাবেক
সাবুদ
সামিল
সাল্‌তামামি
সালিয়ানা
সালিশ
সাহান্‌সা
সিন্দুর
সিপাই
সুন্নৎ
সুপারিশ
সুবা
সুবেদার
সুরখী
সুরু
সুলতান
সেতার
সেরেস্তা
সেলাম
সোপরদ্দ
সোরাই
সোলেনামা
হক
হকদার
হাকিম
হকিয়ৎ
হজ
হজম
হজরৎ
হদিশ
হদ্দ
হপ্তা
হরদম্‌
হরফ
হল্‌কা
হাউই
হাওদা
হাওলাত
হাকিম
হাজৎ
হাজার
হাজাম
হাজি
হাজির
হাতিয়ার
হাবিলদার
হাম
হামাম
হামেশা
হামেহাল
হায়রান
হারাম
হারামজাদা

হাসিল	হিকমৎ	হুকা	হুরী
হালৎ	হিম্মৎ	হুকুম	হুলিয়া
হালাল	হিসাব	হুজুগ	হুসিয়ার
হালুয়া	হিস্সা	হুজুর	হেফাজৎ

বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত ইংরেজী শব্দ

অক্টোবর্	ইঞ্জিনিয়ার	এপ্রিল	কম্পাস
অগষ্ট	ইন্কমটেক্স	এরোরুট	কম্পোজ
অথর	ইন্সল্ভেণ্ট	এলোপ্যাথি	কম্ফর্টার
অফিস	ইন্স্পেক্টার	এল্যুমিনিয়ম	কর্গেট
অয়েল	ইয়ারিং	এসিড	কর্ণেল
অয়েলক্লথ	উইল	ওয়ারেণ্ট	কলার
আউট	উটপেন্সিল	ওয়েষ্টকোট	কমিশন
আপীল	উল	কডলিভার	কলেজ
আপেল	এক্সপ্রেস	কণ্ট্রাক্টর	কলেরা
আর্ট	এগজামিন	কনষ্টেবল	কাউন্সিল
আর্দালি	এগজিবিশন	কপি	কাপ্তেন
আস্তাবল	এটর্নি	কমিটি	কাফি
ইউনিভার্সিটী	এডিটর	কমিশন	কারেন্সি
ইঙ্কি	এণ্ট্রান্স	কমিশনার	কার্ড
ইঞ্জিন	এনামেল	কমেডি	কার্পেট

কার্বাইড
কালেক্টর
কেটলি
কেবিন
কেমিক্যাল
কেমিষ্ট্রি
কেয়ার
কেরোসিন
কেশিয়ার
কোচ
কোচম্যান
কোট
কোম্পানি
কোর্ট
কৌশুলি
ক্রিকেট
ক্লক
ক্লাব
ক্লার্ক
ক্লাস
ক্লোজ
খৃষ্ট
খৃষ্টমাস ডে

গজফ্লানেল
গবর্ণমেন্ট
গবর্ণর
গাউন
গার্টার
গার্ড
গিনি
গিল্টি
গেজেট
গেঞ্জি
গ্যারান্টি
গ্যালারি
গ্রামোফোন
গ্লাস
চিমনি
চুরুট
চেক
চেঞ্জ
চেন
চেয়ার
চেয়ারম্যান
জজ
জানুয়ারি

জুন
জুবিলি
জুলাই
জেল
জেলি
জ্যাকেট
জ্যাম
টন
টব
টাইপ
টাইফয়েড
টাইমটেবেল্
টাউন
টার্ন
টার্ম
টিকিট
টিঞ্চার
টিফিন
টীচার
টী-পট
টুইল
টেক্স
টেবিল

টেলিগ্রাফ
টেলিফোন
টোয়েন্টিএইট্
ট্রেজারি
ট্রেন
ট্র্যাজেডি
ট্র্যাপ
ডজন
ডন
ডবল
ডাইংক্লিনিং
ডাক্তার
ড্যাম
ড্রাইভার
ডিক্রি
ডিপার্টমেন্ট
ডিরেক্টর
ডিস
ডিসমিস
ডিসেম্বর
ডেক্‌চি
ডেপুটি
ডেলী

ডেস্ক
ড্রেন
ড্রেস
থাইসিস
থার্মোমিটার
থিয়েটার
নভেম্বর
নম্বর
নাইট্রোজেন
নিব
নোট
নোটিশ
পকেট
পম্প
পপার
পাউডার
পালিশ
পার্লিয়ামেন্ট
পার্শেল
পাশ
পিন
পিচবোর্ড
পিয়ন

পুডিং
পুলটিশ
পুলিশ
পেগ
পেট্রোল
পেণ্ট
পেণ্টুলন
পেন
পেন্সন
পেন্সিল
পেপার
পোষ্ট কার্ড
পোষ্টাফিস
প্যাসেঞ্জার
প্রাইজ
প্রাইমারি
প্রিণ্টার
প্রিন্সিপ্যাল
প্রিভি কাউন্সিল
প্রেস
প্রেসক্রিপ্‌সন্
প্রোটোপ্লাজম
প্রোফেসার

প্রোমোশন
প্লেগ
প্ল্যাটফরম্
ফটো
ফটোগ্রাফ
ফনোগ্রাফ
ফাইন
ফাউণ্টেন পেন
ফাউল
ফারম্
ফার্স
ফি
ফিজিক্স
ফিটন
ফুটবল
ফ্লুট
ফেব্রুয়ারি
ফেরিঘাট
ফেল
ফোমেণ্ট
ফ্যাশান
ফ্রী
ফ্রেম

ফ্লানেল
বল
বাইসম্যান
বাইসিকিল
বাক্স
বায়স্কোপ
বার্নিশ
বিয়ার
বিলিয়ার্ড
বিস্কুট
বুরুশ
বুলু
বেঞ্চি
বেয়ারিং
বেলুন
বেণ্ট
বোট
বোর্ড
ব্যাটবল
ব্র্যাণ্ডি
ব্যারিষ্টার
ব্যালট
ব্রিজ

ব্রে
ব্লটিং
ভাইস্রয়
ভিজিট
ভোট
মটন
মণিঅর্ডার
মণিব্যাগ
মণুমেণ্ট
মর্ণিংস্কুল
মাইনর
মাইল
মার্চ্চ
মার্ব্বল
মাষ্টার
মিউনিসিপ্যালিটি
মিল
মিস
মে
মেজার গ্লাস
মেডেল
মেম্বার
মেল

মোটর
ম্যাজিষ্ট্রেট
ম্যানেজার
ম্যাপ
ম্যালেরিয়া
রবার
রয়টার
রসীদ
রাবিশ
রাস্কেল
রিটার্ণটিকিট
রিপোর্ট
রিভলভার
রিসিভার
রিং
রুল
রেজিষ্ট্রার
রেজেষ্টারি
রেট
রেমিটেণ্ট
রেল
রেলওয়ে
রেশ

রোড
রোডশেষ
রোম্যাণ্টিক
রোম্যান্স
রোষ্ট
লকেট
লগেজ
লজেঞ্জুস্
লণ্ঠন
লংক্লথ
লাইন
লাইনিং
লিভার
লিমনেড
লিষ্ট
লেকচার
লেভেণ্ডার
ল্যাম্প
শেয়ার
শ্লেট
শো-কেশ
শো-রুম
ষ্টক

ষ্টকিং
ষ্টার্ট
ষ্টীম
ষ্টীমার
ষ্টীল
ষ্টীলপেন
ষ্টুপিড
ষ্টেশন
ষ্টোভ
ষ্টোর
ষ্ট্যাম্প
ষ্ট্রীট
সবজজ
সমন
সারেন্স
সার্জ্জ
সার্জ্জন
সার্ট
সার্টিফিকে
সার্ভে
সিগারেট
সিভিলিজেশন
সিলমো

স্পিরিট	সেপ্টেম্বর	হল	হিষ্টিরিয়া
সীন	সেমিজ	হাইকোর্ট	হুররে
সীমেন্ট	সেসন	হাইজাম্প	হেড
সীল	সোডা	হাইড্রোজেন	হেডমাষ্টার
সুইচ	স্কলারশিপ	হাইফেন	হোটেল
সুইসাইড	স্কুল	হাউস	হোমিওপ্যাথি
সেক্রেটারি	স্ক্রু	হাফ-টিকিট	হ্যাট
সেটেলমেন্ট	স্পিরিট	হাফষ্টকিং	হ্যাটকোট
সেন্টার	স্প্রীং	হারিকেন	হ্যাণ্ডনোট
সেন্ট্র্যাল	হন্দর	হাণ্ডেল	হ্যাণ্ডেল
সেনেট	হুপ	হার্মোনিয়া	হাঁসপাতাল

পুস্তকখানির সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমতঃ—

রায় বাহাদুর ডাক্তার **দীনেশচন্দ্র সেন** বলিয়াছেন ঃ—

শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু প্রণীত বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের ফাইল কাপি খানি পড়িয়া দেখিলাম। এই বিষয়ে সম্প্রতি সুশীলবাবু, সুকুমার বাবু, শিবরতন বাবু, প্রিয়রঞ্জন বাবু, কুমুদনাথ বাবু প্রভৃতি লেখকেরা কয়েকখানি বই লিখিয়াছেন, স্বর্গীয় শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার 'বঙ্গবাণী' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে বঙ্গ গদ্য-সাহিত্যের অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে বাঙ্গলার পদ্য ও গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

অনেকেই হয়ত জানেন না যে বাঙ্গলা ভাষায় দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অনেকগুলি যাত্রার পালা রচিত হইয়াছিল, এই পালাগুলির মাঝে মাঝে গান থাকা সত্বেও সেগুলি মূলতঃ গদ্যেই লিখিত হইয়াছিল। যাঁহারা মনে করেন, ইংরেজীর অনুকরণে আমরা নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহারা এই যাত্রার পালা-সাহিত্যে প্রবেশ করিলে বুঝিতে পারিবেন, ঠিক বিলাতী আদর্শে রচিত না হইলেও নাটকের ধরণের লেখার সঙ্গে বাঙ্গালীরা খুবই পরিচিত ছিলেন। ইহা ছাড়া রূপকথা ও গীতি-কথা খৃষ্টীয় নবম দশম শতাব্দী হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা মুখে মুখেই চলিয়া আসিয়াছে, লিখিত আকারেও তাহাদের নিদর্শন একবারে দুষ্প্রাপ্য নহে।

সহজিয়া সাহিত্য অতি প্রাচীন এবং বিপুল, নিত্যানন্দ প্রভুর পর হইতে কত যে গদ্য-পদ্যময় সহজিয়া পুঁথি লিখিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। প্রত্যেক বৈষ্ণব বাবাজীর ঝুলি পরীক্ষা করিলে এই সাহিত্যের নমুনা কিছু না কিছু পাওয়া যাইবে।

আরও দুইটি বিষয়ে অনেক গদ্যানুবাদ গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রাধাবল্লভ শর্ম্মা গদ্য স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন

অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধেও লেখক অনেক মূল্যবান অভিমত সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। লেখকের এই উদ্যম বঙ্গ সাহিত্যের অনেক ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখককে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিবে তাহার সন্দেহ নাই। আশা করি সুধীসমাজ ও সাধারণ পাঠক উভয়েই তাঁহার পুস্তকের প্রকৃত উৎকর্ষ ও মর্য্যাদা অবধারণে তাঁহাকে উৎসাহিত করিবেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল **ডাক্তার সতীশচন্দ্র বাগচি** বলিয়াছেন :—

আজ বাঙ্গালা দেশ কথাসাহিত্য ও গীতি কবিতায় যে পরিমাণে পরিপ্লাবিত তার অনুপাতে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসের মাল মশলা বাঙ্গালায় আজিও এক রকম নাই বলিলেও চলে। বরং পদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের মাল মশলা আজকাল কতক পরিমাণে সমাহৃত হইয়াছে। এ অবস্থায় শ্রীমান জহরলাল বসু বাঙ্গালায় গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন বলিতেই হইবে। শ্রীমান জহরলাল আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র; পূর্ব্ব হইতেই আমি তাঁহাকে খুব মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্র বলিয়া জানি। তবে, বঙ্গ-ভাষার প্রতি যে তাঁহার এত প্রগাঢ় অনুরাগ তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।

কোনও ভাষার সাহিত্যের ইতিবৃত্ত লেখা যথেষ্ট সময় এবং প্রচুর পরিশ্রম সাপেক্ষ। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিবৃত্তের মালমশলা একেতো নাই বলিলেই চলে, আর যাহা আছে—তাহাও নিতান্ত বিক্ষিপ্ত; সেই বিক্ষিপ্ত এবং নিতান্ত সামান্য মালমশলা হইতে নিজের অমিত পরিশ্রম এবং বিশেষ গবেষণার সাহায্যে তিনি যে এক বিপুলকায় বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের রীতিমত ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছেন—ইহা তাঁহার খুব বেশী কৃতিত্বের এবং যোগ্যতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। নিজে আইন ব্যবসায়ী হইয়াও অবশিষ্ট সময়কে এইদিকে নিয়োজিত করিয়া তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যকে যে অমূল্য রত্ন উপহার দিয়াছেন তাহার জন্য বঙ্গভাষাসেবী চিরদিন তাঁহাকে মনে রাখিবে।

বলা বাহুল্য, অধুনা এই শ্রেণীর গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমতঃ, বাঙ্গালা সাহিত্য এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এবং এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট; দ্বিতীয়তঃ এখনও আমরা অনেকেই আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গভাষা সেবীগণের পরিচয় বা নাম পর্য্যন্তও জানি না। শ্রীমান জহরলাল তাঁহার এই পুস্তকে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের স্তরগুলি অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন এবং প্রস্তাব্য বিষয় প্রচুর দৃষ্টান্ত সহ নির্দ্দেশ করায়—আলোচ্য বিষয়টাকে অতি যোগ্যতার সহিত বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থরাজি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের বিভিন্ন মতের একত্র সমাবেশ এবং বিচার ও আদ্যন্ত সমগ্র লেখকগণের আবির্ভাব কালানুক্রমে বিশ্লেষণ বিন্যাস—এই দুইটী তাঁহার গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। এইরূপে সময়ের অনুক্রমে সমস্ত বইখানি সাজাইতে তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই; কারণ এ পন্থা অনুসরণ করিয়া ইতিপূর্ব্বে কোন সমালোচক বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের অনুশীলন করেন নাই। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহের জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

তাঁহার এ পুস্তক বিদ্যার্থী, অধ্যাপক এবং বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী সাধারণ পাঠকবৃন্দ—সকলেরই নিকট বিশেষরূপে সমাদৃত হইবে আশা করি। এবং ইতিপূর্ব্বেই এই সকল বিষয় অবলম্বনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে তিনি স্বর্ণ রৌপ্যের যে কয়খানি পদক লাভ করিয়াছেন, তাহাও এ পুস্তকখানির সারবত্তার যথেষ্ট পরিচায়ক। উপসংহারে বক্তব্য এই যে পুস্তকখানি আমারই একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্রের রচিত বলিয়া আমি নিজেকেও গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করি এবং ইহার বহুল প্রচার সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, রায় বাহাদুর **খগেন্দ্রনাথ নাথ মিত্র** এম এ, বি এল, বলিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত জহর লাল বসু প্রণীত 'বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' পাঠ

করিয়া আমি প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমাদের সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস নাই বলিলেই চলে। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে এই অভাব অনেকেই অনুভব করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য দেশে অনেক স্থলে প্রতি বৎসর যে সাহিত্য প্রকাশিত হয়, তাহারও একটি সমালোচনামূলক ইতিহাস বাহির করিবার রীতি আছে। অবশ্য নিত্যনূতন যে সাহিত্য জন্মলাভ করিতেছে, তাহার সবই যে স্থায়ী হইবে, তাহা নহে: কিন্তু ইতিহাসের ধারা বুঝিতে হইলে সাহিত্যের প্রত্যেকটি তরঙ্গ লক্ষ্য করিতে হইবে। জহরলাল বাবু আধুনিক সাহিত্যের অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আমার মনে হয় যে ইহা ছাত্রদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। ইতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত **প্রিয়রঞ্জন সেন** বলিয়াছেন :—

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস জানিবার জন্য ও জানাইবার জন্য পাঠক ও লেখক, উভয়ের মধ্যেই আজকাল উদ্যোগ দেখা যাইতেছে; ইহা প্রশংসার বিষয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গদ্যের অংশ এত অল্প, যে তাহার কথা এতদিন আলোচিত হয় নাই,—এবং সেই জন্য আমাদের প্রাচীন বাংলা গদ্যের সম্বন্ধে জ্ঞান যাহাতে বাড়ে তাহা সর্ব্বথা করণীয়। উত্তরপাড়া বাস্তব্য শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু মহাশয় প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের পরিচয় দিয়া যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা আমি দেখিয়াছি। তিনি প্রাচীন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মত আলোচনা করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়, ভারতচন্দ্র ও রাম প্রসাদের কথা বলিয়া ইংরাজী আমলের বাংলা গদ্য সাহিত্যের সুষ্ঠু পরিচয় দান করিয়াছেন। জহরবাবুর বিবরণীর বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে প্রভূত দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং ছাত্র শিক্ষক ও অন্য যাহারা বাংলা সাহিত্য আলোচনার অনুরাগী তাঁহাদের সকলেরই ইহা কাজে লাগিবে। এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। জহরবাবুকে তাঁহার পুস্তকের মাল মসলা সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে,—উৎকৃষ্ট পুস্তকা-

গারের একান্ত অভাব ইহার কারণ। তৎসত্ত্বেও এ বিষয়ে তাঁহার প্রবল অনুরাগ আছে বলিয়াই তিনি এই দুরূহ কর্ম্মে ব্রতী হইয়া তাহা সুন্দর ভাবে নিষ্পন্ন করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত **সুকুমার সেন** বলিয়াছেনঃ—

শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু রচিত বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য দেখিলাম। জহরবাবু অনেক পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। গত শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা গদ্য কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং কত সাহিত্যিক গদ্য রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন তাহা সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক অবগত নহেন। জহরবাবুর পুস্তক প্রকাশিত হইলে এই বিষয়ে বাঙ্গালী পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার উপাদান পাওয়া যাইবে। সাধারণতঃ বাঙ্গালী পাঠক উপন্যাস এবং কিছু কিছু কবিতা ছাড়া অপর কোন বই পড়ে না। বর্ত্তমান সময়ে এই রুচির পরিবর্ত্তনের আভাস দেখা যাইতেছে। সেই জন্য মনে হয় যে জহরবাবুর বই প্রকাশিত হইলে সাধারণ পাঠকের নিকট আদৃত হইবে। বইখানি বি, এ, এবং এম-এ পরীক্ষার্থীরও বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া বোধ হয়।

কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের বাঙ্গালার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত **তারাপদ মুখোপাধ্যায়** বলিয়াছেন ঃ—

মাননীয় শ্রীযুক্ত জহর লাল বসু মহাশয় একখানি অমূল্য গ্রন্থ লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহাকে আমরা সাদরে অভ্যর্থিত করিতেছি। সাধারণ সৌজন্য বা প্রীতি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে আসি নাই; ভাষা জননীর সেবাকল্পে তিনি যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন তাহাতে সত্যই তিনি বঙ্গভাষার সেবকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কথা-সাহিত্য ও গীতিকবিতা পরিপ্লাবিত আধুনিক বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে লেখক

যে বাঙ্গালার গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন ইহাতেই তিনি ভূয়সী প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন। সাহিত্যের প্রতি 'প্রাণের টান' না থাকিলে কখনই তিনি অর্থোপার্জ্জন বা উপস্থিত করতালির মোহ পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ দুঃসাহসিক কর্ম্মে অবতীর্ণ হইতেন না। সম্পূর্ণ বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে নীরস কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও লেখক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপণ্ডিতগণের জ্ঞানগুঞ্জন মুখরিত বাঙ্গালা সাহিত্যের গবেষণামন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহিয়া ব্যর্থমনোরথ হন নাই, তাহাতে তাঁহাকে আমাদের সাধুবাদ প্রদান করিতেই হইবে।

তাঁহার গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অদ্বিতীয় না হইলেও বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য ; বাঙ্গালা সাহিত্যে এই ধরণের গ্রন্থের এখনও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এই পুস্তকে লেখক সর্ব্ববিষয়ে অভ্রান্ত না হইলেও গদ্য সাহিত্যের স্তরগুলি বিশদ করিয়া তুলিবার জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন যুগের প্রচুর বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া তিনি একদিকে সাহিত্যরসিকগণের যথেষ্ট মনের 'খোরাক' যোগাইয়াছেন, অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষানুশীলন-নিরত ছাত্র গণের জন্য নানা আলোচনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ পাঠকগণেব জন্যও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় বস্তুরও ইহাতে অভাব নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমি সমালোচক নহি ; আলোচ্য গ্রন্থখানি সম্যক্ বিশ্লেষণ আমার সাধ্যাতীত এবং আমার উদ্দেশ্যও তাহা নহে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি বলিয়াই গ্রন্থ খানির আবির্ভাবে আনন্দপ্রকাশ করিতেছি এবং পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন গ্রন্থখানি একবার নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়া লেখকের উদ্দেশ্য ও পরিশ্রম সার্থক করিয়া তুলেন।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ এটর্ণী শ্রীযুক্ত **হীরেন্দ্রনাথ দত্ত** এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস, বেদান্তরত্ন বলিয়াছেন ;—

শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু প্রণীত বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস' পাঠ

করিয়া আমি প্রীত হইয়াছি। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে মনে হয় উহার একটি ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রয়োজন। ঐরূপ গ্রন্থ এতদিন ছিলনা। জহরবাবুর গ্রন্থে সে অভাব অনেকাংশে পূর্ণ হইবে।

গ্রন্থকার বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসকে ছয়যুগে বিভক্ত করিয়াছেন—আদিযুগ, মুসলমানযুগ, প্রথম ইংরেজ সংস্পর্শের যুগ, বিদ্যাসাগরের যুগ, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ এবং রবীন্দ্রনাথের যুগ। এই যুগানুযায়ী বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যকে বিন্যস্ত করিতে এবং প্রত্যেক যুগের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতে গ্রন্থকারকে অনেক অনুসন্ধান, পরিশ্রম ও ব্যাপক অধ্যয়নের সাহায্য লইতে হইয়াছে। তাঁহার ভাষা সরল ও সরস এবং গ্রন্থনের প্রণালীও উৎকৃষ্ট। কয়েকজন অভিজ্ঞ লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়া এবং আদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের গদ্য রচনার অনেকগুলি কৌতুকপ্রদ নিদর্শন সঙ্কলন করিয়া জহরবাবু গ্রন্থের উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। আশা করি এ গ্রন্থের যথোচিত সমাদর হইবে এবং শীঘ্রই আমরা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিতে পাইব। ঐ সংস্করণের জন্য আমি দুইটি বিষয়ে গ্রন্থকারের মনোযোগ আকর্ষণ করি—

(১) আধুনিক যুগের বঙ্গগদ্য-সাহিত্যকে গ্রন্থকার যে তিন উপযুগে বিভক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যুগ, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ এবং রবীন্দ্রনাথের যুগ—যুগ-প্রবর্ত্তক ঐ তিনজন মনীষীর গদ্য রচনায়ও একটা বিবর্ত্তনক্রম আছে। আমার অনুরোধ গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ ক্রম যথাসম্ভব প্রদর্শন করিবেন।

(২) জহরবাবুর গ্রন্থে অনেক খ্যাতনামা গদ্য লেখক লেখিকার নাম (বোধ হয় অনবধান বশতঃ) উল্লিখিত হয় নাই। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের এই ত্রুটি ক্ষালিত হইবে এবং লেখকদিগের পরিচয় বিশৃঙ্খলভাবে গ্রথিত না হইয়া, হয় কালানুক্রমে নয় বর্ণানুক্রমে (তাঁহাদের রচিত প্রধান প্রধান গ্রন্থের তালিকাসহ) সন্নিবিষ্ট হইবে।

প্রবীণ সাহিত্যিক সঞ্জীবনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত **কৃষ্ণকুমার মিত্র** বলিয়াছেন :—

জহরলাল বাবু বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস ছয়যুগে বিভক্ত করিয়াছেন :—আদিযুগ, মুসলমান যুগ, ইংরেজ লেখকদিগের যুগ, বিদ্যা-সাগরের যুগ, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ ও রবীন্দ্রনাথের যুগ। * * * এই ছয়যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে ক্রমোন্নতি হইয়াছে, জহরলালবাবু বহু সংখ্যক প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে তাহা সঙ্কলন করিয়াছেন; এবং সরল ও মনোজ্ঞ ভাষায় স্বাধীন ভাবে তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের বিবরণ যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের গবেষণার ফল এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের অনুসন্ধান করিতে চান এই গ্রন্থ তাঁহাদিগের বিশেষ সহায়তা করিবে। * * * *

জহরবাবু তাঁহার গ্রন্থে প্রত্যেক যুগে বাঙ্গালা গদ্যের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অবশেষে বর্ত্তমান যুগের গদ্য-সাহিত্যে যে বীভৎস দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া দেশের মহোপকার করিয়াছেন। তিনি সাহিত্য সম্রাটকেও চক্ষুলজ্জায় মার্জ্জনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই সৎসাহস দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। * * * *

খ্যাতনামা সাহিত্যিক রায় বাহাদুর **সত্যকিঙ্কর সাহানা** বি, এ, বিদ্যাবিনোদ বলিয়াছেন :—

কোমল সৌন্দর্য্যে ও ভাবনৈপুণ্যে বঙ্গভাষা আজ জগতের ভাষা-পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, শক্তিমান বঙ্গমনীষীগণের গৌরবোজ্জ্বল কর্ম্মে জগতের আভিজাত্যসম্পন্না ভাষারাণীদের উচ্চমঞ্চে আজ বঙ্গবাগেদবীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভাষা জননীর এই মহি-মোজ্জ্বল মুহূর্ত্তেও তাঁহার ধীর সন্তানগণের মনে একটা শঙ্কার শিরা মাঝে মাঝে পীড়া দিতে থাকে। বঙ্গভাষার লেখকগণ বর্ত্তমানে ক্ষুদ্রগল্প, কথা-সাহিত্য, গীতিকবিতা প্রভৃতি বিষয়ে যে ভাবে আত্মনিয়োজন করিতেছেন

তাহার আংশিক ভাবেও ভাষার মহত্ত্ব ও ভারত্ববর্দ্ধক দর্শন, বিজ্ঞান, সমালোচনা প্রভৃতিতে সময় নিয়োগ করিতেছেন না ; * * * মনীষা সম্পন্ন বহু সুপণ্ডিত বঙ্গসন্তান বঙ্গভাষা সম্বন্ধে গভীর গবেষণাপূর্ণ বিশেষ মূল্যবান কতক গুলি পুস্তক রচনা করিয়া বঙ্গভাষাভাষীকে তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করিলেও, বঙ্গভাষার একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও রচিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু * * "বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস" রচনা করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। * * * যদিও পূর্ব্ববর্ত্তী বহুলেখকের দ্বারা * * বঙ্গসাহিত্যেতিহাসের অনেক উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছে কিন্তু সেগুলি বহু আকারে বহুস্থানে বিক্ষিপ্ত থাকায় সে সকল সাধারণ পাঠকের ব্যবহারের বাহিরেই পড়িয়া রহিয়াছে। জহরবাবুর দীর্ঘকালের শ্রমসাধনায় এবং বিচার আলোচনায় বঙ্গগদ্য-সাহিত্যের যে একটি সংক্ষিপ্ত হইলেও ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হইল সেজন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করি। আমার বিশ্বাস এই গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস বাঙ্গালী পাঠকের, বিশেষতঃ শিক্ষার্থিগণের নিকট বঙ্গ-গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক সংবাদ বহন করিবে এবং উদীয়মান তরুণ লেখকগণের মধ্যে অন্ততঃ দুই একজনেরও মনে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ণতর ইতিহাস রচনার প্রেরণা দিবে।

মান্যবর রায় বাহাদুর **স্যর সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়** কে, টি, সি, বি, ই, এম, এ, বি, এল, এম, এল, এ, বলিয়াছেন :—

* * * Your History of Bengali Prose Literature is as full of valuable informations as charming in language and descripton, It is really a gigantic work, requiring untiring patience, stupendous diligence and marvelous ability. It will, I doubt not, be of as much use to the students as also to the professors of Bengali Literature, and I have every confidence that your Book will be duly appreciated.

"অমৃত বাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন :—Stotra-Sangraha ; or Gleaning of Sanskrit Hymns by Jahur Lal Bose pp. 60, price 8 annas. To be had of the author, Uttarpara, Bengal.

This Book contains a beautiful collection of the best known Sanskrit Stotras (Hymns). The editors have spared no pains to make the book particularly useful to persons of all descriptions. Below the hymns are subjoined short notes in Bengalee ; and then a free translation of the whole in elegant Bengalee. Those who do not know Bengalee but want to have an insight into the spirit of the Sanskrit Hymns will be no less benefited by this book in view of the fact that it contains among other things a fine English rendering of the hymns. Considering its merits, we think the book has been quite moderately priced. [10th February, 1935.]